Original : PREM CHAND'S SHORT STORIES (Hindi)

Prem Chand's Short Stories (Bengali)

ডিসট্রিব্যুটার :
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমাণ্ড স্ট্রীট
কলিকাতা-1

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-7, গ্রীণ পার্ক, নিউ দিল্লী-16
কর্তৃক প্রকাশিত ও নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-4 দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

সে একটা সময় ছিল, যখন হিন্দী সাহিত্য যাত্নবিদ্যা, আর ভোজবাজি, আর রূপকথা আর হাজার রগড়ের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেত, বাস্তবতার মুখোমুখী দাঁড়াবার মত কলজের জোর ছিল না তার। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় গড়া মায়াপুরীর প্রাসাদে সে-আমলের রাজকুমারী-নায়িকারা আদরে সোহাগে মানুষ হত, তাদের আশেপাশে কেবল হীরে আর মুক্তোর ছড়াছড়ি ; প্রেম করা আর বিরহে ফুঁপিয়ে মরা ছাড়া ইহজগতে তাদের আর কোনো কাজ থাকত না। গহীন অরণ্যে তীরধনুক হাতে ঘুরে বেড়াত নায়ক রাজকুমার, আর রাজকন্যের প্রেমে পড়ার দরুণ তাকে অসম্ভব রকমের সব বীরত্বের কাণ্ড-কারখানা করতে হত। নায়কের স্যাঙাত আর নায়িকার সখীর দল যখন—যেমন-খুশি মায়ারূপ ধারণ করে দূর ত্নর্গমে অহরহ যাত্রা করত আর নায়ক-নায়িকার প্রেমযজ্ঞে সাহায্য করত। অবিশ্যি তার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের ম...ও অল্পবিস্তর প্রেমট্রেম করে নিত। আর থাকত বিশালদেহী কুৎসিতদর্শন শালপ্রাংশু ব্যূঢ়োরস্ক খলনায়ক। নায়িকাকে হাতাবার ফিকিরে সে অবিশ্বাস্য ধরণের কুটিল জাল বিছোত, নিদারুণ মূর্খতার পরিচয় দিত, আর থেকে থেকে হায়েনার মতন অট্টহাসি হাসত। এসব কাহিনী পড়লে মনে হত পৌরাণিক উপকথা, কথা-সরিৎসাগর বা আলিকলায়লার উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রীরাই নামধাম বদলে নেবে এসেছে আর খামোকা স্বপ্নলোকে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে।

এইসব গল্প উপন্যাস, হিন্দী সাহিত্যের পাঠককে এমন এক আজগুবী ত্ননিয়ার আজবলোকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত, যেখান থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

এমনই সময়ে হিন্দী সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রেমচন্দের আবির্ভাব ঘটল। মনে হল তমসার পার থেকে প্রথম প্রভাতের উদয় হল। চোখের সামনে থেকে কল্পনার আজগুবী কুয়াসা কেটে গিয়ে গ্রামের

জীবনমুখী ছবি ভেসে উঠল। যেখানে ফসল-সবজির ক্ষেতে ইঁদারায় জল তোলা হচ্ছে, কচি সবুজ সতেজ আখের চারা লকলকিয়ে উঠছে। তালি-মারা শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে কিষান-বৌ মাথায় তরকারির ঝুড়ি নিয়ে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার কোলের ছেলে ক্ষেতভরা কড়াইশুঁটির হিল্লোলের দিকে কচি কচি আঙ্গুল নাড়াচ্ছে। টাট্টু ঘোড়ায় ঠকঠকিয়ে চলেছে গাঁয়ের মহাজন। কোথাও দাওয়ায় বসে গ্রামের শেখ জুম্মন আর দামড়ীরাম দুনিয়ার হাল-চাল নিয়ে অন্তহীন আলোচনায় ব্যস্ত। ঘরে ঘরে গাই দোওয়ার, চাল কোটার আওয়াজ। চাষবাস আর খাজনা টেক্‌সো, ঋণ-কর্জ আর বন্ধক, চাষী আর মহাজন, জমিদার আর তার পেয়াদা; অনবরত, দুঃখভোগ আর তা থেকে উদ্ধারের অনন্ত স্বপ্ন, কোথাও দুর্বল প্রয়াস, কোথাও শক্তিমত্তার আভাস—সব নিয়ে পল্লী-জীবনের নিটোল খতিয়ান। যে জীবনের বাসিন্দারা অটল সংকল্প আর অমিত বিশ্বাস নিয়ে জীবনের সঙ্গে যুঝে চলে আর ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভেঙে যেতে থাকে। এই অদৃশ্য ভাঙনের, এই অবিরাম ক্ষয় আর ধ্বসের মুখোমুখী নড়বড়ে পল্লী-সমাজের জীবনচরিত—প্রেমচন্দের কাহিনীর আখ্যান-ভাগে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলল। তাঁর গল্প আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে অভাব আর অনটনের অথৈ সমুদ্রের ছবি, গরীব কিষাণ সে-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, সাগর তার সর্বস্ব একটু একটু করে গ্রাস করছে—তবুও ভাঙনের উপকূলে দাঁড়িয়ে তার ব্যাকুল জিজীবিষা, পুরণো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তখনো তার সুস্থ, সমৃদ্ধ, সুখী হবার ইচ্ছা। হিন্দী সাহিত্যের পাঠক এই প্রথম অবাক হয়ে ভাবতে শেখেন—তাইতো, বাস্তবের গল্পই আসল গল্প তো!

প্রেমচন্দ পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ফলে আদর্শবাদ আর চরিত্রগঠনের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। মহাত্মা গান্ধী আর টলস্টয়ের জোরালো প্রভাব ছিল তাঁর ওপর। তাই তাঁর কাহিনীতে এই দুই মনীষীর জীবন-দর্শন গভীর রেখাপাত

করেছে। তৎকালীন ভারতীয় গণমানসের অনুরূপ প্রেমচন্দের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় দুঃখকষ্টের অবসান হবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতে ন্যায়-বিচারের অধিকার এলেই গ্রামের সর্বসাধারণ ন্যায়ের পথে চলতে থাকবে এবং স্বর্গরাজ্য কায়েম হয়ে যাবে। কিন্তু উত্তরকালে গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ কমে যায় এবং তিনি প্রগতিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি আরো কিছুকাল জীবিত থাকলে আমরা পৃথিবীর এক মহান্ প্রগতিপন্থী লেখকের সান্নিধ্য পেতাম। ভাবতে অবাক লাগে, আজ গেন্নাদি কলিনোভস্কি, নিকোলাই ভরোনক, য়ুরি কোজাকোভের মত সোভিয়েৎ লেখকদের হাত দিয়ে যে সব জাতের লেখা বেরোচ্ছে—আজ থেকে কতদিন আগে প্রেমচন্দ অবিকল সেই ধরণের কাহিনী লিখে গেছেন। অথচ এইসব রুশ লেখকদের জন্মকাল—১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে। য়ুরি কোজাকোভের লেখা একটা কুকুরের গল্প আছে, প্রেমচন্দের কুকুরের গল্পের সঙ্গে তার অপূর্ব সাদৃশ্য। রুশ লেখক ভ্যালেরি ওসিপোভ কি আনাতোলী কুজনেৎসোবের জন্ম ১৯৩০ সালে। তাঁরা আজ যে জাতের গল্প লিখছেন তাঁরা যখন মায়ের কোলে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছেন আর আধ-আধ বুলি বোলছেন—সেই কালে প্রেমচন্দ ঐ জাতেরই প্রচুর গল্প লিখে গেছেন। ইংরেজরা তখন এদেশের প্রভু। সংবর্ধনা জানাতে তাঁদের প্রভুত্বের অহমিকায় বাধত। ভারতীয় ভাষার লেখকদের প্রতি তাদের সেই অবজ্ঞার ভাব আজও পুরোপুরি ঘোচে নি। রুশ দেশের লোকের এ কমপ্লেক্স্ ছিল না। তারা প্রেমচন্দকে নিবিড় করে আপন করে নিতে পেরেছেন। আজও সে-দেশের সুধীজন বলে থাকেন যে—রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ, যশপাল আর খাজা আহম্মদ আব্বাসের কাহিনীই তাঁদের চোখের সামনে ভারতীয় জন-জীবনের গবাক্ষ উন্মোচন করেছে।

প্রেমচন্দ দীর্ঘায়ু লেখক ছিলেন না। ১৯৩৬ সালের ৮ই অকটোবর, মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দী সাহিত্যের

ক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্য সম্মান তিনি বেঁচে থাকতে পান নি। হ্যাঁ, 'উপন্যাস-সম্রাট' উপাধি পেয়েছিলেন বটে, তবে তার গুরুত্ব ঐ তাসের দেশের রাজার বেশি ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর সম্পর্কে লোকের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে। তাঁর অভাবই তাঁর দুর্লভ-ত্বের উপলব্ধি ঘটায়।

সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলায় শরৎচন্দ্র আর হিন্দিতে প্রেমচন্দ তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। প্রেমচন্দ তাঁর গল্পের চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসের সজীব রূপরেখা অংকন করতেন। শরৎচন্দ্র সে-যুগের ইতিহাস আর সমাজের পটভূমি থেকে তাঁর চরিত্রটিকে তুলে নিতেন, এবং তাঁর গল্পে সেই ব্যক্তি-মানসের সুখদুঃখ, ঘাতপ্রতিঘাতের নিপুণ চিত্রায়ণ ঘটাতেন। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক। তাঁর আগমন একটি চিহ্নিত ঘটনা। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাভাষী পাঠক তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন। হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দের প্রবেশ এমনই কোনো ঘোষিত পদক্ষেপ নয়। একনিষ্ঠ সাধনা আর দুর্জয় তপস্যায় তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। শুনতে পাই, প্রেমচন্দের নাকি ইচ্ছে ছিল যে তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'সপ্ত-সরোজের' ভূমিকা শরৎবাবু লিখে দেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় গিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর গল্প পড়ে শোনান। গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে শরৎবাবু নাকি বলেছিলেন—"বাংলাভাষায় রবিবাবু বৈ আর কেউ এমন লেখা লিখতে পারবে না। আপনার গল্প সংগ্রহের ভূমিকা লেখার যোগ্যতা, আর যারই থাক অন্ততঃ আমার নেই।"

১৮৮০ সালের ৩১শে জুলাই প্রেমচন্দের জন্ম হয়। বাবার নাম মুন্সী অজায়ব লাল। ডাকঘরের কেরানী ছিলেন। নামমাত্র চাকরী, চাষবাসও নামমাত্র। চাষের আয় যেমন তেমন, চাকরীর টাকাতেই সংসার চলত। প্রেমচন্দের আসল নাম ছিল ধনপত রায়, বাড়িতে আদর করে 'নবাব' বলে ডাকত। তাঁর যখন আট বছর বয়স, তখন মা মারা যান। মায়ের অভাব জীবনে ঘোচে নি। তাই

তাঁর গল্পের অনেক চরিত্রই অল্প বয়সে মাতৃহীন, একান্ত নিঃসঙ্গতায় মানুষ। 'দুধ কা দাম' এমনই একটি গল্প।

যত যাই হোক, তবু ছেলেবেলা সে ছেলেবেলাই। শৈশব এক আলাদা জগৎ। অভাব আসে, ছোঁয় আবার স্বভাব চাপল্যের ঢেউয়ে কোথায় সরে যায়। ছোটবেলায় প্রেমচন্দ মোটেই শান্তশিষ্ট ছিলেন না। আমের বোল এল কি, আমবাগানে ঢিল ছোঁড়ার ধুম। ভাল্লুকের নাচ দেখাতে এসেছে তো তার পেছন পেছন নিরুদ্দেশ যাত্রা। ডাংগুলি তো অতি প্রিয় খেলা। খেলার ছলে এক সঙ্গীর কানই কেটে নিলেন এমন বুদ্ধিসুদ্ধি। জিজ্ঞেস করতে জবাব হল— 'আমি ওর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিলুম।' একবার বাড়ি থেকে পুরো একটা টাকা চক্ষু দান করে মেলা দেখতে যাওয়া হল। উর্দু ফারসি পড়া, আখ আর মটরের ক্ষেতে ঢুকে খুশিমতন কড়াইশুঁটি আর আখ চিবোনো—এই কাজ। ঘরে ছিল বুড়ো ঠাকুমা, মা-মরা নাতির ওপর যার আদর সোহাগের সীমা ছিল না। 'আদর খাও আর গল্প শোন'। প্রেমচন্দের অনেক গল্পে তাঁর নিজের এই মধুর ছেলেবেলার সরস স্বাদ আমরা পাই। এই লেখকের গল্পে চরিত্ররা কখনো দিগ্বলয়ের দিক থেকে হেঁটে আসে না—যাতে তার চেহারা আস্তে আস্তে চোখের ওপর ফুটে ওঠে। প্রেমচন্দের চরিত্ররা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর স্বতঃপরিস্ফুট ব্যক্তি, আমাদের ঘরের মানুষ, চিনতে কোনো কষ্ট হয় না। কারণ, এসব চরিত্র প্রেমচন্দের কল্পনার সৃষ্টি নয়—এসব তাঁর দেখা মানুষ, দেখা ঘটনা, চেনা পরিবেশ, বহু আবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতি। এসব তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জীবনে বহুবার এসবের সঙ্গে মোকাবেলা হয়েছে তাঁর। তারপর সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন অন্তরের মণিকোঠায়। তাঁর কাহিনীগুলি সেই প্রত্যক্ষেরই প্রতিফলন।

তের বছর বয়সে উর্দুর যাদুকাহিনী আর রহস্য রোমাঞ্চ পড়ে পড়েই তাঁর সাহিত্য প্রীতির উন্মেষ ঘটে। ১৮৯৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই চুনারের লণ্ডন মিশন স্কুলে পড়ানোর চাকরী পান।

তারপরে এলেন সরকারী চাকরীতে। বহরাইচে শিক্ষক হয়ে গেলেন। কয়েকমাস পরে প্রতাপগড়ে বদলি হয়ে গেলেন। সেখানে বসেই ১৯০১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন। উর্দু ভাষায় লেখা, নাম দেন—'অসরারে ম্‌ভগবিদ' অর্থাৎ দেবস্থান রহস্য। উপন্যাসটি ১৯০৩ সালে বারাণসীর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছেপে বেরোয়।

কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ ঘটে কানপুরে আসার পর। কানপুরে তখন মুনসী দয়ানারায়ণ নিগম, উর্দুতে 'জমানা' বলে একটা মাসিক পত্রিকা বের করতেন। নিগম সায়েবের সঙ্গে প্রেমচন্দের খুব বন্ধুত্ব হল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ইংরিজি অনুবাদ ওঁর হাতে পড়ে। প্রেমচন্দ অভিভূত হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুলি উর্দুতে অনুবাদ করে 'জমানা'তে প্রকাশ করলেন। ১৯০৭ সালে তাঁর প্রথম লেখা গল্প—'সনসার কা সবসে অনমোল রত্‌ন' 'জমানা'য় ছাপা হয়। তখন বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের যুগ। সেইসময় প্রেমচন্দ দেশপ্রেম-উদ্দীপ্ত পাঁচটি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সংকলনের নাম দেন—'মোজে বতন' (মাতৃভূমির বিষাদগাথা)। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। বই বেরোবার ছ'মাসের মধ্যেই লেখক সরকারী কোপে পড়লেন। কোনমতে চাকরী রক্ষা পেল যদিও, বইয়ের প্রতিটি কপি সরকারে বাজেয়াপ্ত হল। লেখক এরপরই ছদ্মনাম নিলেন। ১৯১০ সালে, সর্বপ্রথম 'প্রেমচন্দ' এই ছদ্মনামে তাঁর 'বড়ে ঘর কী বেটি' শীর্ষক গল্প প্রকাশিত হ'ল।

চাকরীর সূত্রে ইনি চুনার, এলাহাবাদ, বস্তী, কানপুর, গোরখপুর ইত্যাদি নানান্ জায়গায় ঘুরেছেন। বেড়াবার শখও ছিল তাঁর প্রচুর। একবার আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমার বড় সাধ ছিল রেলওয়ে গার্ড হব। বেশ বহু জায়গায় ঘুরব, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হবে, কত কি ঘটনা জানব, কত চরিত্র...' অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে উনি গোরখপুরের নরম্যাল স্কুলে

কাজ করতেন। সেখানেই একদিন গান্ধীজীর ভাষণ শোনার পর মনের অবস্থা এমন হল যে বিশ বছরের সরকারী চাকরী এক কথায় ছেড়ে দিয়ে বেনারসে চলে এলেন। ঠিক করলেন, এখন থেকে শুধু সাহিত্যসেবাই করবেন। কিন্তু সাহিত্যসেবা থেকে জীবিকা চালানো আজও যেমন দুঃসাধ্য, সেদিনও তাই ছিল। প্রেমচন্দের কলম কিন্তু কোনও বাধা মানে নি। একের পর এক গল্প উপন্যাস লেখা এবং ছাপা হতে লাগল। কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। বিত্ত না হোক, খ্যাতি মিলল ঢের। সরকার 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলেন, উনি রাজি হলেন না। বিদেশী সরকারের সম্মানে ওঁর রুচি ছিল না।

বেনারসে প্রেমচন্দের একটা প্রেসও ছিল। সেখান থেকেই ১৯৩০ সালে তাঁর 'হংস' পত্রিকা ছাপা হয়। আবার ১৯৩২ সালে 'জাগরণ' বলে একটা সাপ্তাহিকও বেরোতে থাকে। কিন্তু প্রেস বা পত্রিকায় তাঁর লোকসান হয়। একবার বছর খানেকের জন্যে সিনেমা জগতেও ঘুরে এলেন, দু'একটা কাহিনীর ফিল্মও হল, তবে বিশেষ সুবিধে হল না। আবার বেনারসে ফিরে এলেন। নতুন লেখকদের তিনি নিজে এগিয়ে এসে হাত ধরতেন। তাঁর 'জাগরণ' আর 'হংস' পত্রিকায় লেখেন নি, এমন নতুন লেখক সে-যুগে হিন্দী সাহিত্যে কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না।

লেখক দু'জাতের। এক জাতের লেখক থাকেন—তাঁরা বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কিন্তু জনপ্রিয়তা পান না। আর এক শ্রেণীর লেখক যাঁরা জনপ্রিয়, কিন্তু মামুলী। উঁচুদরের হিত্য কৃতী অথচ জন-চিত্তজয়ী—এমনটা বিরল। প্রেমচন্দ সেই বিরল প্রতিভা।

মানুষ প্রেমচন্দ বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। নম্র, নিরভিমান, মিশুকে, অমায়িক স্বভাব। আচার ব্যবহারে আড়ম্বর নেই, সাদা-মাঠা চালচলন। কথাবার্তায় চাষাভুসোর মতন সহজ। বোঝাই যায় না যে এতবড় একটা লেখকের সঙ্গে কথা কইছি। চাষবাস আর গো-পালনের আলোচনা খুব আগ্রহের সঙ্গে করতেন।

নিজে গরু পুষেছিলেন, তবে ক্ষেতের কাজ করাটায় একটু অসুবিধে ছিল। তাতে নিয়মিত লেখায় বাধা পড়ত। আইডিয়া বা মুড নিয়ে তাঁর কখনো মাথাব্যথা দেখি নি। লেখার সময় হয়েছে, কলম নিয়ে বসে গেলেন, লেখা শুরু হয়ে গেল। কেউ এল, লেখা থামালেন, আলাপচারী করলেন। সেও চলে গেল, ব্যস উনিও নির্বিকারচিত্তে আবার লিখতে বসে গেলেন। প্রেমচন্দের হাসি ছিল খুব দরাজ। হাসির কথা একবার পড়লে হয়, সে কি হাসি, হাসি তো নয় যেন ভূমিকম্প।

প্রেমচন্দ নেই। প্রেমচন্দ অনেক দিন হল চলে গেছেন। তাঁর আসন আজও খালি। বোধ হয় চিরদিনই খালি থাকবে।

রাধাকৃষ্ণ

সূচীপত্র

ভেন্ন

প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর ভোলা মাহাতো দ্বিতীয়বার বউ ঘরে আনলে, তার ছেলে রঘুর সুখের দিন ঘুচল। রঘুর বয়স তখন বছর দশেক। খায়দায় আর চোপর দিন পাড়াময় ডাংগুলি খেলে বেড়ায়। নতুন মা ঘরে আসায় এবার তার ঘাড়ে জোয়াল পড়ল। পান্না রূপসী বউ। আর রূপ থাকলেই রূপের গরব থাকবে। এ হল যেন হাঁড়ির সঙ্গে বেড়ির সম্পর্ক। তা সে-গরবিনী গতর নাড়তেও নারাজ। নিজের হাতে কড়ার কুটোটিও নাড়ে না। গোয়াল থেকে গোবর কাড়তেও রঘু, আবার বলদকে জাবনা খাওয়াতেও সেই রঘু। এঁটো বাসনও রঘুই মাজে। ভোলারও চোখে ইদানীং নতুন ঘোর, সে চোখে রঘুর সব-কিছুই মন্দ লাগে, সব তাতেই দোষ। আর পান্নার কথা তো ভোলা চোখ বুজে মেনে নেবেই, এ যে শাস্তরের নিয়ম। রঘুর নালিশ তার বাপ কানে তোলে না। রঘু নাচার হয়ে নালিশ করাই ছেড়ে দিলে। কার কাছে চোখের জল ফেলবে? আর শুধু কি বাপ, সারা গাঁ সুদ্ধ লোকই ওর শত্তুর।—'ভারি একগুঁয়ে ছেলে, পান্নাকে তো মোটে গেরাহ্যিই করে না··· যেন কোথাকার কে! সে বেচারী যে এত কান্না করে মরে, এত যত্ন-আত্তি, এত আদর সোহাগ। তা সবই ভস্মে ঘি ঢালা। নেহাৎ পান্নার মতন ভালোমানুষ সৎমা পেয়েছিল, তাই। হ'ত আর-কোনো মেয়েছেলে, এক হেঁসেলে বাস করতে হত না।' রঘু ভাবে দুনিয়াটাই এই! সবলের উঁচু গলা সবাই শোনে। নিরুপায়ের আকুতি কেউ আমলই দেয় না। দিন যায়, রঘুর মন ধীরে ধীরে তার নতুন মার ওপর থেকে সরে আসে। এমনি করে আট বছর কেটে যায়। একদিন ভোলার নামে শমনের পরোয়ানা আসে।

পান্নার চারটি সন্তান— তিন ছেলে এক মেয়ে। সংসারে মোটা

খরচ, রোজগারের কেউ নেই। রঘু যে ফিরেও তাকাবে না সে তো জানা কথাই। সে তো এখন বিয়ে-থা করে আলাদা হয়ে যাবেই। আর তার বউ এলে সংসারে বেশ ভালো করেই আগুন লাগবে। পান্না চারিদিক অন্ধকার দেখে। তবে রঘুর হাত-তোলায় এ বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে সে বাঁচবে না, তাতে কপালে যাই থাক্। যে সংসারে এতদিন রানী হয়ে ছিল, সেখানে দাসীবাঁদী হয়ে বাস করা তার পোষাবে না। তা ছাড়া এতকাল যাকে গোলাম বলে ভেবেছে, তারই মুখাপেক্ষী হতে হবে! রক্ষে করো। আর তা করতেই বা যাবে কেন? তার রূপ আছে। বয়েসও এমন কিছু নয়। যৌবন আজো ভরভরন্ত। ইচ্ছে করলে এখনো কি নতুন করে সংসার পাততে পারে না? খুব পারে। লোকে হাসবে, পাঁচকথা বলবে! বয়েই গেল। তা ছাড়া ওদের ঘরে এমন তো হামেশাই হয়। বামুন-কায়েতের ঘর তো নয়, যে নাককান কাটা যাবে। ও-সব ঢাকঢাক গুড়গুড় যত ঐ উঁচু জাতের ঘরেই। ওদের অন্দরমহলে যাই ঘটুক-না বার বাড়িতে সব পর্দার আড়াল। পান্নার কী? সে তুনিয়ার লোকের নাকের ওপর দিয়ে অন্যের ঘর করতে যেতে পারে। বেশ করবে। কিসের জন্যে সে রঘুর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে যাবে?

ভোলা মারা যাবার পর এক মাস কেটে গেছে। সেদিন সন্ধে-বেলা পান্না একা একা বসে সাত-পাঁচ চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে, হঠাৎ খেয়াল হল— ছেলেরা এখনো বাড়ি ফেরে নি। তাই তো! ভর সন্ধেবেলা। গাই বলদ মাঠ থেকে ফিরবে, যদি তাদের পায়ের তলায় পড়ে। এখন আর কে আছে যে দোরে দাঁড়িয়ে বাছাদের তদারক করবে। রঘুর তো ওরা তু'চক্ষের বিষ। কখনো হাসিমুখে তুটো কথা কয় না। পান্না আর ঘরে থাকতে পারল না। ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে উঠোনের চালাঘরের দাওয়ায় বসে রঘু আখ কেটে কেটে টুকরো করছে। ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর বাচ্চা মেয়েটা তার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপর চড়ার চেষ্টা করছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না পান্নার। সত্যি দেখছে তো! এ যে নতুন ব্যাপার। হঠাৎ? ও, লোকদেখানি।

ভাইবোনদের ওপর কত দরদ তাই দেখাতে চায় আর কী। ভেতরে ভেতরে এদিকে ছুরি শানাচ্ছে। হুঁঃ আস্ত কালসাপ! কঠোর স্বরে ছেলেদের ডাক দেয় পান্না— তোমরা সব এখানে কী করছ? ঘরে ঢুকতে হবে না? চলে এসো, এখনই গোরুচোরু আসবে।

রঘুর চোখে মিনতি, বললে— থাক্ না মা, আমি তো রয়েছি, ভাবনা কিসের?

পান্নার বড়ো ছেলে কেদার বললে— জানো মা, রঘুদাদা আমাদের দুটো গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এই দেখো, এটাতে আমি আর খুন্নু বসব, আর লছমন আর ঝুনিয়া ওটাতে। দুটো গাড়িই দাদা টানবে।

বলতে বলতে ঘরের কোণ থেকে দুটো ছোটো ছোটো খেলনা গাড়ি টেনে বার করে। গাড়িতে চারটে করে চাকা লাগানো, বসবার জন্যে তক্তা আবার ধরবার জন্যে দু'দিকে দুটো করে হাতল।

পান্না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে— গাড়ি আবার কে বানালে?

কেদার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল, জবাব দিলে— রঘুদা বানাল, আবার কে বানাবে, বললুম না তোমায়? ভগতদের বাড়ি থেকে দা আর বাঁসুলি চেয়ে এনে চটপট করে বানিয়ে ফেলল। আর কী জোরে ছোটে না, কী বলব। খুন্নু তুই বোস, আমি টানি।

খুন্নু গাড়িতে বসল। কেদার টানতে লাগল। চড় চড় শব্দ তুলে রঘুর গাড়ি ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল।

আর-একটা গাড়িতে চেপে লছমন হাঁক দিল—ও দাদা টানো-না। ঝুনিয়াকে কোলে করে গাড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে রঘু এবার গাড়ি নিয়ে ছুটল। ছেলেরা হাত তালি দিতে লাগল। পান্না শুধু অবাক হয়ে দেখছে আর ভাবছে একি সেই রঘু না আর কেউ।

খানিক পরে গাড়ি-দৌড় শেষ হল। ছেলেরা ঘরে ফিরে পরম উৎসাহে যাত্রাপর্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লেগে গেল। ওদের খুশির বহর দেখে মনে হয় বুঝি উড়োজাহাজেই চড়ে এল।

খুন্নু বললে— মা, গাছগুলো সব ছুটছিল।

লছমন বললে— বাছুরগুলোও।

কেদার বলে— আচ্ছা মা, দাদা দুটো গাড়ি একসঙ্গে টানে কী করে?

ঝুনিয়া সকলের ছোটো। তার কথার ভাঁড়ার বেশি নয়। সে অঙ্গভঙ্গি দিয়েই তার অভিব্যক্তি জাহির করল। ছোট্ট ছোট্ট হাতে তালি দিয়ে নেচেকুঁদে একশা করল। ওর চোখ দুটো তখন বেজায় খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

খুন্নু বললে—জান মা, এবার আমাদের গোরুও কেনা হবে। দাদা গিরিধারীকে বলেছে আমাদের একটা গাই এনে দিতে। গিরিধারী বলেছে কাল আনবে।

কেদার— তিন সের করে দুধ দেয়, মা। খুব দুধ খাব আমরা।

রঘু ঘরে ঢুকতে পান্না খানিকটা অবজ্ঞার ভ্রূকুটি হেনে জিজ্ঞেস করলে— তুমি নাকি গিরিধারীর কাছে গোরু কিনতে চেয়েছ?

রঘু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে তাকাল, বললে— হ্যাঁ, চেয়েছি। কাল আনবে বলেছে।

পান্না— তা টাকাটা আসবে কার বাড়ি থেকে। সে কথা চিন্তা করেছ?

রঘু— করেছি। আমার গলার এই গিনিটা বেঁচে পঁচিশ টাকা পাচ্ছি। পাঁচ টাকা বাছুরের বাবদ বায়না দিয়ে দোব। দিলেই গোরুটা আমাদের হয়ে যাবে।

পান্না একেবারে নিথর হয়ে রইল। রঘুর ভালোবাসা আর সহানুভূতি তার অবিশ্বাসী মনকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললে— সোনার জিনিসটা বেচবে কেন? এক্ষুনি গোরু কেনার কী দরকার? হাতে পয়সা কড়ি আসুক, তখন না-হয় কিনো'খন। গলাটা খালি খালি দেখাবে, ভালো দেখাবে না। এতদিন তো গোরু ছিল না, বাচ্চারা তো আর মরে যায় নি।

রঘু বললে— ছেলেপুলের এই তো খাবার বয়েস ছোটো মা। এই বয়েসে না খেলে, কবে খাবে? আর, ও সোনাদানা পরতে আমার ভালোও লাগে না। লোকেই বা কী বলে, বাপ মরে গেল, ছেলে গিনির লকেট গলায় দিয়ে ঘুরছে।

গোরু কেনার চিন্তা মাথায় নিয়েই ভোলা মাহাতো মরেছে। সংগতি হয় নি, তাই গোরুও জোটে নি। নিরুপায়। আর আজ এত বড়ো

একটা সমস্যা রঘু কত সহজে কেমন এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিল। জীবনে আজ এই প্রথম বার পান্না রঘুর দিকে ভরসার চোখে তাকাল। বললে— তা যদি গয়নাই বেচতে হয়, তো তোমার মোহর কেন? আমার হাঁসুলিটাই নাও না।

রঘু—ধুৎ। তোমার গলায় হারটা কত সুন্দর মানায়। বেটাছেলের আবার গয়না পরা কী? তুমিও যেমন!

পান্না— যা যা। আমি একটা বুড়ি, হার গলায় দিয়ে ঘুরলে, লোকে বলবে কী? তুই এখনো বাচ্ছা ছেলে, তোর খালি গলা ভালো ঠেকে না।

রঘু মুচকি হাসে— তুমি বুড়ি হয়ে গেলে এর মধ্যে? বললেই হল। গোটা গাঁয়ে আর-একটা সুন্দরী বার কর দিকি তোমার মতন।

রঘুর ছেলেমানুষি উক্তিতে পান্না লজ্জা পায়। তার রুক্ষ শুকনো মুখের ওপর ঈষৎ প্রসন্ন লালিমার আভাস ফুটে ওঠে।

দুই

পাঁচ বছর কেটে গেছে। আজ রঘুর মতন আদর্শ কিষান গাঁয়ে আর দুটি মেলা ভার। যেমন মেহনত করতে পারে। তেমনি সৎ স্বভাব। আর এককথার মানুষ। খাঁটি লোক বলে তার খাতির আছে। বাড়িতেও পান্নার মত না নিয়ে রঘু কোনো কাজ করে না। দেখতে দেখতে তেইশ বছর বয়স হল রঘুর। পান্না রোজই বলে, আর কি, এবার বউকে নিয়ে আয়। আর কতকাল বাপের বাড়িতে পড়ে থাকবে? এটা কি ভালো দেখায়? লোকেই বা কী বলে? তারা আড়ালে আমার বদনাম করে। বলে ও-ই বউ আনতে দেয় না। রঘু এ-সব কথা বিশেষ আমলে আনে না। বলে, হবে'খন, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আসলে লোকমুখে বউয়ের ভাবগতিকের কিছুটা আঁচ পেয়েছিল। কাজেই ওরকম মেয়েছেলে

ঘরে এনে ঘরের সোয়াস্তি নষ্ট করার সাধ ছিল না তার।

পান্না কিন্তু শুনল না। একদিন নাছোড়বান্দা হয়ে ধরল। বললে,— কী ব্যাপার বলো তো। বউকে কি আনবে না?

রঘু বললে, বলছি তো হবে'খন। এত তাড়া কিসের?

পান্না— তোমার তাড়া না থাকতে পারে, আমার আছে। আমি আজই লোক পাঠাচ্ছি।

রঘু বললে— পাঠাও। পরে পস্তাবে। সে-মেয়ের মেজাজ ভালো নয়।

পান্না বললে— তুই রাখ্ তো। আমি মুখে কুলুপ এঁটে থাকব। মেজাজ দেখাবে কাকে। হাওয়ার সঙ্গেও কোঁদল করতে পারবে না। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ সব আমি একলা কাঁহাতক সামলাব। বউ বাড়িতে এলে, দুটো ফুটিয়ে দিতে পারবে তো। আমি আজই আনতে পাঠাচ্ছি।

রঘু বললে— তোমার খুশি হয়, আনিয়ে নাও। কিন্তু দেখো, পরে আবার আমায় দোষ দিয়ো না যেন। বোলো না যে বউকে বাগে রাখতে পারে না, বউয়ের ভেড়ো।

—না না বলব না। তুই ওঠ তো। বাজার থেকে শাড়ি আর মিষ্টি নিয়ে আয়।

কদিন পরেই মুলিয়া বাপের বাড়ি থেকে এল। দোরে নহবৎ বাজল। শাঁখের ধ্বনি আর সানাইয়ের সুরে আকাশ ভরে উঠল। গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করে বউয়ের মুখ দেখল। মুখ না মুখচন্দ্রিমা। পাকা গমের মতো রঙ, বড়ো বড়ো চোখের ভারী পল্লবে দীর্ঘপক্ষের ঘনছায়ার সারি, কপোলে ঈষৎ অরুণিমা, চাউনিতে মদিরার দুর্নিবার টান। রঘু বেচারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

মুলিয়া খুব ভোরে উঠে ঘড়া নিয়ে জল আনতে যায়। তার গায়ের গোধূমবরণে রোদের সোনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। উষার ভাঁড়ারে রূপরসগন্ধসুষমার যা-কিছু সওদা ছিল, মনে হয় সবই সেই রূপের চুম্বকে বাঁধা পড়ে গেছে। রঘু বেচারা একবার দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

তিন

মুলিয়া বাপের বাড়ি থেকেই আগুন হয়ে এসেছিল। সোয়ামী মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খেটে মরবে, আর সৎ শাশুড়ি রানীর মতন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, তার ছেলেরা নবাবজাদা সেজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে— এ-সব বরদাস্ত করার বান্দা নয় সে। কারুর দাসীবাঁদী হয়ে থাকতে ওর বয়েই গেছে। বলে, পেটের ছেলেই বড়ো আপন হয়, যে সতাতো ভায়ে কন্না করবে। এখনো পাখা গজায় নি তাই রঘুকে ধরে আছে। একবার পাখনায় জোর পেলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। তখন আর কেউ কারো নয়। ফিরেও চাইবে না। হুঁ সবাই সেয়ানা···

এর মধ্যেই ফাঁক বুঝে একদিন স্বামীকে বলল, তোমার যখন এত শখ, গোলাম হয়েই থাকো, আমি পারব না।

রঘু বললে— তা কী করব, তুমিই বলে দাও। ছেলেরা তো এখনো লায়েক হয় নি যে সংসারের ভার ঘাড়ে নেবে।

মুলিয়া— বলি, ছেলেরা তো তোমার ছেলে নয়। তারা তোমার সৎমা-র ছেলে। এই পান্নাই একদিন তোমাকে কত খোয়ার করে তবে একমুঠো খেতে দিত, সে-সব মনে নেই বুঝি? আমি সব শুনেছি। যাই হোক, আমি এ-সংসারে ঝি খাটতে আসি নি, সেটা জেনে রেখো। এ সংসারে কী আয়, কী খরচ, আমি তার কোনো হিসেবই জানি না। টাকাকড়ির হিসেব কেন থাকবে না আমার হাতে, আমি জানতে চাই। তুমি কী আনো, আর সেই ঠাকরুণের হাত দিয়ে কোথায় কী খরচ হয়, কিছুই জানি না। তুমি বোধ হয় ভাব, ঘরের টাকা ঘরেই থাকছে। কিন্তু ওদিকে সব ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। একদিন দেখবে, একটা কানাকড়ির দরকার হলেও তোমার জুটবে না— এই বলে দিচ্ছি। দেখে নিয়ো।

রঘু— টাকা পয়সা তোমার হাতে দিলে দুনিয়ার লোকে 'ছি ছি'

করবে না ?

মুলিয়া— যার যা খুশি হয় বলুক। আমি দুনিয়ার লোকের ধার ধারি না। তুমিও দেখে রেখো, ঐ খেটে মরাই সার হবে তোমার। 'ভাই'! তা এতই যদি টনটনানি তোমার ভায়েদের জন্যে, তুমি মরো, আমি কেন মরতে যাব ?

রঘু কোনো জবাব দিল না। সে যা ভয় করেছিল তাই হতে চলেছে! কিন্তু এত শিগ্‌গির! এখন যা মনে হচ্ছে, ও খুব শক্ত হয়ে চললেও বড়ো জোর আর ছ মাস এক বছর সামলে চলা যাবে। তারপর ডিঙি উলটে যাবে। ও ঠেকাতে পারবে বলে ভরসা নেই। ভেড়ার মা আর কদ্দিন নেকড়ে ঠেকাবে ?

বরষা শুরু হয়ে গেছে। মহুয়া শুকোতে দেওয়া হয়েছিল, পান্না সকাল থেকে তাই নিয়ে ঝাড়া-তোলায় ব্যস্ত। ওদিকে খামারের ফসল ভিজে যাচ্ছে। পান্না মুলিয়াকে ডেকে বললে— বউ, একটু নজর রাখিস, আমি চট করে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।

মুলিয়া উপেক্ষার সুরে জবাব দিলে— আমার ঘুম পেয়েছে। দেখতে হয় তুমি বসে দেখো। একদিন চান না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

পান্না হাতের কাপড় রেখে দিল, নাইতে গেল না। মুলিয়ার চালটা ভেস্তে গেল।

এর দিনকতক বাদে একদিন সন্ধেবেলা পান্না ধান পুঁতে সবে ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। দিনভর পেটে কিছু পড়ে নি। আশা করেছিল বাড়ি ফিরে দেববে বউ হয়তো রুটি গড়ে রেখেছে। হেঁসেলে উঁকি দিয়ে দেখলে— উনুনে আঁচও পড়ে নি। বাচ্চাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে। খুব নরম করে মুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল— হ্যাঁ বউ, আজ এখনো উনুনে আগুন পড়ে নি ?

জবাব দিল কেদার, বললে— আজ দুপুরেও উনুন ধরে নি। বউদি কিছু রান্না করে নি।

পান্না— তা তোরা কী খেলি ?

কেদার— কিছু না। রাত্তিরের বাসি রুটি ছিল, খুন্নু আর লছমন তাই খেয়েছে। আমি ছাতু খেয়েছি।

পান্না—আর বউ ?

কেদার— সে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, কিছু খায় নি।

পান্না সঙ্গে সঙ্গে উনুন ধরাল। রাঁধতে বসল! আটা মাখতে মাখতে ওর কান্না পেয়ে গেল। কী কপাল ওর। সারাদিন তেতে-পুড়ে ক্ষেতের কাজ, আবার বাড়ি এসেও উনুনের সঙ্গে যুদ্ধু।

কেদার চোদ্দ বছরে পা দিয়েছে। বউদির রকমসকম দেখে বুঝতে আর কিছু বাকি নেই ওর। বললে, বউদি বোধ হয় আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না মা।

পান্না চমকে উঠল। বললে— কেন, কিছু বলেছে নাকি ?

কেদার— না, বলবে আবার কী। কিন্তু ওর মনের ইচ্ছেটা তাই। তা তাই যখন ওর ইচ্ছে, তুমিই বা ওকে আটকে রাখতে চাইছ কেন। ও ওর খুশি মতন থাকুক। আমাদের মাথার উপর ভগবান আছেন।

পান্না জিভ কেটে বললে— চুপ। আমার সামনে এমন কথা ভুলেও মুখে আনবে না। রঘু তোমাদের বড়ো ভাই নয়, ওই তোমাদের বাপ। এ-সব কথা নিয়ে বউকে কিছু যদি বল, তো জেনে রেখো আমি বিষ খেয়ে মরব।

চার

দশহরার পর্বের দিন এল। গ্রাম থেকে কোশখানেক দূরে মেলা বসেছে। পাড়ার সব ছেলেপুলে ঝেঁটিয়ে মেলা দেখতে গেছে। পান্নাও ভাবছিল ছেলেপুলে নিয়ে মেলায় যাবে। কিন্তু পয়সা কোথায় পায় ? চাবি আজকাল মুলিয়ার আঁচলে।

রঘু এসে মুলিয়াকে বললে— ছেলেরা মেলায় যাবে, সকলের হাতে

দুটো করে পয়সা দিয়ে দে।

মুলিয়া ঝেঁঝে উঠল। বললে— ঘরে অত পয়সা নেই।

রঘু— এই তো সেদিন তিল বিক্কিরি হল। এর মধ্যেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল?

মুলিয়া— হ্যাঁ, গেল।

রঘু— গেল বললেই হল! কী করে ফুরলো, শুনি। পার্বণের দিন, বাচ্চাগুলো মেলা দেখতে যাবে না তা ব'লে?

মুলিয়া— যাও না, মাঠাকরুণকে বলোগে, পয়সা বের করে দিন। পুঁতে রেখে কী হবে?

খুঁটির গায়ে চাবি লটকানো ছিল। রঘু চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলতে যেতে, মুলিয়া এসে ওর হাত চেপে ধরল। বললে— চাবি দিয়ে দাও, নইলে ভালো হবে না। খেতে পরতে দিতে হবে, বইপত্তর কিনে দিতে হবে, আবার মেলা দেখতে যাবার শখ মেটাতে হবে। বাঁচি না! পাড়ার লোক খেয়েদেয়ে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াবে বলেই রক্ত জল করে কামানো হচ্ছে, না?

পান্না এতক্ষণে মুখ খুলল। রঘুকে বললে— পয়সার কী দরকার বাবা, ওরা মেলায় যাবে না।

রঘু ঝেঁঝে উঠে বললে— যাবে না কী রকম। গাঁ সুদ্ধু সবাই যাচ্ছে, আর এ বাড়ির বাচ্ছারা যাবে না?

বউয়ের হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে রঘু সিন্দুক খুলে পয়সা বের করে এনে ছেলেদের হাতে দিলে। তারপর চাবি মুলিয়ার হাতে দিতে গেল। মুলিয়া চাবির গোছা টান মেরে উঠোনে ফেলে দিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ছেলেরা মেলা দেখতে গেল না।

দিন দুই পরের কথা। সকাল থেকে মুলিয়াও খায় নি, পান্নাও কিছু মুখে দেয় নি। রঘু একবার একে সাধছে, একবার ওকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু কেউ উঠছে না। শেষে হাল্লাক হয়ে রঘু মুলিয়াকে জিজ্ঞেস করলে— আচ্ছা তুমি কী চাও একবার মুখ ফুটে বলো তো।

মুলিয়া দেয়ালকে ডেকে বললে— আমি কিছু চাই না। আমাকে

বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

রঘু— ঠিক আছে, তাই হবে। এখন ওঠো, রান্না-খাওয়া করো।

এবার মুলিয়া রঘুর দিকে ফিরে তাকাল। তার মূর্তি দেখে রঘুর প্রাণ উড়ে গেল। কোথায় সে মধুর লাবণ্য, আর কোথায় বা সেই মোহিনী মায়া। সব উবে গেছে। কোঁচকানো ঠোঁটের আড়ালে দাঁত বেরিয়ে এসেছে, বড়ো বড়ো চোখ যেন ফেটে পড়ছে, নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠেছে। ভাঁটির আংরার মতন জ্বলজ্বলে লাল চোখ থেকে আগুন ধরিয়ে মুলিয়া বলল— ও, সৎ মা ঠাকরুণ বুঝি এই মন্তর পড়িয়েছেন? অ্যাঁ! আমাকে কি এতই কাঁচা ঠাউরেছ? বড়ো মজা না? আমি বুকে বাঁশ ডলব তোমাদের। আছ কোন্ আহ্লাদে। খুব সোজা পেয়েছ আমাকে—না?

রঘু— আচ্ছা আচ্ছা, তাই বাঁশই ডলিস বুকে। এখন ওঠ, দুমুঠো খেয়েদেয়ে নে, গায়ে তাকত না পেলে বাঁশ ডলবি কেমন করে?

মুলিয়া— না, হাঁড়ি আলাদা না হলে দাঁতে কুটো কাটব না আমি। ঢের সহ্য করেছি, আর সইব না।

রঘু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুরো একটা দিন ওর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। আলাদা হবার কথা কোনোদিন ও দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি। গ্রামে দু-চারটে পরিবারকে এরকম আলাদা হতে ও দেখেছে। ভালো হয় না ওতে। হাঁড়ি ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপরও পাঁচিল পড়ে, ও খুব ভালো করে জানে। নিজের লোক এক-মুহূর্তে পর হয়ে যায়। ভায়ে ভায়ে সম্পর্ক ঘুচে যায়, পাড়াপড়শি হয়ে যায়। রঘুর সংকল্প ছিল, এই চরম সর্বনাশকে নিজের ঘরে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু নিয়তিকে ও ঠেকাবে কী করে? উঃ! মুখে চুনকালি পড়ল ওর। দুনিয়ার লোকে বলবে, বাপ মরার পর দশটা বছরও এক হাঁড়ি টিঁকল না। আর কার সঙ্গে আলাদা হচ্ছি? না যাদের নিজের সন্তানের মতন কোলেপিঠে করে মানুষ করলুম, যাদের জন্যে কষ্টকে কষ্ট মনে করলুম না কোনোদিন— তাদের সঙ্গেই বিচ্ছেদ। নিজের স্নেহের ধনদের গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেব? গলার স্বর বুজে এল রঘুর। বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে মুলিয়ার দিকে চেয়ে

রঘু বললে— আমার ভায়েদের আমি আলাদা করে দেব? ওদের থেকে ভেন্ন হয়ে যাব? এই চাও তুমি? কী বলছ একবার ভেবে দেখেছ? মুখ দেখাব কী করে?

মুলিয়া— আমার এক কথা। ওদের সঙ্গে আমার বনবে না।

রঘু—তা হলে তুমি আলাদা হয়ে যাও। আমাকে টানাহেঁচড়া করছ কেন?

মুলিয়া— তা তোমার ঘরে কি আমার জন্যে মণ্ডা মেঠাই বসানো আছে? নাকি আমার ত্রিভুবনে কোনো চুলোয় জায়গা নেই?

রঘু— তোমার যেখানে খুশি, যেমন করে খুশি থাকোগে যাও না। আমি আমার ঘরের লোকদের ছেড়ে আলাদা হব না। এ বাড়িতে যেদিন দুটো হাঁড়ি চড়বে, সেদিন আমার বুকও ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাবে। সে আমি সহ্য করতে পারব না। বলো তোমার কী অসুবিধে, কী কষ্ট, আমি বিহিত করবার চেষ্টা করব। আমার যা সাধ্যে কুলোয় আমি করতে পিছপাও হব না। ঘরসংসারের যাবতীয় যা-কিছু আসবাব পত্তর, বাসন-কোসন সব তোমার হাতে, খাবার দাবার কাপড় গয়না সব-কিছুরই মালিক তুমি— আর কী বাকি আছে, কী তোমার অভাব, আমায় বলো। তোমার যদি সংসারের কাজকর্ম করতে মন না চায়, কোরো না তুমি। ভগবান যদি আমাকে তেমন দিন দিতেন, তোমায় নড়ে বসতে দিতুম না, কুটোটি নাড়তে হত না তোমায়। তোমার সুখের শরীর নধর হাত-পা, গতর খাটার জন্যে নয়, তা জানি। কিন্তু কী করব, আমার উপায় নেই। তবুও বলছি ভালো না লাগে কাজকম্ম করতে হবে না তোমায়। কিন্তু দোহাই তোমার, দুটি পায়ে ধরছি, আমায় ভেন্ন হতে বোলো না।

মুলিয়া এবার রঘুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল, মাথা থেকে আঁচলটা ফেলে দিয়ে ফিসফিস করে বললে— আমি কাজ করতে ভয়ও পাই না, বসে বসে খেতেও চাই না। কিন্তু কারুর চোখরাঙানি আমার ধাতে সয় না। তোমার সৎমা সংসারের কাজকম্ম করেন বলে আমার মাথা কেনেন নি। সে খাটে তার নিজের গরজে, তার নিজের ছেলে-

পুলের মুখ চেয়ে। আমার কী উদ্ধার করেন যে আমায় মেজাজ দেখাতে আসেন ? তার ছেলেমেয়ে আছে, আমার তুমি ছাড়া আর কে আছে ? আমি কার মুখ চেয়ে খেটে মরি ? বাড়িসুদ্ধু লোক আয়েস করবে, জনাজাতি দুধেভাতে থাকবে, আর যার দৌলতে গুষ্টিসুদ্ধু বেঁচে আছে সে মুখ শুকিয়ে বেড়াবে, তার মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই— এ আমি চোখে দেখতে পারি না। একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ, কী চেহারা হয়েছে ? আর-সকলের কী ? তাদের ছেলেরা তো দু-চার বছরের মধ্যেই সব লায়েক হয়ে উঠবে। আর তোমার যে আর ক'বছর গেলে খাটে চড়ার হাল হবে তখন কি কেউ দেখতে আসবে ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো এখানে। পালাচ্ছ কেন ? আমি তোমায় বেঁধে রাখব না আঁচলে গিঁঠ দিয়ে। নাকি, গিন্নিঠাকরুণ বসবার হুকুম দেন নি। কী আর বলব তোমায় ? ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, তোমার মতন মাথামোটা দুটো দেখি নি। এমন বৈরিগী মানুষের পাল্লায় পড়ব তা আগে জানলে, এ সংসারে ভুলেও পা দিতুম না। এলেও মনটা আর-কোথাও রেখে আসতুম। কিন্তু এখন আর উপায় কী। এখন যে মনপ্রাণ সব এখানে তোমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। এখন বাপের বাড়ি চলে গেলেও মনটা এখানে পড়ে থাকবে। কপাল আমার ! আমি তোমার কথা ভেবে জ্বলে মরি। আর তুমি আমার দিকে ফিরেও চাও না।

মুলিয়ার এই-সব সোহাগের কথায় রঘুর মনের কিছু ইতর বিশেষ হল না, সে তার কোট আঁকড়ে রইল। বললে— শোনো মুলিয়া, ও আমার দ্বারা হবে না। আলাদা হবার কথা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠছে। এ ধাক্কা আমি সইতে পারব না।

মুলিয়া ব্যঙ্গ করে বলল— তা হলে যাও, চুড়ি পরে অন্দরমহলে বোসোগে। আমিই বরং গোঁফ লাগিয়ে বেটাছেলে হয়ে দাঁড়াই। ছি ছি, ভাবতুম হাজার হোক পুরুষ মানুষ, শরীরে তেজ আছে। এখন দেখছি একেবারে কাদার তাল।

দাওয়ার একধারে দাঁড়িয়ে পান্না এতক্ষণ চুপ করে দুজনের কথা-বার্তা শুনছিল। আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। এগিয়ে এসে

রঘুকে বলল— বউ যখন ভেন্ন হবে বলে পণ করেছে, তখন তুমিই বা কেন ওকে জোর করে বেঁধে রাখতে চাইছ? তুমি ওকে নিয়ে আলাদা থাকো। আমার ভগবান আছেন, ওপরঅলা। মাহাতো যেদিন চোখ বুজল, সেদিন একটা কুটোর আশ্রয়ও ছিল না, তখনো যদি তিনি দেখে থাকেন, এখনো দেখবেন, ভয় নেই। এখন তো তাঁর দয়ায় ছেলে তিনটে বড়ো হয়ে উঠেছে। চিন্তা কিসের।

রঘু জলভরা চোখে সৎমার দিকে তাকাল। বললে— তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে ছোটো মা? হাঁড়ি আলাদা হলেই মনও ভেঙে যায়— এটা বোঝ না?

পান্না— ও যখন বুঝবেই না, তুমি কী করবে? ভগবানের যদি এই ইচ্ছে থাকে, কে কী করতে পারে? অদৃষ্টে যতদিন একসঙ্গে থাকা লেখা ছিল ততদিন থেকেছি। এখন ওপরঅলার এই ইচ্ছে, তাই হোক। তুমি আমার ছেলেপুলের জন্যে যা করেছ, তা আমি কখনো ভুলতে পারব না। তুমি যদি ওদের মাথার উপর না দাঁড়াতে তবে আজ ওদের যে কী গতি হত, ভাবতেও ভয় করে। কার দোরে ওরা মাথা খুঁড়তে যেত, হয়তো দোরে দোরে ভিক্ষে মাগতে হত, কে জানে? আমি মরার দিন অব্দি তোমার নাম করব। ভেন্নই হই আর যাই হই, যদি কখনো কোনো দরকারে লাগি, তুমি 'তু' করে ডাকলেই ছুটে আসব। বুক দিয়ে পড়ে করব। এটা মনে রেখো, যখন যেখানে থাকি, তোমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল চিন্তা কখনো করব না। তোমার ক্ষতির চিন্তা মাথায় আসার আগেই গলায় দড়ি দেব। ভগবান করুন তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো, দুধেভাতে থাকো, তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক। তোমার ঘর ভরে উঠুক। তুমি শতায়ু হও, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠো। চিরজীবন তোমায় এই আশীর্বাদ করে যাব। আর আমার ছেলেরা? যদি তারা বাপের বেটা হয়, তবে তোমাকেও তারা বাপের মতন মান্যি করবে।

কথা শেষ করে পান্না চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উঠে গেল। রঘু পাথরের মূর্তির মতন দাওয়ায় বসে রইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা বয়ে চলল।

পাঁচ

পান্নার কথা শুনে মুলিয়া বুঝল এবার ওর পোয়া বারো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ঘরদোরে ঝাঁট দিল, উনুন ধরাল, ধরিয়ে কুয়োয় জল আনতে গেল। ওর কোট বজায় থেকেছে।

পাড়াগাঁয়ে ছেলেমেয়েদের দুটো দল থাকে। একটা হল বউ-ঝিয়ারীদের দল, অন্যটা শাশুড়িদের দল। যে যার নিজের নিজের দলে যায় সলাপরামর্শ করতে, সহানুভূতি আর সান্ত্বনা পেতে এবং দিতে। দু দলেরই আলাদা আলাদা পঞ্চায়েত বসে। কুয়োতলায় মুলিয়ার সঙ্গে আরো দুটি তিনটি বউয়ের দেখা হল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলে— কী হল, আজ তোমাদের বুড়ি অত কান্নাকাটি করছিল কেন।

মুলিয়া বিজয়গর্বে বলল— এতদিন রানী হয়ে বসেছিল তো, রাজ্যি-পাট ছেড়ে যেতে কারই বা ভালো লাগে বলো। আমি ভাই কারুর মন্দ চাই না কোনো দিন। কিন্তু তোমরাই বলো, ঐ তো একটা মানুষের রোজগার। তা একজনের ঘাড়ের ওপর মোড়েন দিয়ে আর কতকাল চলে। আর আমার জানটা কি মানুষের নয়? খাওয়াপরা, শখ-আহ্লাদের সাধ কি আমার হতে নেই? বলো, এই তো বয়েস। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা হলে, তাদের সামলাব না শখ করব? তা নয়, এখন পাঁচজনের কন্না কর, পরের ছেলেপুলের ঝক্কি সামলাও—হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই জন্ম কাটুক। আহা—

সমদরদী এক বউ বললে— যা বলেছিস ভাই। বুড়িদের রকমই এই। জন্মভর বউগুলো সব বাঁদী হয়ে থাকুক। ক্ষুদকুঁড়ো গিলুক আর খেটে মরুক।

আর-একজন বললে— আর হাড় কালি করে যে খেটে মরবে, কার ভরসায়? বলে পেটের ছেলেই ফিরে তাকায় না, তার পরের ছেলের ভরসা! হাতে পায়ে বল এলেই যে-যার পথ দেখবে। বউকে

পুজো করবে, না তোমায় দেখবে। তার চেয়ে বাবা আগেভাগে কাটাছেঁড়া করাই ভালো, পরে আর বদনামের ভাগী হতে হয় না।

মুলিয়া জল নিয়ে ঘরে ফিরল। রান্নাবাড়া শেষ করে রঘুকে ডাকল— যাও নেয়ে এসো। রান্না হয়ে গেছে।

রঘুর কানে কথা গেল না। মাথায় হাত দিয়ে দোরের দিকে চেয়ে ঠায় বসে রইল।

মুলিয়া আবার ডাকল— কী বললুম, শুনতে পাচ্ছ না? রান্না হয়ে গেছে। যাও, চান করে এসো-না।

রঘু— শুনতে পাব না কেন, কালা তো নই। রান্না হয়ে গিয়ে থাকে, খেয়ে নাও। আমার খিদে নেই।

মুলিয়া আর কথা বাড়াল না। উঠে গিয়ে উনুন নিবিয়ে দিয়ে, রুটি তরকারী শিকেয় তুলে রেখে মুড়ি শুয়ে পড়ল।

খানিকপরে পান্না এসে বললে— রান্না হয়ে গেছে, যাও চানটান করে খেয়ে নাও। বউটারও খাওয়া হয় নি।

রঘু তেতে উঠল। বললে— তোমরা কি আমায় বাড়িতে তিষ্টোতে দেবে না? তা হলে বলো মুখে চুনকালি লেপে পাড়ায় ঘুরি। খেতে তো হবেই। আজ না খাই কাল খাব। এখন আমার খাবার রুচি নেই। আমায় খেতে বোলো না কেউ। কেদার পাঠশালা থেকে ফেরে নি?

পান্না— না, আসে নি এখনো, এইবার এসে পড়বে।

পান্না বুঝল, যতক্ষণ না ও বাচ্চাদের খাইয়ে নিজে কিছু মুখে দিচ্ছে, ততক্ষণ রঘু খাবে না। শুধু তাই নয়, ওকে রঘুর সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, কথা কাটাকাটি করতে হবে, এমন ভাব দেখাতে হবে যেন, পান্না নিজেই তফাত হয়ে যেতে চাইছে। নইলে রঘু চিন্তায় চিন্তায় ক্ষয়ে যাবে, বাঁচবে না। মন স্থির করে পান্না আলাদা উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসল। ইতিমধ্যে কেদার আর খুন্নু ইস্কুল থেকে এল। পান্না ছেলেদের বললে— আয় খেতে বোস্।

কেদার বলল— দাদাকে ডেকে আনি?

পান্না— তোমরা খেতে বোসো। তার খাবার, তার বউ আলাদা

করে করেছে।

খুন্নু—দাদাকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি খাবে কিনা।

পান্না— তার যখন ইচ্ছে হবে, খাবে। তুই খেতে বোস তো। তোর অত দরকার কী? যার যখন খুশি হবে, খাবে, নইলে না খাবে। তারা আলাদা রাঁধবে বাড়বে, আলাদা খাবে। কে তাদের কী বলতে যাবে?

কেদার—হ্যাঁ মা, তা হলে কি আমরা আলাদা বাড়িতে থাকব?

পান্না—সে আমি জানি না। তাদের ইচ্ছে হয় এক বাড়িতে থাকবে, না হয় তো উঠোনে পাঁচিল দিতে চায় দেবে।

খুন্নু দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল সামনের খড়ের ঘরে একটা চৌকিতে শুয়ে রঘু ডাবের জল খাচ্ছে। বললে—হ্যাঁ মা, দাদা, এখন অবেলায়, ডাব খাচ্ছে। খাবে কখন?

পান্না—যখন মর্জী হবে।

কেদার— দাদা বউদিকে কিছু বলে নি? বকে নি?

মুলিয়া ঘরে শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে —না তোমার দাদা বোধ হয় বকতে ভুলে গেছে। তা তুমি তো আছ, তুমি এসে শাসন করো।

কেদারের মুখ শুকিয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেরা বাগানে বেরিয়ে গেল। লু চলছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সব আমবাগানে জড়ো হয়েছে। এরা তিন জনেও সেখানে হাজির হবে বলে বেরোল। কেদারই পরামর্শটা দিলে— চল্ আজ আমরাও আম কুড়োতে যাই। মেলাই আম পড়ছে।

তাতে খুন্নু বললে—দাদা উঠানে বসে রয়েছে না?

লছমন বললে—আমি যাব না বাবা, দাদা ধোলাই দেবে।

কেদার—যাঃ ওরা তো আলাদা হয়ে গেছে।

লছমন—তার মানে আমাদের কেউ মারলেও দাদা কিছু বলবে না?

কেদার—বাঃ তা কেন বলবে না? ছেড়ে দেবে!

রঘু ওদের বাইরে বেরোতে দেখেও কিছু বলল না। অথচ আগে হলে দরজামুখো হলেই ধমক লাগাত। আজ চুপ করে বসে রইল।

তাই দেখে ছেলেদেরও সাহস বাড়ল। ওরা একটু একটু করে এগিয়ে গেল। রঘু কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছিল না। কী করে বলে। ছোটো মা ওদের খাইয়ে দাইয়ে দিল। তাকে একবার ডাকল না। কে জানে হয়তো তার মনের ওপর পাঁচিল পড়ে গেছে। এখন ছেলেদের কিছু বলতে গেলে যদি মান না থাকে। ডাকলে যদি না আসে ? মারা বকাও আর চলবে না। তখন লুয়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে যদি অসুখ বিসুখ করে ? বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে রঘুর। তবুও নির্বাক হয়ে থাকে। ছেলেরা যখন দেখল রঘু কিছু বলছে না তারা নিঃশঙ্ক হয়ে রাস্তায় পা দিল।

এই সময় মুলিয়া এল। বললে— এবার ওঠো, আর কেন। না কি, এখনো সময় হয় নি। যার নামে উপোস করে রইলে, সে তো বেশ নিজের ছেলেপুলেকে খাইয়ে দাইয়ে, নিজে খেয়েদেয়ে আরাম করে গিয়ে বিছানা নিয়েছে। একবার তো মুখ ফুটে বললেও না যে, এসো খাও। বলে, 'মা মরে ঝিয়ের লেগে, ঝি মরে খোঁড়া নেয়ের লেগে…' রঘুর ভেতরে ভেতরে ভয়ানক একটা কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর মুলিয়ার এই-সব ছুঁচ ফোটানো কথা যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিল। কাতর হয়ে বললে— তোমার মনের ইচ্ছে তো পূরণ হয়েছে। এবার যাও, ঢাক নিয়ে বাজাও।

মুলিয়া— চলো, খাবার বেড়ে বসে আছি।

রঘু— আমায় জ্বালাতন কোরো না। তোমার জন্যে আমারও বদনাম হল। তুমি যদি কারুর কথা না ভাব, অন্যেরই বা কী গরজ পড়েছে আমার খোসামোদ করতে আসবে ? যাও, ছোটো মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, বাচ্ছারা আম কুড়োতে গেছে। 'লু' চলছে, ওদের ধরে নিয়ে আসব ?

মুলিয়া হাতের বুড়ো আঙল চিতিয়ে ধরে বলল— আমার এই দায় কেঁদেছে। তোমার গরজ থাকে, তুমি একশো বার গিয়ে খোসামোদ করোগে।

পান্না ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। রঘু তাকে শুধোল— ছোঁড়াগুলো বাগানে ঘুরতে গেল যে, 'লু' চলছে।

পান্না— তা ওদের আর কে খবরদারি করবে ? বাগানেই যাক, আর গাছেই চড়ুক, আর জলেই ডুবুক, যা প্রাণে চায় করুক গে। একলা আমি কত দিক দেখব ?

রঘু— যাব, গিয়ে ধরে আনব ?

পান্না— তা তোমার নিজের টানে যখন যাও নি, আমার কথায় যেতে যাবে কেন ? আমিই বা তোমায় বলতে যাব কেন ? আটকাতে চাইলে আগেই আটকাতে পারতে। তোমার চোখের ওপর দিয়েই তো গেল।

পান্নার মুখের কথা ফুরোবার আগেই রঘু হাতের ডাব মাটিতে ফেলে দিয়ে বাগানের দিকে দৌড়োল।

ছয়

ছেলেদের সঙ্গে করে বাগান থেকে ফিরে এসে রঘু দেখল মুলিয়া তখনো চালাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে। বললে— তুই খেয়ে নিগে যা না। আমার এ বেলা মোটেই খিদে নেই।

মুলিয়া চিবিয়ে চিবিয়ে বললে— হ্যাঁ, তা খিদে থাকবে কেন ? তোমার ভায়েদের তো খাওয়া হয়েছে, তাতেই তোমার পেট ভরে গেছে। ধন্যি !

রঘু দাঁতে দাঁত চেপে বললে— আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কোনো লাভ হবে না মুলিয়া। খাওয়া পালিয়ে যাচ্ছে না। একবেলা না খেলে মরব না। তুমি কী মনে করেছ ? এ বাড়িতে আজ যা ঘটল তা বড়ো কম কাণ্ড নয়। তুমি কি ভেন্ন চুলোয় আগুন দিয়েছ, আমার পাঁজরায় আগুন জ্বালিয়েছ। আমার বড়ো জাঁক ছিল, যে যত যাই ঘটুক আমার বাড়িতে আমি ঘর-ভাঙার রোগ ঢুকতে দেব না। তা তুমি আমার গুমোর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছ। বেশ করেছ। নিয়তির মার—

মুলিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল— যত আপসানি

তো দেখছি তোমার একলারই। আর যে কারুর কিছু পুড়ছে তা তো মনে হয় না। এক তুমিই জল থেকে আগুনে ঝাঁপাচ্ছ, আগুন থেকে জ্বলে।

রঘু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে— কেন কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছ বলো তো? তোমার জন্যেই আমার উঁচু মাথা ধুলোয় লুটোল। এই সংসার আমিই হাতে করে, বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে গড়েছি। এ ঘর ভাঙলে আমার বুক ভাঙবে না কার ভাঙবে? যাদের কোলে পিঠে করে বড়ো করলুম। তারা হবে আমার জ্ঞাতি শরিক। যাদের ছেলের মতন করে বকেছি, শাসন করেছি, তাদের ওপর চোখ তুলে কথা কইবারও ক্ষমতা থাকবে না আর। আজ যদি ওদের ভালোর জন্যও কিছু বলি, লোকে বলবে ভায়েদের ঠকিয়ে সম্পত্তি গ্রাস করছে। যাক, আমায় ছেড়ে দাও। খাবার কথা বোলো না, আমি এখন খেতে পারব না।

মুলিয়া— ভালোয় ভালোয় উঠে এসো, খাবে চলো। নইলে দিব্যি দোব।

রঘু— দেখ মুলিয়া, এখনো সময় আছে। জেদ ছাড়। এখনো সব ভাঙে নি। এখনো জোড়া লাগতে পারে।

মুলিয়া— যদি খেতে না বস তো আমার মরা মুখ দেখবে।

রঘু কানে হাত চাপা দেয়। বলে — ছি ছি, এ-সব কী বলছিস যা-তা। চল্ যাচ্ছি খেতে। নাওয়া ধোওয়া মাথায় থাক্। তবে একটা কথা বলে দিলুম মনে রেখো। রুটিই খাওয়াও আর লুচিই খাওয়াও আর ঘিয়ের জালায় ডুবিয়েই রাখ, যে দাগা আমায় দিলে তা কোনোদিনই জুড়োবে না।

মুলিয়া— সব জুড়োবে'খন। চলো দিকি। গোড়ায় ওরকম সবারই লাগে। পরে সব জুড়িয়ে যায়। দেখছ না ও তরফে এর মধ্যেই কেমন হাসিখুশির ধুম। ওরা তো মনে মনে এঁচেই রেখেছিল। দিন গুণছিল বসে বসে— কবে আলাদা হয়ে যাবে। এখন তো ওদের পোয়াবারো। আর একসঙ্গে থাকতে যাবে কেন? আর তো আগের মতন সোনা-রুপোর আমদানী নেই, যে ঘরে গিয়ে উঠবে। যা ছড়িয়ে পড়েছিল

সব কুড়োনো হয়ে গেছে। এখন আর এ তরফের সঙ্গে কী দরকার ?

রঘু আহত স্বরে বললে—আমার তো ঐতেই সবচেয়ে বেশি চোট লেগেছে। ছোটো মার কাছে আমি এটা মোটেই আশা করি নি।

রঘু খেতে বসল বটে কিন্তু ওর মনে হল বিষের ডেলা গিলছে। রুটি যেন খড়ের তৈরি। ডাল নয় তো যেন আমানির জল। জল খেতে গেল, গলা দিয়ে নামল না। দুধের বাটির দিকে ফিরেও তাকাল না। দু-চার গরাস মুখে দিয়েই উঠে পড়ল। যেন কোনো অতি প্রিয়জনের শ্রাদ্ধের ভোজ খাচ্ছিল।

রাত্তিরেও একই ব্যাপার। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করল। কী করবে, বউয়ের মাথায় দিব্যি। দারুণ উদ্‌বেগে রাতভর ভালো করে ঘুমোতে পারল না। একটা অজানা আশঙ্কায় মন ছেয়ে রইল। ঘুমের ঘোরে মনে হল, বাপ ভোলা মাহাতো এসে দোরে বসে রয়েছে। তার চোখে যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টি। বার বার চমকে চমকে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল।

এখন ওরা দুজনে একা একা বসে খায়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না বিশেষ। যেন শত্তুরের ঘর করছে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না। চোখ বুজলেই বাপের বিষাদ মূর্তি ভেসে ওঠে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে রঘু। রঘু পাড়ায় বেরোয় তাও যেন কেমন লুকিয়ে-চুরিয়ে, মুখ নিচু করে পথ হাঁটে, মাথা তুলে দাঁড়ায় না। যেন গো-হত্যা করেছে।

সাত

আরো বছর পাঁচেক কাটল। রঘু এখন দু'ছেলের বাপ। এখন ওদের ভদ্রাসনের উঠোনের মাঝ বরাবর পাঁচিল, ক্ষেতগুলোয় উঁচু আল বেঁধে আধাআধি বখরা হয়েছে, গোরু বাছুর হালবলদ সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। কেদারের বয়স এখন ষোলোর ওপর। সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাষের কাজে লেগেছে। খুন্নু গোরু চরায়।

খালি লছমন এখনো টিমটিম করে পাঠশালায় যায় আসে। পান্না আর মুলিয়ার মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এ ওকে দেখলে জ্বলে ওঠে। তবে মুলিয়ার ছেলে দুটো বেশির ভাগ পান্নার কাছেই থাকে। পান্নাই তাদের সাজায়, কাজল পরায়, কোলে নিয়ে নিয়ে ঘোরে। তবে তার জন্যে মুলিয়ার মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার একটা আওয়াজও বেরোয় না কখনো। অবিশ্যি পান্না তার প্রত্যাশাও করে না। সে যা করে ভালোবেসে নিঃস্বার্থ হয়েই করে। তা ছাড়া মুলিয়ার অনুগ্রহের কোনো প্রয়োজনও তার নেই। তার দুই ছেলে রোজগেরে। মেয়েটাও এখন রান্নাবান্না করতে শিখেছে। সে নিজেও সংসারের আর-পাঁচটা কাজ দেখাশুনো করে। ওদিকে রঘুর অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। একলা মানুষ, তার শরীর ভেঙে পড়েছে, আগের মতন খাটবার ক্ষমতা নেই, অকালে বুড়িয়ে গেছে। বয়েস তিরিশের বেশি নয়, কিন্তু চুলে এর মধ্যেই পাক ধরেছে, কোমর দিনদিন নুয়ে পড়েছে। কাশিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দেখলে কষ্ট হয়। চাষবাসের কাজ হল মেহনতের কাজ। হাড়ভাঙা খাটুনি। সে শক্তি কোথায়! ক্ষেতের উপযুক্ত সেবা করে উঠতে পারে না। কাজেই মনের মতো ফসলও ওঠে না। ধারকর্জও বাজারে কিছু হয়েছে। সেই চিন্তার বোঝাও মাথায় ভার হয়ে চেপে থাকে। এখন ওর দরকার ছিল একটু বিশ্রাম। একটু আরাম। এতদিনকার নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর আজ তো ওর মাথার বোঝা হালকা হবারই কথা, তাই তো হত। শুধু মুলিয়ার স্বার্থপরতা আর অদূরদর্শিতার দরুন রঘুর ভরা ক্ষেত শুকিয়ে গেল। আজ যদি সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকত, তবে কি আজ রঘুকে আর খাটতে হয়! তার তো আজ দেউড়িতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ডাবের জল খাবার কথা। ভাই কাজ করবে, ও পরামর্শ দেবে। গাঁয়ের মুখিয়া মাহাতো হয়ে বসবে। লোকজনে সমীহ করবে। ঝগড়া কাজিয়ায় ওকে সালিশ মানবে, ওর কাছে নালিশ জানাবে; ওর বিচার মাথা পেতে নেবে। যেমন হয়। সাধুসন্তের সেবায় মশগুল হয়ে দিন কাটাতে পারত রঘু। কিন্তু সে সুযোগ আজ বহুদিন হল গত

হয়েছে। এখন কেবল সঙ্গের সাথী দুশ্চিন্তার বোঝা। দিনে দিনে তিলতিল করে যা বেড়ে চলেছে।

শেষের দিকে রোজই অল্প অল্প জ্বর হতে আরম্ভ করল। মনো-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, কঠোর পরিশ্রম আর অভাব— একনাগাড়ে চলার এই ফল। প্রথমে তেমন গা করে নি। ভাবল আপনি হয়েছে আপনিই সেরে যাবে। কিন্তু দুর্বলতা ক্রমেই বাড়ছে দেখে চিকিৎসার কথা চিন্তা করল। যে যা ওষুধ বলে খায়। ডাক্তার কবিরাজ করবে এমন সামর্থ্য আর কই? আর সামর্থ্য থাকলেই বা কী হত। কিছু টাকা পয়সা ব্যয় করা ছাড়া লাভ কিছু হত না। কারণ এ রোগ তিলতিল করে শরীর ক্ষয় করে। পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর পরিপোষক আহার এই এ রোগের আসল চিকিৎসা। তাই বলছি ওষুধ খেয়েও কোনো ফল হত না। কারণ ঘরে বসে বলবর্ধক ভোজন আর বাগানে গিয়ে দু'দণ্ড মলয়মারুত সেবন করার সংগতি ছিল না রঘুর। অতএব দুর্বলতা দিন দিন বেড়েই চলল।

পান্না সময় পেলে মাঝে মাঝে এসে রঘুর কাছে ব'সে দুটো সান্ত্বনার কথা শোনায়। কিন্তু তার ছেলেরা আজকাল রঘুর সঙ্গে কথাও বলে না। ওষুধবিষুধ এনে দেওয়া তো দূরের কথা, আড়ালে বরং হাসি মস্করা করে। দাদা ভেবেছিল ভেন্ন হয়ে সোনার দেয়াল দেবে। আর বউঠাকরুণ বোধ হয় সোনারুপোয় নিজেকে মুড়ে রাখবে ঠিক করেছিল। এখন দেখি, কাকে কার দরকার পড়ে। কেঁদে কূল পাবে না, এই বলে দিলুম। আর তাও বলি, অত 'নেই নেই' 'চাই চাই' ভালো নয়। মানুষের সামর্থ্যে যা কুলোয় তাই করা উচিত। পয়সার জন্যে কি জান দিয়ে দিতে হবে?

পান্না বলে— আহা, রঘু বেচারার কী দোষ?

কেদার বলে— তুমি রাখ রাখ, ও-সব জানা আছে আমার। আমি হ'লে অমন বউকে ছড়ির আগায় রেখে সিধে করতুম। মেয়ে-মানুষের গোঁ ভাঙতে পারব না তো পুরুষ কিসের? তা নয়, আসলে ও-সব দাদারই চাল। সাজানো ব্যাপার।

রঘুর পরমায়ু টিমটিম করে জ্বলছিল। একদিন বাতি নিবে গেল।

এতদিনে তার সব চিন্তার অবসান হল।

শেষ সময়ে কেদারকে খুঁজেছিল। কিন্তু কেদার তখন আখের ক্ষেতে জল দিচ্ছে। খুব ব্যস্ত। আসল কথা, ওষুধটষুধ আনতে বলবে হয়তো, এই ভয়েই আসে নি। আখের ক্ষেতটেত অছিলা।

আট

মুলিয়ার জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। যে মাটির ওপরে তার সাধের পাঁচিল তুলেছিল তার ভিত ধসে পড়ল। যে খুঁটি ধরে তার অত নাচানাচি তার গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ভেঙে গেল। এখন পাড়ার লোকে বলাবলি করছে— 'এ হল ভগবানের সাজা। হুঁ হুঁ, দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না একেবারে। এখন? হ'ল তো?…' সব কথাই কানে আসে মুলিয়ার। মরমে মরে থাকে সদ্য শোকার্তা মুলিয়া। বাচ্চা দুটোকে বুকে চেপে ভাঙা ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকে। অথৈ শোকে…লজ্জায়…ভয়ে। গাঁয়ের জনপ্রাণীকে মুখ দেখাবার সাহস হয় না তার। কিন্তু তারপর শোক লজ্জা ভয় সব ছাপিয়ে দেখা দেয় চিন্তা। দিন চলবে কেমন করে। কার আশ্রয়ে দাঁড়াবে? কার ভরসায় চাষবাস চলবে। বেচারা রঘু— রুগ্ণ, দুর্বল, অশক্ত রঘু। শেষ দিনটি অব্দি বিশ্রাম নেয় নি। কাজ করে গেছে। মাঝে মাঝে মাথায় হাত দিয়ে ক্ষেতের মধ্যেই বসে পড়ত। হাঁপাত। আবার দম নিয়ে উঠে দাঁড়াত। আজ কে সামলাবে— ক্ষেতের তৈরি ফসল, খামারের সদ্যকাটা ডাঁইকরা ফসল। ওদিকে আখের ক্ষেত শুকিয়ে উঠছে। জল ছেঁচা দরকার। সেও একলা-দোকলার কাজ নয়। তিন তিনটে জন মজুর কম করেও লাগবে। কোথায় পাবে সে। এমনিতেই এখন গাঁয়ে জলের অভাব। তায় ও একা মেয়েমানুষ। অথৈ জলে পড়ল মুলিয়া।

দিন বসে থাকে না! এমনি করেই তেরো দিন কাটল। ক্রিয়া-কর্ম চুকেবুকে গেল। পরের দিনই সকালে ছেলে দুটোকে কোলে

কাঁখে নিয়ে মুলিয়া খামারে গেল— ফসল মাড়াই করতে। একজনকে গাছতলায় নরম ঘাসের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, আর-এক জনকে ওখানেই বসিয়ে রেখে কাজে লাগল। এক হাতে চোখের জল মোছে, অন্য হাতে বলদ সামাল দেয়। ভগবান এই লিখেছিলে কপালে। এই করতেই জন্ম হয়েছিল? তাই দেখতে দেখতে কটা বছরের মধ্যে সব ওলটপালট করে দিলে! কী থেকে কী হয়ে গেল! এই তো গেল বছর এমনই দিনে খামারে রঘু ফসল মাড়াই করছে। ও রঘুর জন্যে ঘটিতে সরবৎ আর মটরের ঘুগনি বানিয়ে এনেছে। আজ কোথায় গেল সে দিন। সামনে পেছনে আজ কেউ কোত্থাও নেই যে 'আহা' বলে।— তা হোক। দর্প দিয়েই বুক বাঁধল মুলিয়া। হোক কষ্ট। তবু কারুর চাকরাণী তো নই। না, ভেন্ন হয়েছে বলে আজও কোনো অনুশোচনা নেই মুলিয়ার।

হঠাৎ ছোটো বাচ্চাটার কান্না শুনে সেদিকে চোখ ফেরাল। বড়ো ছেলেটা ছোটোটাকে আদর করছে। কান্না ভোলাবার জন্যে চেষ্টা করছে। আধ-আধ বুলিতে বলছে—'কেঁদো না, তুপ তলো!' তার মুখের ওপর মুখ রেখে চুমু খাচ্ছে। তাতেও হচ্ছে না দেখে প্রাণপণে বুকে আঁকড়ে ধরে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। শেষে কিছুতেই যখন হালে পানি পেল না তখন সেও কান্না জুড়ে দিল।

এমন সময় পান্না দৌড়ে এল। ছোটো ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললে— হ্যাঁরে বউ, ছেলে দুটোকে আমার কাছে রেখে আসিস নি কেন? দেখ তো কত কষ্ট পেয়েছে মাটির ওপর পড়ে। আহা রে বাচ্ছা। আমি মরে গেলে তোদের যা খুশি করিস, বুঝলি। যে-কটা দিন বেঁচে আছি বাচ্ছা-গুলোকে আর কষ্ট দিস নি। তোরা ভেন্ন হয়েছিস বলে বাচ্চা-কাচ্চা ভেন্ন হয় রে!

মুলিয়া বললে— তোমারও তো হাত খালি ছিল না মা, তুমিই বা কী করবে।

পান্না— তা তোমারই বা এক্ষুনি খামারে আসার কী দরকার ছিল মা? মাড়াই কি আটকে থাকত? তিন তিনটে ছেলে রয়েছে

বাড়িতে। এই সময়েই যদি কাজে না লাগে তবে কবে কাজে লাগবে। কেদার তো কালই আমাকে বলছিল মাড়াইয়ের কথা। আমিই বরং বারণ করলুম। বললুম, আগে তাড়াতাড়ি করে আখে জল দেওয়াটা সেরে নে। মাড়াই তো দশ দিন বাদে হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ছিঁচাই না হলে আখ শুকিয়ে যাবে। তা গতকাল থেকে জল পড়তে শুরু হয়েছে। পরশু দিন নাগাদ ছেঁচা শেষ হয়ে যাবে। তখন মাড়াইয়ে হাত দেওয়া যাবে। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না— রঘু যেদিন থেকে গেছে, কেদারের যে কী চিন্তা হয়েছে। দিনের মধ্যে কিছু না হোক দুশো বার এসে এসে আমায় জিজ্ঞেস করছে— হ্যাঁ মা, ভাবী কি খুব কান্নাকাটি করছে ? মা, বাচ্চাগুলোর কষ্ট হচ্ছে না তো ? খাওয়া হয়েছে তো ওদের ? কোথাও কোনো বাচ্ছা কেঁদে উঠেছে কি দৌড়ে এসে বলছে— মা, মা দেখ দেখ ঐ বুঝি কে কাঁদছে। দেখ তো কী হল, কাঁদছে কেন ? কাল নিজেই কাঁদছিল। বলছিল— দাদা যে এত শিগ্‌গির ফাঁকি দেবে, যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতুম তো শেষ সময় একটু সেবা করতুম। আগে তো, মা, ওকে ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙানো যেত না। আর এখন না ডাকতেই এক প্রহর রাত থাকতে উঠে কাজে লেগে যায়। খুন্নু বুঝি একবার বলে ফেলেছিল, আগে নিজেদের ক্ষেতে জল দিয়ে তারপরে দাদার ক্ষেতে দোব। তাই শুনে কেদার তাকে এমন ধমক দিয়েছে যে বেচারার আর মুখে রা নেই। বললে, খবর্দার আমার তোমার করবি না আজ থেকে। জেনে রাখিস, আজ যদি দাদা না মাথার ওপর থাকত তা হলে আর বেঁচে থাকতে হত না। দোরে দোরে ভিক্ষা করতে হত। আজ বড়ো ক্ষেতের মালিক হয়েছিস। খেয়াল রাখিস, দাদার দয়াতেই আজ এত বড়ো হয়েছিস। সেদিন খেতে দিয়ে ডাকতে গেছি, দেখি দাওয়ায় বসে বসে কাঁদছে। বললুম— কাঁদছিস কেন রে। তা বলে— মা, দাদা আমার শুধু আলাদা হওয়ার দুঃখে দুঃখেই মরে গেল। নইলে তার কি মরার বয়েস! মাগো তখনু কেন বুঝি নি দাদা আমার কী মানুষ ছিল, নইলে কি তাকে ছেড়ে থাকতুম, তার ওপরে রাগ করতে পারতুম।

পান্না এরপর গভীর অর্থবহ দৃষ্টিতে মুলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর বললে— আমার ছেলেরা তোমায় আর আলাদা থাকতে দেবে না বউমা। ওরা বলছে, দাদা যেমন আমাদের জন্যে জীবন দিয়েছে, তেমনই তার ছেলেদের জন্যে আমরা জীবন দোব।

মুলিয়া কেবল শুনে যাচ্ছে। তার চোখের জল আর থামে না। পান্নার কথায় আজ শুধু অকৃত্রিম দরদ, অবিমিশ্র সহানুভূতি, কেবল সহৃদয় সান্ত্বনা, আর ঐকান্তিক, অকপট, অনাবিল ভালোবাসা আর বেদনা। এই খাঁটি দুঃখের আবহাওয়ায় মুলিয়ার মন আজ এমন করে পান্নার ওপর আকৃষ্ট হল, যেমনটি এর আগে আর কখনো হয় নি। যার কাছ থেকে খালি ব্যঙ্গ আর উপহাস আর পরোক্ষ ক্ষতিরই আশঙ্কা করে আসছিল, তার হৃদয়ে এত নিবিড় অনুরাগের পরিচয় পেয়ে, মমতা আর শুভেচ্ছার এই পবিত্র প্রকাশ দেখে মুলিয়া স্তব্ধ হয়ে রইল।

আর আজ এই প্রথম তার নিজের উপর বীতরাগ এল, নিজের স্বার্থগৃধ্নুতার উপরে ঘৃণা। এই প্রথমবার আলাদা হওয়ার বিরুদ্ধে তার অন্তর সক্ষোভে ছি-ছি করে উঠল।

নয়

এই ঘটনার পর আরো পাঁচ বছর কেটে গেছে। পান্না এখন পুরোদস্তুর বুড়ি। কেদার বাড়ির কর্তা। মুলিয়া বাড়ির কর্ত্রী। খুন্নু আর লছমনের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু কেদার আজো আই-বুড়ো রয়েছে। বললে বলে— বিয়ে করব না। বেশ কয়েক জায়গায় কথাবার্তা হয়েছিল। কোথাও কোথাও সম্বন্ধ পাকা হয় হয় হয়েছিল, তত্ত্বও এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পাত্রের মত হয় না। পান্না অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক জালও ফেলেছে কিন্তু তাকে ফাঁদে ফেলা যায় নি। বলে— মেয়েছেলেয় যে কত সুখ, তা

জানি। বউ ঘরে এলেই বেটাছেলের মন ঘুরে যায়। তখন আর কেউ কিছু নয়। বউই সর্বস্ব হয়ে ওঠে। মা বাপ ভাই বোন বন্ধু বান্ধব সব পর হয়ে যায়। আমার দাদার মতো মানুষেরই যখন মাথা ঘুরে যেতে পারে, তখন অন্য লোকের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ভগবানের দয়ায় দুটো ছেলে তো রয়েইছে, আবার কী চাই। বিয়ে না করেই যখন দু-দুটো ছেলে পেয়ে গেলাম, তখন বিয়ের দরকারটা কী? আর আপন পর মানুষের মনে। আপন ভাবলেই আপন, পর ভাবলেই পর।

একদিন পান্না বললে— তোর বংশ থাকবে কী করে?

কেদার— কেন। আমার বংশ তো ঠিকই চলছে। ও ছেলে দুটোকে আমি নিজের ছেলে বলেই ভাবি।

পান্না— তা বটে। ভাবলেই সব হয়। তা ছেলেদের মাকেও তুই নিজের বউ বলেই ভাবিস বোধ হয়।

কেদার বলে— যাঃ, তুমি যে গালাগাল দিতে শুরু করলে।

পান্না— কেন গাল হবে কেন। তোর ভাজ তো বটে।

কেদার— তা হলেই বা। আমার মতন কাঠ গোঁয়ারকে ওর পছন্দ হবে কেন।

পান্না— তা তুই যদি বলিস তো আমি ওর মন জানি।

কেদার— না না মা, শেষকালে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে আবার।

পান্না তবুও নাছোড়বান্দা। তখন কেদার বললে— আমি জানি না, তোমার যা খুশি করো।

পান্না ছেলের মনের আন্দাজ পেল। ও, তা হলে ছেলের এই মনের কথা! মুলিয়ার ওপর মন। খালি সংকোচে ভয়ে কিছু বলতে পারে নি।

পান্না সেইদিনই মুলিয়াকে ধরল— কী করি বল তো বউ, মনের বাসনা মনেই পুষে রাখতে হয়। কেদারটার ঘরসংসার দেখে যেতে পারলে মনটায় শান্তি পেতুম। নিশ্চিন্তে মরতে পারতুম।

মুলিয়া বলে— তা তোমার ছেলে তো ধনুক-ভাঙা পণ ধরেছে।

বিয়ে করবেই না বলে।

পান্না— বলে, যদি এমন মেয়ে পাই যে পরিবারে মিলমিশ বজায় রেখে চলবে। ভাঙন ধরাবে না। তা হলে করতে পারি।

মুলিয়া— তা এমন মেয়ে এখন কোথায় ফরমাস দিয়ে গড়াই। দেখ যদি খুঁজে পাও।

পান্না— আমি অবিশ্যি একটা খোঁজ পেয়েছি।

মুলিয়া— তাই নাকি, সত্যি ? কোন্ গাঁয়ের মেয়ে গো মা ?

পান্না— সে এখন বলব না। তবে মোদ্দা কথা বলতে পারি, সে মেয়ের সঙ্গে যদি কেদারের বিয়ে হয় তা হলে এ সংসারের পক্ষেও ভালো, আর কেদারের জীবনটাও ভরে উঠবে। কিন্তু এখন মেয়ে রাজি হয় তবে তো ?

মুলিয়া— কেন ? রাজি না হবে কেন ? এমন সুন্দর দেখতে, এত সুন্দর স্বভাব, শক্তসমর্থ রোজগেরে ছেলে কোথায় পাবে ? আগের জন্মে নিশ্চয় সাধুসন্নিসি ছিল, নইলে সংসারে ঝগড়া বিবাদ হবে বলে বিয়ে করে না, এমন কে কোথায় শুনেছে। কোথায় থাকে সে মেয়ে বলো না, আমি গিয়ে তাকে ঠিক রাজি করিয়ে নোব।

পান্না— তা তুই ইচ্ছে করলেই হয়। তোর ওপরেই নির্ভর করছে।

মুলিয়া— আমার ওপরে নির্ভর ! তা বেশ তো, আমি আজই চলে যাব। আমি তার পায়ে ধরে মত করাব।

পান্না— তা হলে বলেই ফেলি। সে মেয়েটা তুই নিজেই।

মুলিয়া একেবারে লাল হয়ে গেল। বললে—যাও, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিয়ো না।

পান্না— কেন, গালাগাল কিসের। তোর দেওর তো।

মুলিয়া— তা আমার মতন বুড়িকে পছন্দ করবে কেন ?

পান্না— না, পছন্দ আবার করবে না। তোকে ছাড়া আর মেয়েই চোখে দেখে না। কেবল ভয়ের চোটে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু ওর মনের কথা আমি জেনে ফেলেছি।

বৈধব্যের রূঢ়তায় শোকে বিপন্ন, মুহ্যমান, বিবর্ণ হয়ে গেছিল মুলিয়ার মুখটা ; মুখ নয় মুখপদ্ম। পীতাভ পাণ্ডুর সেই পদ্মটা

এখন কথায় কথায় অরুণবরণ হয়ে উঠল। গত দশ বছর ধরে ও যা-কিছু হারিয়ে ফেলেছিল, সে সবই যেন আজ এই মুহূর্তে সুদে আসলে ফিরে এল ওর কাছে। ওর সেদিনের সেই লাবণ্য, সেই উন্মেষ, সেই বিকচ যৌবনের আকর্ষণ, সেই কম্প্র নমনীয় তনু, সেই আয়ত চোখের আহ্বান। সব।

বিষয়-বিকার

টমি এমনিতে দেখতে শুনতে বেশ তাগড়া জোয়ান। ঘেউ ঘেউ ডাক শুনলে কানের পরদা ফেটে যাবার জোগাড়। এমনি পুরুষ্টু গতর যে আঁধার রাতে দেখলে গাধা বলে ভ্রম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোনো রণাঙ্গণে তার শ্ব-জনসুলভ বীরত্ব প্রমাণ করার সুযোগ ঘটে নি। দু-চারবার বাজারের নেড়ির দল তাকে অসমদ্বন্দ্বে চ্যালেঞ্জ করেছে, সেও তাদের দর্পচূর্ণ করার জন্যে ময়দানে নেমেছে ; দর্শকদের মতামত থেকে জানা যায় যে যতক্ষণ যুদ্ধ চলেছে, টমি শৌর্যবীর্যের সঙ্গেই লড়েছে, নখ বা দাঁতের তুলনায় তার লেজেরই বেশি দাপট দেখা গেছে। শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গণে কার জয়ধ্বজা উড়ত, তা অবিশ্যি এখন নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে হ্যাঁ, যখন নেড়ির দলকে নতুন করে ফৌজ আনাতে (রি এন-ফোর্সমেণ্ট) হয়েছে সে ক্ষেত্রে সমরশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী টমিকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা ন্যায়সংগত, যুক্তিসম্মত এবং সর্বথা বিহিত বলে মনে হয়। টমি অবস্থা বিবেচনা করে কৌশলে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। সে দাঁতের পাটি বার করে প্রতিপক্ষকে দেখিয়েছিল। অর্থাৎ সন্ধি প্রার্থনা। কিন্তু সেই থেকে সে অমন নীতিজ্ঞানহীন প্রতিপক্ষের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলাই সাব্যস্ত করেছে।

কিন্তু এত শান্তিপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও টমির শত্রুসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। তার সগোত্রদের তার ওপর এই কারণে হিংসে যে অত নাদুস-নুদুস হয়েও সে অত ভীতু কেন। আবার বাজারী দলের রাগ, টমির কল্যাণে এক টুকরো হাড়েরও মুখ দেখতে পায় না তারা। টমি রোজ শেষ প্রহর রাতে ওঠে, উঠেই হালুইকরের দোকানে রওনা হয়। পাতা, ঠোঙা যা পায় সর্বস্ব খেয়ে কসাই-খানায় যায়, সেখানে হাড়গোড় থেকে শুরু করে মায় নাড়িভুঁড়ি ছাল চামড়া অব্দি কিস্সু বাদ দেয় না। ফলতঃ বিবিধ শত্রুর আওতায়

বাস ক'রে টমির জীবন ক্রমেই সংশয়াপন্ন হয়ে উঠতে থাকে। মাসের পর মাস অর্ধাশনে কাটে। কিন্তু আধপেটা খেয়ে কদিন চলে। মাঝে বার দু-তিন ভালোমন্দ খাবার ইচ্ছেটা এমনই উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল যে সেই প্রবৃত্তি ভোগের তাড়নায় কিছু সন্দেহজনক পন্থা ওকে গ্রহণ করতেই হয়। কিন্তু তার পরিণতি ঠিক আশানুরূপ হয় নি। পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় স্বাদ ও রুচির পক্ষে আপত্তিকর কিঞ্চিৎ সামগ্রী ওকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়, এবং একটু মাত্রাতিরেকই ঘটেছিল— ফলে পেটের বদলে পিঠের যন্ত্রণাতেই বেশ কদিন শয্যা নিতে হয়। অতঃপর ওকে অগত্যা বিধিবদ্ধ পন্থা আশ্রয় করেই চলতে হয়। কিন্তু ডাণ্ডায় পেট নিরুপায় হয়ে শান্ত হয়ে থাকে বটে তা বলে চিত্তের শান্তি কি আসে? আসে না। টমি মনে মনে স্বপ্ন দেখে, এমন এক জায়গায় যাবে যেখানে অঢেল শিকার। খরগোস, হরিণ, ভেড়ার বাচ্চারা ময়দানময় চরে বেড়াবে —বেওয়ারিশ। ময়দানে টমির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। আরামের জন্যে থাকবে পল্লবঘন গাছের নিবিড় ছায়াতল, স্নিগ্ধ হবার জন্যে থাকবে পুণ্যতোয়া নদীর জল। টমি সেখানে খুশিমতন শিকার করবে, খাবে আর আয়েস করে ঘুমোবে। সে দেশে টমির এমন প্রতাপপ্রতিপত্তি জমবে, এমনি রবরবা হবে যে তাবৎ প্রাণী ওকেই তাদের রাজা বলে মেনে নেবে। আর কালে তার পরাক্রমের ঠেলায় ঐ অঞ্চলে ওর কোনো শত্তুর পা রাখতেও ভরসা পাবে না।

এই রকম রঙিন স্বপ্ন মাথায় নিয়ে টমি একদিন ঘাড় গুঁজে পথ চলছে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে কখন গলির ভেতর ঢুকেছে, খেয়ালই ছিল না। পড়বি তো পড়্ এক ভদ্রমহোদয়ের সামনে— একেবারে মুখোমুখি। টমি সটকে পড়ার ফাঁক খুঁজছিল, কিন্তু পাড়ার মস্তান তো আর টমির মতন অহিংসাব্রতী নয়। সে এক ঝটকা মেরে টমির টুঁটি চেপে ধরল। টমি অনেক অনুনয়-বিনয় করল, কাকুতি মিনতি করল, বললে--'দোহাই ধর্ম, আমায় ভুল বুঝো না, মাইরি বলছি, আমার মোটেই এ গলিতে পা দেবার ইচ্ছে ছিল না। এবারটি ছেড়ে দাও, খোদার কসম— আর জন্মে এদিকের ত্রিসীমানা

মাড়াব না। নেহাৎ, মতিচ্ছন্ন ধরেছিল, নইলে তোমার এলাকার ছাওয়া মাড়াই রে ভাই!'—তা চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সেই বলদর্পী, নৃশংস পশু টমি বেচারার একেবারে নাকে দম করে ছাড়ল। হৃতবল, হৃতসম্মান টমি তখন ষাঁড়ের গলার চীৎকার করে ঘোর প্রতিবাদ জানাতে লাগল। শোরগোল কানে যেতে পাড়ার আরো জনাকয় মাতব্বর ঘটনাস্থলে জমা হলেন। কিন্তু হায়, নির্যাতিতের ওপর করুণা করা চুলোয় গেল, উলটে তারাও সমবেত-ভাবে আক্রান্তের ওপর দু'দশ ঘা দন্তাঘাত চালিয়ে গেলেন। এই গর্হিত আচরণে টমির বুকটা একেবারে ভেঙে গেল। সে কোনোমতে জান নিয়ে চম্পট দিল। অত্যাচারী আগ্রাসীর দল বহু দূর পর্যন্ত ওর পেছনে ধাওয়া করে এসেছিল, কী ভাগ্যি মাঝপথে একটা নদী পড়েছিল, টমি ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

কথায় বলে, সব দিন সমান যায় না। সকলেরই দিন ফেরে। তা নদীতে ঝাঁপ দেবার পরে পরেই টমিরও ভাগ্য ফিরে গেল। সাঁতরে নদী পার হতেই টমি দেখল— ওর সামনেই সেই চিরবাঞ্ছিত স্বপ্নরাজ্য— ওর কামনার স্বর্গ।

দুই

বিস্তীর্ণ ময়দান। যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজের সম্ভার। কোথাও ঝরনার ঝরঝর, কোথাও নদী-নালার ঝিরঝির; কোথাও ঘন গাছের চোখ-জুড়োনো সারি, কোথাও ঢালাও বালিয়াড়ি। চোখ আর ফেরানো যায় না যেন।

চোখা নখওয়ালা কিছু জীব এ রাজ্যের বাসিন্দা। তাদের কারো কারো মূর্তি দেখেই টমির প্রাণ উড়ে গেছে, হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। তবে তারা টমির অস্তিত্বকে গ্রাহ্যর মধ্যেও আনে নি। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াইকাজিয়া করে থাকে— প্রায়ই, রক্তের নদী বয়ে যায়— এ-সব নিত্যনৈমিত্তিক। টমি দেখল, এই-সব ভয়ংকর

জন্তুদের সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব। সে কৌশল আশ্রয় করল। বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে একজন ঘায়েল হলেই তার পোয়াবারো। সে মাটি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টমি চোঁ করে দৌড়ে গিয়ে ঘপ করে এক কামড় মাংস খাবলে নিয়েই দৌড় দেয়, তারপর নিরিবিলিতে বসে তারিয়ে তারিয়ে খায়। বিজেতা পশু তখন বিজয়গর্বে মাতোয়ারা, তুচ্ছ টমির দিকে সে ফিরেও তাকায় না; ওকে অনুকম্পা করে।

টমির চাঁদের দিন, বুধের দশা। নিত্যি নতুন ভোজ্য, তরুতলের সুখশয্যা। যে স্বর্গের কথা ও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি, আজ সশরীরে সেই স্বর্গে বাস করছে।

ভালো পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়ার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই টমির ভোল পালটে গেল। চেহারার ডোল বদলে গেল। শরীরে জৌলুস দেখা দিল। এখন ও মাঝে মাঝে ছোটোখাটো জীবের ওপর নিজেই হাত চালাতে শুরু করেছে। এবার জঙ্গলের আদি বাসিন্দেদের টনক নড়ল। তারা ওকে খেদিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। তখন টমির মাথায় একটা নতুন চাল খেলল। ও বড়ো জানোয়ারদের ভেতরে ফাটল ধরাবার ফন্দি আঁটল; এর কাছে ওর নামে লাগায়, ওর কাছে তার নামে চুকলি খায়। একে বলে, জানেন, আপনাকে মারবার ষড়যন্ত্র করছে। ওকে গিয়ে বলে, ভাই তোমায় ও গাল দিচ্ছিল। তারা বুনো জংলী জানোয়ার, শহুরে প্যাঁচের সঙ্গে পারবে কেন। টমির টোপ গেলে। পরস্পরের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরে। কালে একদিন জঙ্গলে বড়ো জানোয়ার বলতে আর-কিছু রইল না। রইল কেবল ছোটো জন্তুর দল। তা তাদের কী হিম্মত যে টমির মোকাবেলা করবে। বরং টমির বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতা দেখে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল! তারা ভাবল এই স্বর্গের জীব বুঝি আমাদের শাসন করবার জন্যেই ধরাধামে প্রেরিত হয়েছে। টমিও নিজের দিব্য শক্তির প্রভাব দেখিয়ে তাদের ওপর দিব্যি দখল জমিয়ে নিল। মেজাজ নিয়ে তাদের বললে—"দেখ হে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে আমি তোমাদের শাসন করতে এসেছি। তোমরা সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করো। আমি কাউকে কিছু বলব

না। অবিশ্যি কখনো সখনো তোমাদের সেবার পারিশ্রমিক হিসেবে, এক-আধজনকে মেরে খাব। তা দেখ, কী করা যাবে? আমারও তো পেট চলা চাই। নইলে কী করেই বা বাঁচব, আর নিজে না বাঁচলে তোমাদের সেবাই বা করব কী করে। কাজেই···।” ইদানীং টমির মন সদাই প্রসন্ন, সগৌরবে সে জঙ্গলের চার দিকে ঘুরে বেড়ায়। বেশ আছে।

কেবল একটা চিন্তাই তার মাথায় ঘুরেফিরে আসে: কোনোদিন আবার এখানে কোনো শত্তুর না এসে হাজির হয়। সজাগ দৃষ্টি রাখে চার দিকে, সতর্ক থাকে, সশস্ত্র থাকে সদাসর্বদা। যত দিন যায়, সুখের ভাগ যত ভরে ওঠে, ততই যেন ওর উদ্‌বেগ বাড়তে থাকে যদি কেউ আসে। ইদানীং প্রায়ই ও রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, চমকে চমকে ওঠে। অদৃশ্য শত্তুরের দিকে ধেয়ে যায়। ঘেউ ঘেউ করে অযথা চেঁচায়। লোক কথায় বলে— ‘কানা কুকুর হাওয়ার পেছনে ছোটে’— তা ওর হয়েছে সেই দশা। মাঝে মাঝে প্রজাদের ডেকে বলে— “ভগবান করুন যেন আর কোনো মালিকের পাল্লায় না পড়তে হয় তোমাদের। তা হলে তোমরা মারা পড়বে নির্ঘাত। পিষে মারবে তোমাদের। আমি তোমাদের হিতৈষী, শুভাকাঙ্ক্ষী। তা বলে অন্য কারুর কাছে সে প্রত্যাশা কোরো না।” পশুপ্রজারা সমস্বরে বলে—“যতদিন বাঁচব, আপনার অধীনেই থাকব।”

তবু সেই এক চিন্তা ঘোচে না টমির। ঘুম নেই। শান্তি নেই। রাতদিন নদীর ধারে এমুড়ো থেকে ওমুড়ো ছুটোছুটি করে মরে। ছুটতে ছুটতে হাঁফ ধরে, দম বেরিয়ে আসে। তবু উদ্‌বেগ ঘোচে না— যদি শত্তুর হানা দেয়, যদি ঢুকে পড়ে।

সেবার আশ্বিন মাসে টমির চিত্ত বড়ো চঞ্চল হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধু আর জ্ঞাতিকুটুমদের দেখার জন্যে মন কেমন করতে লাগল। সেই-সব পুরোনো দিনের স্মৃতি মনে পড়ল, যখন ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে প্রণয়িনীর পেছন পেছন অলিতেগলিতে ঘুরে বেড়াত। দিন কয়েক স্মৃতি রোমন্থন করে কাটল। শেষে আর আবেগ রাখা গেল না। টমি কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ল। এখন ওর দেহে নধর কান্তি, মনে

বল। কেউ ট্যাঁ ফোঁ করতে এলে হয়, মজা দেখিয়ে দেবে'খন।

কিন্তু নদীর ওপারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ওর আত্মপ্রত্যয় সকালের কুয়াশার মতন উবে গেল। চাল ঢিমে পড়ে গেল। ঘাড়টা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ল। লেজটা কুঁকড়ে পেছনের ঠ্যাঙের আড়ালে চলে গেল। এমনি সময়ে হঠাৎ এক যুবতী তন্বীর দর্শন পেয়ে টমি বিহ্বল হল। তার পেছু নিল। তা এ-সব অশালীনতা সম্ভবত প্রেমময়ীর পছন্দ নয়। সে সশব্দে প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই তার পূর্বপ্রণয়ীর দল হাজির। টমিকে দেখে তাদের পিত্তি জ্বলে উঠল। টমি প্রমাদ গুণল। কী করবে বুঝে ওঠার আগেই ও ঘেরাও হয়ে গেল। তারপর চার দিক থেকে দাঁত আর নখের ঘায়ে ঘায়েল হয়ে পালাতে পথ পায় না। সারা গা রক্তারক্তি, টমি ছুটে পালাচ্ছে, তাতেও নিস্তার নেই। শয়তানের দল পেছনে তাড়া করে আসতে লাগল।

ক্ষতবিক্ষত টমি ফিরে এল। এবারে ওর ভয়টা আরো চেপে বসল। প্রতি মুহূর্তে ওর শঙ্কা— যদি হানাদাররা ওর সুখের স্বর্গে হানা দেয়। এ ভয় আগেও ছিল। এখন আরো বেড়ে গেল।

ওর আতঙ্ক বাড়তে বাড়তে একদিন চরমে পৌঁছোল। ওর মনে হল যেন সত্যই শত্রুর দল হামলা করেছে। ও রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে এল। তারপর এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো দৌড়াদৌড়ি শুরু করল।

দিন ঢলে পড়ল, অন্ধকার হয়ে এল। সেদিন আর টমি ডেরায় ফিরল না। সকাল হল, তুপুর হল, আবার বেলা গড়িয়ে রাত হল। তবু টমির হুঁস নেই। খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে সে দিনরাত নদীর পাড়ে চক্কর কাটতে লাগল।

এমনি করে পাঁচ-পাঁচটা দিন কেটে গেল। টমির পা টলছে, চোখে আঁধার দেখছে, খিদেয় তেষ্টায় শরীর অবশ, পড়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ওর ভয় যাচ্ছে না।

শেষে সাত দিনের দিন বিষয়-বিকারগ্রস্ত অভাগা টমি শিথিল দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না। বনের কোনো জন্তু

ওর কাছে এল না। কেউ ওর কথা মুখেও আনল না। বেচারার মরা মুখের উপর কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না। শুধু পরপর ক'দিন ধরে কাক চিল শকুনির দল মড়া শরীরটার ওপর বসে ঠোকরাল। শেষ পর্যন্ত কটা হাড়পাঁজরা ছাড়া আর-কিছু বাকি রইল না।

অমাবস্যার রাত

দেয়ালির সন্ধে। আজ শ্রীনগরের দালান কোঠা থেকে ভাঙা কুঁড়ে অব্দি সব বাড়িঘরেরই বরাতে আলোর ছটা লেগেছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা শ্বেতপাথরের থালায় পিদিম সাজিয়ে মন্দিরে চলেছে। সেই আলোর রেশ পড়েছে তাদের কচি কচি পদ্মমুখের ওপর— যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। ঘরে ঘরে দীপান্বিতা— আলোয় আলোয় ঝলমল। বাতি জ্বলে নি কেবল পণ্ডিত দেবদত্তের ঘরে। সাতমহলা পুরী আঁধার হয়ে আছে— যেন আষাঢ়ের কালো মেঘ— ঠিক তেমনি বিষাদ-ঘন, ঠিক তেমনি ভয়াল রূপ। এ বাড়ি তার ঐশ্বর্যের দিন হারিয়ে ফেলেছে— তাই বিষাদ; আশপাশের আলোর জলুস এ বাড়ির আঁধার গায়ে জ্বালা ধরিয়েছে— তাই ভ্রূকুটি ভয়াল। সে একদিন ছিল, যখন ঈর্ষাও এ বাড়ির রূপ দেখে দূরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করত, কাছে আসতে সাহস পেত না; আর এও একদিন, যখন অনুকম্পাও এ বাড়িকে কৃপা কটাক্ষে দেখে। দেউড়িতে এক কালে যেখানে দারোয়ান পাহারায় থাকত, আজ সেখানে মাদার আর ভেরেণ্ডার বড়ো বড়ো গাছের বন। বৈঠকখানা বাড়ির বারান্দা জুড়ে একটা ষাঁড় দোর আগলে বসে থাকে। ওপর মহলের ঘরগুলো আগে সুন্দরী মেয়েদের হাসি-গানে সব সময় গমগম করত, এখন সে-সব ঘর বুনো পায়রার কলকূজনে ভরে আছে; রাত-দিন বকম্‌বকম্‌। এখন এ বাড়ি যেন ইংরিজি পাঠশালের ছাত্র—মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ নেই। দেওয়ালগুলো খসে পড়ছে— তাতে বিধবার ভাঙা মনের মতন বড়ো বড়ো ফাটল। লোকে বলবে সময়ের ফের। আমি তা বলব না। সময়কে মিছে দোষ দেওয়া। এ-সব অদূরদর্শিতার ফল— আহাম্মকির ফল।

অমাবস্যার রাত। চার দিকের আলোর অত্যাচারের হাত থেকে পালিয়ে এসে অন্ধকার যেন আজ এই প্রাসাদে শরণ নিয়েছে। ঘরের

আবছা আলো-আঁধারিতে বসে আছেন পণ্ডিত দেবদত্ত, মৌন, বিষণ্ণ চিন্তার ভারে ডুবে রয়েছেন। আজ এক মাস হল গিরিজার জীবন নিয়ে যমের সঙ্গে টানা-পোড়েন চলেছে ; গিরিজা ওঁর স্ত্রী, জীবন-সঙ্গিনী। দুঃখদৈন্যের সঙ্গে যোঝবার জন্যে কোমর বেঁধেছিলেন দেবদত্ত। ভাগ্য একদিন আবার ফিরবে, এই আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। দমেন নি। কিন্তু এই নতুন দুর্ভাগ্য এসে ওঁর সহ্যশক্তি কেড়ে নিয়েছে, দেবদত্ত আর পারছেন না। দিনের পর দিন গিরিজার শিয়রে বসে থাকেন, তার শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকালে বুকের ভেতর মোচড় দিতে থাকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন দেবদত্ত। গিরিজাও কাঁদে— বাঁচবার আশা নেই তার। তখন আবার তাকে সান্ত্বনা দেন— কাঁদছ কেন, কেঁদো না, সেরে উঠবে।

পণ্ডিত দেবদত্তের পূর্বপুরুষদের খুব ফলাও কারবার ছিল। তাঁদের ছিল লেনদেনের ব্যাবসা। রাজারাজড়া আর বড়ো বড়ো চাকলাদারদের সঙ্গেই বেশির ভাগ লেনদেন চলত। সে আমলে মুখের কথার দাম ছিল। ইমান আজকের মতন এত সস্তা হয়ে যায় নি। সাদা কাগজের ওপর লাখ লাখ টাকার কাজ হত। কিন্তু তার পরেই এল সাতান্নর বিদ্রোহ। সেই বন্যায় কত যে রাজ্যপাট ভেসে গেল তার ইয়ত্তা নেই। সেইসঙ্গেই ধসে পড়ল ত্রিবেদী পরিবারের ধনসম্পদের ভিত। তোষাখানা লুট হয়ে গেল, নথিপত্তর মুদির দোকানের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে গিয়ে উঠল। তার পর আস্তে আস্তে পরিস্থিতি সহজ হয়ে এল। সামন্ত-জমিদারেরা আবার সামলে উঠলেন। কিন্তু ততদিনে যুগ পালটে গেছে। মুখের কথার চেয়ে হাতের লেখার মান বেড়েছে। সাদা কাগজ আর রঙিন কাগজের হিসেবে তারতম্য হয়েছে।

পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবার পর দেবদত্ত আবিষ্কার করলেন এই ভাঙা বাড়িটা ছাড়া তাঁর সম্পত্তি বলতে আর কিছুই নেই। দিন চলার আর উপায় রইল না। চাষবাসে কষ্ট আছে, পরিশ্রম করতে হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্যে অর্থ আর বুদ্ধি দরকার। বিদ্যেও এমন কিছু নয় যে কোথাও চাকরি খুঁজবেন। আবার পারিবারিক

মর্যাদা ভিক্ষে করার পথে বাধা। বাকি রইল— বছরে দু-তিন বার করে পুরোনো দেনদারদের বাড়ি বাড়ি টহল দেওয়া— অনাহূত জ্ঞাতি-কুটুমের মতন। আদায়-বিদায় রাহাখরচ যা জোটে, তাতেই টেনে-কষে চালানো। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে ভাঙা বাড়িটা ছাড়া আর ছিল কয়েক ঝুড়ি চিঠিপত্র, কয়েক বাণ্ডিল হুণ্ডি— তার কালিও কপালের লেখনের মতন, ফিকে হয়ে এসেছে। লক্ষ্মী না হলেও, তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন তো বটে। দু-হাতে তাই আঁকড়ে রেখেছিলেন দেবদত্ত। তা কেউ বিড়ম্বনাই বলুন আর আহাম্মকীই বলুন— পণ্ডিতমশায়ের ঐ পুরোনো কাগজের ঝুড়ির ওপর সগর্ব মমতা ছিল। দ্বিতীয়ার তিথিগুলিতে তাঁর হৃতপ্রতিষ্ঠার শ্রাদ্ধতর্পণ হত। গ্রামে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হলে ঐ পচাগলা কাগজের স্তূপ থেকেই সমাধান বেরিয়ে আসত, প্রতিপক্ষকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হত। তা দেখুন, সত্তর পুরুষে কেউ হাতিয়ারের চেহারা না দেখলেও যদি ক্ষত্রিয়ত্বের অহংকার করতে পারে, তা হলে পণ্ডিত দেবদত্তই বা তাঁর দলিল-দস্তাবেজের অহংকার ছাড়বেন কেন। তাঁর কোনো অপরাধ নেই। হাজার হোক ঐ কাগজপত্রের হিসেবের মধ্যে অন্তত সত্তর লাখ টাকা লুকিয়ে আছে।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্তির। অল্পায়ু প্রদীপগুলো সব জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। আজকের রাত চোর আর জুয়াড়ির শুভ-রাত্রি। আজ যে জুয়ায় হারবে, সে সারা বছর ভর হেরো। মা লক্ষ্মীর আবির্ভাব উৎসব ধুমধাম করে চলেছে। কড়ির ওপর মোহরের বাজি ধরা হচ্ছে। ভাঁটিখানায় মদের বদলে লাল জল বিকোচ্ছে। সারা শহরে পণ্ডিত দেবদত্ত ছাড়া আর একটা প্রাণী নেই, যে আজ পরের ধনে ভাগ বসাবার ফিকিরে নেই। এদিকে ভোর থেকেই গিরিজার অবস্থা সংকটজনক। জ্বরের প্রকোপে ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছে। হঠাৎ একবার চমকে উঠে চোখ মেলল, বললে— আজ দেওয়ালি না?

আশাহত দেবদত্তের মনে কোনো সাড়া জাগল না, গিরিজার জ্ঞান ফিরেছে দেখেও না। জবাব দিলেন— হ্যাঁ, আজ দেয়ালি।

ঘোরলাগা চোখে এদিক-ওদিক তাকাল গিরিজা। বললে—আমাদের বাড়িতে আজ আলো দেওয়া হয় নি?

দেবদত্ত ফুঁপিয়ে উঠলেন। গিরিজা বলল— দেখ গো, আজ বছরকার দিন, বাড়ি অন্ধকার থাকবে। তুমি আমায় একটু তুলে বসিয়ে দাও, আমি পিদিম জালিয়ে দিই।

কথাগুলো দেবদত্তর শূন্য পাঁজরে বিঁধে গেল। অন্তিম মুহূর্তে মানুষের মনে নানান স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ভিড় করে।

লালা শংকরদাস এ শহরের নামজাদা চিকিৎসক। তাঁর প্রাণ-সঞ্জীবন ঔষধালয়ে ওষুধের জায়গায় ছাপাখানার মেশিন থাকে। ওষুধ যত তৈরি হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যায় ইস্তাহার ছাপা হয়।

কবিরাজ মশায়ের মতে রোগব্যাধি হল বড়োলোকদের ন্যাকামি আর ভণ্ডামি। পলিটিক্যাল ইকনমি অনুযায়ী এ-সব বাবুগিরির জিনিসের ওপর যত বেশি সম্ভব ট্যাকসো বসানো দরকার। তাতে যদি কেউ খেতে না পায়, না পাক, কেউ মারা পড়ে তো পড়ুক। ব্যায়রামে পড়বে, আবার নিখরচায় চিকিৎসা করাবে, এত আবদার কিসের! এইজন্যেই তো ভারতবর্ষের এই দশা। এতে লোকে অসাবধান হয়ে পড়ে, অশক্ত হয়ে পড়ে।

দেবদত্ত মাসখানেক যাবৎ নাগাড়ে কবিরাজের দোকানে গেছেন। কিন্তু এমন সুযোগ পান নি যে তাকে নিজের হাল বুঝিয়ে বলবেন। পাবেন কোত্থেকে। কবিরাজের তাঁর দিকে তাকানোরই ফুরসত হয় না। কবিরাজের অন্তরে কোনো কোমল কক্ষ আছে কিনা তার তল্লাসে দেবদত্ত বেশ কিছুদিন নষ্ট করেছেন, কিন্তু ফল কিছু হয় নি। সে অন্তঃকরণ নিরেট, নিরন্ধ্র। চোখের জল, জোড় হাত এ-সবে কোনো কাজ হবার নয়।

অমাবস্যার ভয়ংকরী রাত্রি। মধ্যরাতের পর আকাশের নক্ষত্রের দল আরো বেশি করে দল বেঁধে বেরিয়েছে, শ্রীনগরের নিবন্ত দীপা-বলীর দিকে চেয়ে চেয়ে তারা ঠাট্টা-উপহাস করছে। দেবদত্ত

অধীর হয়ে উঠলেন, গিরিজার শিয়র ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তার পর চঞ্চল পায়ে কবিরাজমশায়ের বাড়ির দিকে চললেন। দক্ষিণা না নিয়ে শংকরদাস আসবেও না, ওষুধও দেবে না— দেবদত্ত তা বেশ জানেন। তবু আশা, যদি দয়া করে আসে। দেবদত্ত আঁধার ভেদ করে এগিয়ে চললেন।

তিন

লালা শংকরদাস তখন তাঁর 'রামবাণ বিন্দু'র বিজ্ঞাপন রচনায় ব্যস্ত। বিজ্ঞাপনের ভাবভাষাশৈলীর নমুনা দেখে বোঝা শক্ত এর রচয়িতা কোনো বৈদ্যচূড়ামণি নাকি বিদ্যারত্নালংকার। একটু নমুনা শুনুন :

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনার কি জানেন আমি কে? আপনার বিবর্ণপীত মুখমণ্ডল, আপনার যষ্টিনিভ শীর্ণ কায়া, সামান্য শ্রমেই আপনার হাঁফধরা, রূপে রসে ভরা পৃথিবীর বৈচিত্র্যের আস্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার এই যে আপনার মন্দ ভাগ্য, আপনার ম্লান বদন— এসব-কিছুই ঐ প্রশ্নের অনুকূলে উত্তর দিচ্ছে। তবে শুনুন আমি কে? আমি সেই আয়ুধ যে মানুষের অজ্ঞাত-ভীতি আর দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রহেলিকা জালকে কেটে খানখান করে দেবার ব্রত নিয়েছে; বিজ্ঞাপনপটু, প্রতারক, প্রবঞ্চক, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে অভ্যস্ত চিকিৎসক বৈদ্যনাথের অযোগ্য ব্যক্তিদের জড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে এই পৃথিবীকে কলঙ্কমুক্ত ও পবিত্র করে তোলার দিব্য কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়েছে। আমি হচ্ছি এক অভূতপূর্ব, অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয় ব্যক্তি যে হতাশ্বাসকে আশাবাদী, কাপুরুষকে শৌর্যবান, শৃগালকে সিংহে রূপান্তরিত করে দেয়। মন্ত্র নয়, জাদু নয়, ইন্দ্রজাল নয়— আমার সিদ্ধির মূলে রয়েছে আমার নব-আবিস্কৃত 'অমৃতবিন্দু'; এসব-কিছু তারই যৎসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অমৃত-বিন্দু যে কী বস্তু, তা আর কী বলব, এক আমিই তার রহস্য জানি। মহর্ষি অগস্ত্য, ধন্বন্তরির কানে কানে এই ওষুধের গোপন ফরমুলা

বলে গিয়েছিলেন। বলে বোঝাবার জিনিস নয়। নিজের হাতে ভি. পি.-র মোড়ক খুলে নিজেই পরখ করুন। এ হল সর্বরোগহর। এ হল দৃপ্ত পৌরুষ, তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত ধীমত্তা, কুলিশদৃঢ় ধারণাশক্তির প্রতীক। বর্ষাধিককাল কবিসম্মেলনে গলাবাজি করেও আপনি কবি হতে পারেন নি? দালাল গোষ্ঠীর চাটুকারিতা আর মক্কেলযূথের নিঃস্বার্থ গুণকীর্তন সত্ত্বেও আপনাকে কাছারির আঙিনায় ক্ষুধিত সারমেয়ের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়? চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ফেটে রক্ত পড়ছে, টেবিল ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, তবুও আপনার নিষ্ফল ভাষণ কাউকে প্রভাবিত করতে পারছে না? আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে অমৃতবিন্দু সেবন করুন। এর সবচেয়ে বড়ো গুণ, যার পরিচয় আপনি প্রথম দিনেই পাবেন— আপনার চোখ খুলে যাবে, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে যাবে, জীবনে আর কখনো আপনি প্রচারপটু হাকিম-কবিরাজের ধোঁকাবাজির ফাঁদে পা দেবেন না।"

বিজ্ঞাপন লেখা শেষ করে বৈদ্যরাজ উচ্চ কণ্ঠে পড়তে লাগলেন। তাঁর দৃপ্ত চোখ থেকে আশা আর অহমিকার দীপ্তি ঠিকরে পড়তে লাগল। ইত্যবসরে পণ্ডিত দেবদত্ত বাইরে থেকে আওয়াজ দিলেন। কবরেজমশায় প্রকৃতপক্ষে খুশি হয়ে উঠলেন। কারণ রাতের বেলায় তাঁর ডবল ফি। লণ্ঠন হাতে বৈদ্য বেরিয়ে আসতেই রোরুদ্যমান দেবদত্ত তাঁর পা দুটি জাপটে ধরে বললেন— কবরেজমশায়, আমায় দয়া করুন। গিরিজা মৃত্যুশয্যায়। এক আপনি ছাড়া কেউ নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে। আমার ভাগ্যে যা আছে তা খণ্ডাতে পারে না। কিন্তু এই সময় একবার যদি আপনি পায়ের ধুলো দেন, তবে মর্মদাহ থেকে বাঁচতে পারি। তা হলে সারা জীবন এই ভেবে সান্ত্বনা পাব যে আমার যা সাধ্য ছিল, তা করেছি। ভগবান জানেন আপনার সেবা করার যোগ্যতা আমার নেই। তবু যত দিন বাঁচব আপনার গুণ গাইব, আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

কবিরাজ প্রথমটায় একটু নরম হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী দুর্বলতা ক্ষণপ্রভার দীপ্তি, স্বার্থের বিশাল জমাট আঁধাররাশি পরক্ষণেই তাঁকে গ্রাস করল। রাজি হলেন না।

চার

সেই অমাবস্যার রাত। গাছে গাছে নিস্তব্ধ অন্ধকার। জুয়ায় যে জিতেছে সে মাঝরাতে বাচ্চার ঘুম ভাঙিয়ে তার হাতে খেলনা মিষ্টি তুলে দিচ্ছে। যে হেরেছে, সে রুক্ষ-মূর্তি ঘরের কর্ত্রীর রোষ-মান ভাঙাছে, মার্জনা ভিক্ষা করছে। এমন সময় বাতাস আর অন্ধকার চিরে একটা ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল। অবিরাম বেজে চলেছে। শব্দটা কাছাকাছি হতে হতে ক্রমে পণ্ডিত দেবদত্তের ভাঙা বাড়ির সামনে এসে থামল। নৈরাশ্যের অথৈ সমুদ্রে দেবদত্ত তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। শোকে বেদনায় মুহ্যমান। তাঁর প্রাণের প্রিয় জীবন-সঙ্গিনীর শেষ দশায় এক্‌ফোঁটা ওষুধ তাঁর গালে দিতে পারলেন না। কী করবেন? সেই চশমখোর কবিরাজকে যে কিছুতেই আনা গেল না। পায়ে ধরতেও বাকি রাখেন নি।— নাহয় সারা জীবন তোর চাকর হয়ে থাকতুম, তোর ইস্তাহার ছেপে দিতুম, শেকড়-বাকড় বেটে দিতুম। আস্তে আস্তে দেবদত্তর চোখ থেকে বংশ প্রতিষ্ঠা আর ঐতিহ্যের ঘোর কেটে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন সত্তর লাখ টাকার ছেঁড়া কাগজের কাঁড়ি তাঁর কোনো কম্মেই লাগবে না। সিন্দুক থেকে মখমলের থলেটা টেনে বার করেন দেবদত্ত। বহুযুগের সাক্ষী, পিতৃপুরুষের বৈভবের শেষ স্মারকচিহ্ন দলিলপত্র সব ঐ থলেতেই ছিল। একখানি একখানি করে নিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপের ওপর ধরলেন। কাগজগুলো পুড়তে লাগল। যেমন সুখলালিত দেহ চিতায় পোড়ে। দেবদত্ত দেখছেন। এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে ডাকল। চমকে উঠে দেবদত্ত মাথা তুললেন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজার বাইরে গেলেন। দেখলেন জনাকয়েক লোক মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে একটা হাতি। হাতিটা শুঁড় দিয়ে ভেরেণ্ডার গাছগুলো উপড়ে ফেলছে। গাছগুলো দেউড়িতে দারোয়ানের কাজ করছিল।

হাতির ওপর এক সুদর্শন যুবক। তার মাথায় জাফরান রঙের

রেশমী পাগড়ি। কপালে অর্ধচন্দ্রের আকারে চন্দনের তিলক। বল্লমের মতন ছুঁচলো করে পাকানো গোঁফ, মুখে বৈভবের আলো, আভিজাত্যের জ্যোতি। দেখে কোনো জাগীরদার বলে মনে হয়। তার পরনে কলিদার আংরাখা আর চুনটকরা পাজামা। কোমরে তলোয়ার ঝুলছে, গলায় সোনার কণ্ঠহার আর বিছে। সুগঠিত দেহের শোভাকে বাড়িয়ে তুলেছে। পণ্ডিতজীকে দেখামাত্র যুবক রেকাবে পা রেখে নীচে নেমে এল। এসে তাঁকে নত হয়ে নমস্কার জানাল। যুবকের নম্র বিনীত ভঙ্গিতে পণ্ডিতজী ঈষৎ লজ্জা বোধ করেন। প্রশ্ন করলেন— মশায়ের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

সৌম্যদর্শন যুবক নম্র স্বরে জবাব দিল— আমাকে আপনি চেনেন না। তবে আমি আপনার সেবক। অধীনের বাড়ি রাজনগর। আমরা ওখানকার জাগীরদার। আপনার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, কৃতজ্ঞতার সে ঋণ আমাদের পরিবার আজো বহন করছে। আজ আমাদের বংশের যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্পদ বা প্রতিষ্ঠা সে সবই আপনার মহান পূর্বপুরুষদের কৃপা ও করুণার দান। আমি আমার স্বজনবর্গের কাছে বহুদিন থেকেই আপনার নাম শুনেছি, বহুদিন থেকেই আপনাকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ আমার সেই সৌভাগ্য হল। আমার জন্ম সার্থক হল।

যুবকের কথায় পণ্ডিত দেবদত্তের চোখ জলে ভরে গেল। পিতৃপুরুষের কীর্তির গৌরব তাঁর অন্তরের একটা অতি গোপন অতি কোমল জায়গা জুড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখের ওপর থেকে অভ্যস্ত দৈন্যের গ্লানির ছায়াটা যেন সরে গেল। মহিমাগম্ভীর কণ্ঠে দেবদত্ত বললেন— এ আপনার সৌজন্য ও মহানুভবতার উক্তি। নয়তো আমার মতো কুপুত্রের কী যোগ্যতা যে তাঁদের বংশধর বলে দাবি করব। তাদের কথাবার্তার মধ্যেই চাকর এসে উঠোনে ফরাস বিছিয়ে দিয়ে গেল। তাঁরা বসে আলাপচারি করতে লাগলেন। এক-একটি কথায় পণ্ডিতমশায়ের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল, ঠিক যেমন মলয় বাতাসের

ছোঁয়া লেগে ফুল হেসে ওঠে।

পণ্ডিতজীর পিতামহ একসময়ে এই যুবকের পিতামহকে পঁচিশ হাজার টাকা কর্জ দিয়েছিলেন। ঠাকুর* এখন গয়ায় গিয়ে তার পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণ করতে চায়, তার আগে তাঁদের কৃত ঋণের ভার থেকে তাঁদের বিদেহী আত্মাকে নিঃশেষে মুক্তি দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য। তার বংশের সমস্ত পুরনো নথিপত্র থেকে এই সমস্ত ঋণের হিসেব আর উত্তমর্ণদের খোঁজ নিয়ে তাই সে পবিত্র অভিযানে বেরিয়েছে। সেদিনের পঁচিশ হাজার আজ বেড়ে পঁচাত্তর হাজার হয়েছে।

ধর্ম চিত্তকে শুদ্ধ চিন্তা ও পুণ্যকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে। আর তেজস্বী চরিত্র, পবিত্র আত্মাই ধর্মের আধার। পরিচয় আর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হলে ঠাকুর পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞেস করল— আপনার কাছে পুরনো দলিলপত্র আছে কি?

মুহূর্তে দেবদত্তের বুক দশহাত বসে গেল। সে-ভাব সামলে নিয়ে জবাব দিলেন— থাকার তো কথা। দেখি, ঠিক বলতে পারছি না।

ঠাকুর অনুদ্‌বিগ্ন স্বরে বলল—দেখুন, যদি পাওয়া যায় আমি নিয়ে যাব।

দেবদত্ত উঠলেন। তার হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল। আশার ছলনা! ভাগ্যের হিংস্র পরিহাস। হয়তো ইতিমধ্যে সে দলিল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, কে জানে! কাগজ না পেলে কি আর কেউ টাকা দেয়? দেবে কেন? তেষ্টার জল ঠোঁটের গোড়ায় এল, তবু…'হে ভগবান, কাগজটা যেন পাই, অনেক কষ্টে পেয়েছি এবার একটু দয়া কর।' আশায় সংশয়ে ছিন্নভিন্ন দেবদত্ত ভেতরের ঘরে গেলেন, টিমটিমে পিদিমের আলোয় বাদবাকি কাগজপত্রগুলো উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। আনন্দে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে দেবদত্ত ধেই ধেই করে নেচে উঠলেন। ছুটে গিয়ে শয্যাশায়ী গিরিজার গলা জড়িয়ে ধরলেন— জয় ভগবান, গিরিজা রে, এবার তোকে বাঁচাতে পারব

* হিন্দীতে রাজা জমিদারদের 'ঠাকুর' বা 'ঠাকুরসাহেব' বলে সম্বোধন করা হয়।

বোধহয়। মণি রে, সোনা রে,…। উন্মাদের তো আর জাগতিক খেয়াল থাকে না। নইলে দেবদত্তর খেয়াল হত তাঁর গিরিজা আর সাড়া দিচ্ছে না, আর সাড়া দেবে না কোনোদিন।

দেবদত্ত কাগজ হাতে নিয়ে এত দ্রুতপায়ে বাইরের ঘরে এলেন যেন পায়ে পাখা গজিয়েছে। অতিকষ্টে নিজের আবেগ-তরঙ্গকে মনে চেপে রেখে বললেন— এই নিন. পাওয়া গেছে। নেহাৎ যোগাযোগ, নইলে সত্তর লাখ টাকার দলিলপত্র সব উইয়ের পেটে গেছে।

সৌভাগ্য এতই আকস্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত যে মাঝে মাঝে দেবদত্তর মনে সন্দেহ আসছিল। ঠাকুর যখন কাগজের দিকে হাত বাড়াল, সেই মুহূর্তে দেবদত্তর মনে হল— এখন যদি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, কী করতে পারি! সন্দেহ অমূলক, তবু, মানুষ দুর্বলচিত্ত জীব। ঠাকুর বুদ্ধিমান। পণ্ডিতের মনের ভাব বুঝতে দেরি হয় নি তার। কাগজটা হাতে নিয়ে একবার উদাসীনভাবে মশালের আলোয় দেখল, বললে—বাঁচালেন। এই নিন আপনার টাকা। আশীর্বাদ করুন আমার পূর্বপুরুষ যেন মুক্তি পান।

কোমর থেকে বটুয়া বার করে হাজার টাকার পঁচাত্তর খানা নোট বের করে ঠাকুর পণ্ডিতের হাতে দিল। পণ্ডিতজীর বুকের ভেতর ধড়ফড় করছিল, নাড়ী বেগে চলছিল। একবার চকিত চাউনিতে চারদিক দেখে নিলেন পণ্ডিত— কেউ কোথাও থেকে দেখে ফেলল না তো? কম্পিত হাতে নোটের গোছা ধরে নিলেন। কৌলীন্য দেখাবার নিষ্ফল প্রয়াসে টাকাটা গুনেও নিলেন না, কেবল অপাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়েই মুঠোয় ধরে পকেটে পুরলেন।

পাঁচ

সেই অমাবস্যার রাত। আকাশের বাতিও ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। সূর্যোদয়ের আরাধনা চলেছে নিঃশব্দে। পূর্ব আকাশের

গায়ে গোলাপী আভা, পশ্চিমেও ফিরোজা আভাস। ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে দেবদত্ত ঘরে এসেছেন। চিত্তজুড়ে স্নিগ্ধ ঔদার্যের প্রলেপ। এখন তাঁর দোর থেকে কোনো প্রার্থীকে শূন্য হাতে ফিরতে হবে না। সত্যনারায়ণের কথা ধূমধাম করে হবে এবার থেকে। গিরিজার শাড়ি-গয়না আসবে। অন্তঃপুরের শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী রেখে উনি কায়েন মনসাবাচা প্রণতি জানালেন। তার পর বাকি চিঠিপত্রগুলো মখমলের ঝাঁপিতে পুরে তুলে রাখলেন। কিন্তু আর কোনো ভবিষ্যৎ লাভের প্রত্যাশায় নয়। উঞ্ছবৃত্তির জীবন থেকে সদ্যত্রাণ পেয়েই এখন তাঁর মনে আবার বংশমর্যাদার ঐতিহ্যের প্রসাদ ফিরে এসেছে বনেদীয়ানার গর্ব। আর বেশি সমাজের লোভ নেই দেবদত্তর। যা পেয়েছেন, দু'জনের (!) বাকি জীবনটা তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আর-একজনের ভাবনার দায় যে ঘুচে গেছে— পণ্ডিত তখনো জানেন না। এখনো অনেক স্বপ্ন দেখছেন তাকে নিয়ে— 'এ খবর শুনে কী খুশিই হবে', 'উঠে বসবে হয়তো'··· 'সারা জীবন দুটো ভালোমন্দ খেতে পর্যন্ত পায় নি— আর আজ?'

গিরিজার শিয়রে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দেন— গিরিজা, চোখ মেলে চাও তো। এখন কেমন বোধ করছ? দেখ গো, ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন গিরিজা, গিরি··· গিরিজার চোখ মেলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চাদরটা তুলে পণ্ডিত এবার মুখটা ঠাহর করে দেখলেন। তার পর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। পাঁজরা ভেদ করে একটা জমাট বাতাস বেরিয়ে গেল। চোখের কোল বেয়ে রক্তের ফোঁটার মতো জল গড়িয়ে পড়ল। উঃ সৌভাগ্যের এত চড়া দাম। বাঃ ওপরঅলা, তোমার করুণার জবাব নেই। কিন্তু এখন যদি বলি, তোমার দান ফিরিয়ে নাও। যদি বলি এত দুর্মূল্য সওদায় আমার দরকার নেই! আমি গিরিজাকে চাই— কিছুরই মূল্যে আমি তাকে হারাতে পারব না।

ছয়

গিরিজার দুঃখী জীবনের মতন অমাবস্যার অন্ধকার রাতও কেটে গেল। ক্ষেতে হাল দিতে দিতে কিষাণ গান গাইছে। ঠাণ্ডায় জড়সড় বাচ্চার দল সূর্যোদয়ের আরাধনা করছে। কুয়োতলায় ভিড় করেছে নতুন বউ-ঝিয়ের দল, জল ভরতে নয়, রঙ্গ করতে। ঘড়ার গলায় দড়ি বেঁধে জলে ডুবিয়ে কেউ তার ফোকলা শাশুড়িকে নকল করে দেখাচ্ছে, কেউ থামের গায়ে ঠেস দিয়ে সখীর সঙ্গে সোহাগের গপ্প করছে। বুড়িরা নাতি-কোলে এসে খিটখিট করছে— 'হ্যালা, জলভরা কি হয় না, সেই কবে গিয়েছিস···।' কবিরাজ শংকর দাসের তখনো আদ্ধেক রাত্তির। তাঁর ওষুধের দোকানের সামনে ইতিমধ্যে কাশিতে ভোগা ছেলের পাল আর কাতরানো বুড়োর দলের দঙ্গল জমে গেছে। ভিড় এড়িয়ে কিছু দূরে দু-তিনজন জোয়ান ছেলে ঘুরছে ফিরছে। তারা এসেছে, সুযোগ পেলে কবিরাজের সঙ্গে একটু আড়ালে কথা বলবে। এমন সময় দেবদত্ত হাজির হলেন। খালি পা, খালি গা, করমচা চোখ, ভয়াবহ চেহারা, বগলে কাগজের এক বিশাল বাণ্ডিল— সেটা ধপ্ করে দোরগোড়ায় ফেলেই চীৎকার করে উঠলেন— কবরেজ মশায় আছেন? ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বৈদ্য তাঁর ভৃত্যকে হুকুম দিলেন দোর খুলতে। নৈশপ্রমোদক্লান্ত কাহার সবেমাত্র হুঁকো-কলকের বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছিল। তার অতিনিদ্রার অসুখ। মনিবের ভাষণ-ভর্ৎসনা-প্রহারে উপশম হয় নি। দোর খুলে সে আগুন আনতে গেল। বৈদ্য ওঠার চেষ্টা করছেন, ঝড়ের বেগে দেবদত্ত ঘরে ঢুকে পড়লেন। নোটের বাণ্ডিল নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ সুরে বললেন— এতে পঁচাত্তর হাজার টাকা আছে। আপনার 'ফি' নিয়ে কৃতার্থ করুন। আর আসুন আমার সঙ্গে। গিরিজাকে দেখে এমন-কিছু ব্যবস্থা দিন, যাতে সে একবার চোখ মেলে তাকায়। এই সব-কিছু তার একবার দৃষ্টিপাতের দাম। নিন, উঠুন। টাকা

তো আপনার মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। তুলে নিন। দেরি করবেন না। শুধু একবার গিরিজাকে জাগান। তার একটি কটাক্ষের কাছে এই সমস্ত দৌলত তুচ্ছ। উঠুন···চলুন···

লজ্জায় অনুশোচনায় মুখ কালো হয়ে গেল কবিরাজের। কোনো-মতে মুখ খুললেন। বললেন— আমি মর্মাহত, অনুতপ্ত। চিরদিনের জন্যে অপরাধী হয়ে রইলাম। আজ এক বিরাট শিক্ষা দিলেন আপনি। ঈশ্বরের কৃপায় এমন ভুল আর কখনো হবে না। বিশ্বাস করুন আমি শোকার্ত। কথাগুলো বৈদ্যর অন্তর থেকে বেরোচ্ছিল।

অনল-সমাধি

সাধুসন্নিসির সঙ্গে পড়লে কত বদলোকও ভালোমানুষ হয়ে যায়। অথচ আমাদের প্রয়াগের এমনি পোড়াকপাল, যে তার কপালে সৎসঙ্গেও উলটো ফল হল। গাঁজা, চরস আর ভাঙের নেশা খুব জমে উঠল, লাভের মধ্যে একটা মেহনতী, কাজপাগল জোয়ান মরদ ছেলে, আলসে কুড়ের বাদশা বনে গেল। হবেই তো। বটগাছের তলায় ধুনি জ্বেলে জটাধারী বাবার পাশে সভা-আলো-করা ভক্ত মহাজনদের মজলিশে, চরসের দম লাগানোর যত মজা, জীবনযুদ্ধে অত মজা কোথায় পাবে! সেখানে ভক্তজন সমাবেশে কখনো সৎ কথা হচ্ছে, কখনো ছুটো ভজন কীর্তন হচ্ছে। ছিলিম সাজার ভারটা প্রয়াগের ওপরেই থাকে। ভক্তরা পুণ্যের ফল পান দেরিতে পরলোকে গিয়ে। প্রয়াগের হাতেনাতেই ফল মিলে যায়, কারণ ছিলিমের পয়লা টানটা তারই ভাগে। মহাত্মাদের শ্রীমুখে ভাগবৎ চর্চা শুনে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে প্রয়াগ, ক্ষণিকের জন্যে মধুর বিস্মরণ এসে তার বিষয়চিন্তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সৌরভে-সংগীতে-জ্যোতিতে সব মিলিয়ে এক অপূর্ব অনুভূতির নতুন জগতে হারিয়ে যায় সে। দিন-মজুরিতে এই স্বর্গসুখ কোথায় পাবে সে! শুধু মাঝে মাঝে তার ছিঁড়ে যায়, যখন রাত এগারোটা বেজে যাবার পর রুক্মিণী ডাকতে আসে। তখন বাস্তবের রূঢ় ধাক্কায় ওর স্বপ্ন চুরমার হয়। সংসার কাঁটায় ভরা বাদাড়ের মতন লাগে। বিশেষ করে যখন সেই দুপুর রাতে বাড়ি ফিরে দেখে ঘরে এককণা খুদকুঁড়োও নেই এবং অবিলম্বে কিছু জোটানো দরকার।

প্রয়াগ জাতে অস্পৃশ্য। গাঁয়ের চৌকিদারির চাকরি পেয়েছিল। মাসে দুটাকা ক আনা মাইনে। উর্দি আর পাগড়ি ফ্রি। কাজের মধ্যে হপ্তায় একদিন থানায় গিয়ে সাহেবদের ঘরদোরে ঝাড়ু দেওয়া, আস্তাবল সাফ করা, কাঠ কাটা। দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করত

প্রয়াগ। কারণ ফাঁকি দিলে দৈহিক-আর্থিক দু'রকম শাস্তিই ভোগ করতে হবে। চোখের জল চোখেই শুকোত, হাজার হোক মাসে চারদিন খেটে দু'টাকা সওয়া দু'টাকা রোজগার খুব কম কথা নয়। তার ওপর, গ্রামের মাথাদের ওপর না হোক, গরিব গুরবো ছোটো-লোকদের ওপর দিব্যি রোয়াব নিয়ে বাস করা যায়। মাইনের টাকাও যা পেনসনের টাকাও তা। তায় সাধুসন্তর সান্নিধ্যে আসার পর থেকে ও-টাকা তো নস্যি খরচ। কাজেই জীবিকার প্রশ্ন ক্রমেই কণ্টকিত হয়ে উঠল। সৎসঙ্গে জোটার আগে ওরা স্বামী স্ত্রী গাঁয়ে মজুরি করত।

রুক্মিণী কাঠ কেটে বাজারে বেচতে যেত। প্রয়াগ কখনো করাত-কুড়ুল চালাত, কখনো হাল-লাঙল চালাত, কখনো বা কুয়োয় মোট চালিয়ে জল তুলত। হাতের সামনে কাজ পেলেই লেগে যেত। সদা হাসিমুখ, পরিশ্রমী, ফুর্তিবাজ, কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি নেই। এমন লোকের কখনো অন্নের অভাব হয় না। তার ওপর অতি অমায়িক স্বভাব। কোনো কাজে মুখে 'না' নেই। মুখ ফুটে কেউ একবার কিছু বললে হয়, প্রয়াগ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োবে। গাঁয়ের লোকের কাছে এই-সব কারণেই তার খুব খাতির ছিল। আর সেই সুনাম ভাঙিয়েই তার বছর দু-তিন বেশ চলে গেল, বিশেষ অসুবিধে হল না। দুবেলা দুমুঠোর তো কথাই নেই, যার ঘরে জোড়া জোড়া বলদ বাঁধা সেই মাহাতোই বড়ো দুবেলা খায়, যে দিন-মজুর প্রয়াগের দুবেলা জুটবে। তবে হ্যাঁ একসাঁঝ ডালরুটি জুটে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইদানীং সমস্যা দিনকে দিন জটিল হয়ে উঠছে। তার ওপর নতুন বিপত্তি, বউটাও কেমন যেন আগের মতন অতটা পতিব্রতা, সেবাপরায়ণা, তেমন চটপটে আর নেই। নাঃ, আজকাল তার প্রগল্‌ভতা আর বাচালতা রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই প্রয়াগের এখন অবিলম্বে এমন একটা সিদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে, যাতে জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে ভগবৎ-ভক্তি আর নিত্য সাধুসেবায় লাগতে পারে।

একদিন রুক্মিণী বাজার থেকে কাঠ বেচে ফিরে এলে, প্রয়াগ

ডেকে বলল— শোন্, কিছু পয়সা ছাড় দিকি, দম লাগিয়ে আসি।

মুখ বেঁকিয়ে রুক্মিণী জবাব দিলে— মৌতাতের যদি অতই খ্যাঁচ্, তো গতর খাটাও-না কেন? কেন, বাবারা কেউ নেই আজকাল, ছিলিমের প্রসাদ জুটছে না?

প্রয়াগ উষ্মা প্রকাশ করল। বললে— অত বকবক করিস নি। ভালো চাস তো পয়সা বার কর্। নইলে বেশি জ্বালাতন করলে, একদিন যে দিকে দুচোখ যায় হাঁটা দোব, কেঁদে কূল পাবি না।

রুক্মিণী বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে বলে— ওঁ-রে আমার, কাঁদতে বয়ে গেছে আমার। থেকেই বা কোন্ সোনাদানার মুড়ো খাওয়াচ্ছ? এখনো হাড় মাস কালি করছি, তখনো করব।

'বটে, এই তোর শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেই তো দিলুম পয়সা নেই।'

'অ। গয়না গড়াবার বেলায় খুব পয়সা থাকে। আর আমি দুটো পয়সা চাইলেই তোমার যত অভাব, না?'

রুক্মিণী চটে উঠে বলল— আমি গয়না গড়ালে তোমার গা জ্বলে কেন? তোমার তো দুগাছা পেতলের চুরি দেবারও মুরোদ হল না কোনো দিন। এখন নিজের কামাইয়ে গয়না পরছি দেখে বড্ড গা করকর করছে, না?

প্রয়াগ সেদিন ঘরে ফিরল না। রাত নটা বেজে গেলে রুক্মিণী ঘরে দোর দিল। ভাবল, গাঁয়েই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, ভেবেছে আমি সাধতে যাব, আমার দায় কেঁদেছে।

কিন্তু পরদিনও যখন এল না, তখন রুক্মিণীর চিন্তা হল। সারা তল্লাট খুঁজে এল। কোনো চুলোয় টিকির দেখা পেল না। সেদিন আর হেঁসেলে আঁচ পড়ল না। রাত্তিরে শুয়ে শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুম এল না রুক্মিণীর। গেল কোথায় মানুষটা? একটু ভয়ও হল, সত্যি সত্যিই বিবাগী হয়ে গেল নাকি। স্থির করল সকালে উঠেই আর্-একবার সন্ধানে বেরোবে, কোথাও বাদ দেবে না। যাবে কোথায়, ঠিক কোনো সাধুবৈরিগির আড্ডায় গিয়ে জুটেছে। ও কাল ঠিক থানায় রিপোর্ট করে দেবে।

ভোর না হতেই রুক্মিণী থানায় যাবার জন্যে তৈরি হল। কপাট টেনে দিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই দেখে প্রয়াগ আসছে। একা নয়, পেছন পেছন এক পটের বিবি। পরণে ছিটের সাড়ি, রঙিন ওড়না, লম্বা করে টানা ঘোমটা, শরম জড়ানো পায়ে ঠমক ঠমক হাঁটছে। রুক্মিণীর কল্‌জেটা ধক্ করে উঠল। ওর যেন পা চলল না। তার পরক্ষণেই সামলে নিয়ে এগিয়ে গেল। নতুন সতীনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে এল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো জীবন্মৃত রুগী, জীবনের ওপর তেতো বিরক্ত হয়ে বিষ খেয়ে মরতে চলেছে।

পড়শিরা ভিড় করে দেখতে এসেছিল। সবাই চলে গেলে রুক্মিণী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল— একে কোথায় পেলে?

প্রয়াগ একগাল হেসে জবাব দিলে— বাড়ি থোকে পালাচ্ছিল। আমার সঙ্গে পথে দেখা। ভাবলুম বাড়ির কাজকম্ম করবে। একপাশে পড়ে থাকবে। নিয়ে যাই।

'তা হলে আমার ওপর থেকে মন উঠে গেছে বল!'

প্রয়াগ অপাঙ্গ হেনে বলল— ধুর পাগলী, কী যে বলিস। ওকে তো তোর সেবার জন্যেই আনলুম।

'হুঁ, নতুন এলে কি আর পুরনোয় মন ওঠে?'

'যা যা, নতুন পুরনো আবার কী রে। মনের মিল থাকলেই নতুন, আর না থাকলেই পুরনো, বুঝলি। দে, এখন ক'কণ্ডা পয়সা দে দিকি, আজ তিন দিন থেকে দম দিই নি, পেট ফুলে উঠছে। আর হ্যাঁ দেখ, এখন দু-চার দিন বেচারীকে খাওয়া দাওয়া, তারপর নিজে থেকেই কাজকম্মে লেগে যাবে 'খন।

রুক্মিণী একটা গোটা টাকা এনে প্রয়াগের হাতে গুঁজে দিলে। দু'বার বলতে হল না।

দুই

প্রয়াগের আর কোনো গুণ থাক্ বা না-থাক্, একটা কথা মানতে হবে যে শাসন নীতির গোড়ার কথাটা তার খুব জানা ছিল। সে খুব কৌশলে ভেদনীতি চালিয়ে গেল।

মাসখানেক বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল। রুক্মিণীর চ্যাটাং চ্যাটাং বোলচাল একদম বন্ধ। কাগ না ডাকতে ওঠে, কোনোদিন কাঠ কেটে, কোনোদিন ঘাস কেটে, কোনোদিন ঘুঁটে দিয়ে বাজারে নিয়ে যায়। বেচে যা পয়সা পায় তার আদ্ধেক দেয় প্রয়াগের হাতে। বাকি পয়সায় সংসার চলে। সতীনকে কোনো কাজ করতে দেয় না। পড়শিদের বলে, সতীন তাতে কী হয়েছে, নতুন বউ তো। দু-চারটে মাস একটু আরাম করতেও যদি না পায়, কী ভাববে। কাজ করবার জন্যে আমি তো রয়েইছি।

সারা গাঁ জুড়ে রুক্মিণীর নামে সাধু সাধু রব। কেবল ঘুঘু প্রয়াগের মনের কথা অন্য। সে তার কূটনীতির সাফল্য দেখে নিজের মনেই আহ্লাদে আটখানা হয়।

একদিন নতুন বউ বললে— দিদি, ঘরে বসে বসে দিন কাটে না। আমাকেও কিছু বাইরের কাজ জোগাড় করে দাও না।

রুক্মিণী সস্নেহ কণ্ঠে বলে— আমার মুখে কালি দিবি নাকি পোড়ার মুখী, লোকে কী বলবে? ঘরের কাজ যেমন করছিস, তাতেই হবে। বাইরের জন্যে তো আমিই আছি।

বউ-এর আসল নাম কৌশল্যা, মুখে মুখে খাস্ত হয়ে সিলিয়া হয়ে গেছে। তা সিলিয়ার মুখে তখন আর কথা জোগাল না। কিন্তু ভেতর ভেতর তার অসহ্য লাগছে। দিনভর ঝি-গিরি করা তার পোষাচ্ছে না। ও খেটে মরে, কেউ ফিরেও তাকায় না, সংসারের কাজ যে। আর রুক্মিণী বাজার থেকে দুপয়সা কামিয়ে আনে ব'লে বাড়ির মনিব বনে বসে আছে। এবার সিলিয়াও বাইরে খাটতে বেরোবে, তখন মনিবের গুমোর ভাঙবে। প্রয়াগের কেবল পয়সার

সঙ্গে সম্পর্ক, সিলিয়ার তো বুঝতে বাকি নেই। সেদিন ঘাস নিয়ে রুক্মিণী বাজার রওনা হয়ে গেলে, সিলিয়াও ঘরে আগল দিয়ে গাঁয়ের রঙ তামাসা দেখতে বেরোল। গাঁয়ে বামুন, কায়েত, বেনে, চাষা সব ঘরই আছে। সিলিয়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমনই লজ্জা শরম আর ভালোমানষির ঠাট দেখাল যে সবাই গলে জল। বাড়ির মেয়েছেলেরা কেউ চাল ডাল দিলে, কেউ আর-কিছু দিলে। হাজার হোক নতুন বউ। কে না আপ্যায়ন করবে। একবার টহল দিয়েই সিলিয়া জেনে গেল যে গ্রামে জাঁতা পেষাইয়ের লোকের অভাব আছে, আর এ কাজটা ও অনায়াসেই পেতে পারে। ফেরার সময়ে ও মাথায় করে একধামা গম নিয়ে ফিরল।

এক পহর রাত থাকতে প্রয়াগের ঘুম ভেঙে গেল জাঁতার ঘরঘর আওয়াজে। রুক্মিণীকে বললে— সিলিয়া যে আজ রাত থাকতেই গম ভাঙতে লেগে গেছে দেখছি।

বাজারে আটা আর গমের দামে বিশেষ তফাত নেই। তাই রুক্মিণী আটাই কিনে এনেছে। তা হলে এই সাতসকালে সিলিয়া আবার ভাঙে কী, ও খুব অবাক হল। উঠে গিয়ে দেখে সিলিয়ার সামনে গমের ধামা, জাঁতা পিষছে। সিলিয়ার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলে— কে তোকে গম ভাঙতে বলেছে? এ কার গম?— ধামাটা সরিয়ে রাখে রুক্মিণী।

সিলিয়া বেপরোয়া ভঙ্গিতে জবাব দিলে— তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো না। আমি গম ভাঙছি, তাতে তোমার কী ক্ষতি হচ্ছে? জাঁতার ঘরঘরানিতে ঘুম আসছে না নাকি? ছাড়ো হাত ছাড়ো, ধামা ছেড়ে দাও, বসে বসে আর কত খাব, দু'মাস তো হয়ে গেল।

'আমি কি তোকে কিছু বলেছি?'

'বলতে হবে কেন। আমার নিজেরও তো একটা বুঝ আছে?'

'তুই এখনো এখানকার লোককে চিনিস না। খাটিয়ে নেবে ঠিক, শেষে পয়সা দেবার বেলায় চোখের জল ফেলবে। কার গম বল, কাল সকালেই নাকের ওপর ফেলে দিয়ে আসব।'

সিলিয়া রুক্মিণীর হাত থেকে গমের ধামা কেড়ে নিয়ে বললে— পয়সা দেবে না অমনি বললেই হল, মগের মুলুক নাকি ?

'তুই কথা শুনবি না ?'

'না। তোমার হুকুমের বাঁদী হয়ে থাকতে পারব না।'

তর্কাতর্কি শুনে প্রয়াগও উঠে এসেছিল। রুক্মিণীকে বললে— তা কাজ করতে চাইছে, করুক-না। জন্মভরে কি বউ হয়ে ঘোমটা টেনে বসে থাকবে নাকি। হল তো দু'মাস, আবার কী ?

'তোমার আর কী। আমার মাথা কাটা যায়।'

সিলিয়া বলে ওঠে— কেউ বসিয়ে খাওয়ায় নাকি। সকড়ি মাজা, ঘর নিকানো, ছড়াঝাঁট, হেঁসেলের কাজ, কুটনো কোটা বাটনা বাটা থেকে ঘরকন্নার সব কাজই তো আমায় একলা করতে হয়। জল টানতে টানতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। আমি পারব না আর এ-সব করতে।

প্রয়াগ বললে— তবে তুইই বাজারে যা এবার থেকে। ঘরের কাজ থাক্। রুক্মিণী সামলাবে। রুক্মিণী প্রবল আপত্তি করল··· এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে লজ্জা করল না ? বউমানুষ সবে দু'দিন এসেছে, এর মধ্যেই বাজারে গেলে লোকে মুখে থুতু দেবে না !

তবুও শেষ পর্যন্ত সিলিয়াই ডিক্রি পেল। রুক্মিণীর হাত থেকে একাধিপত্য লাগাম ছাড়া হয়ে গেল।

সিলিয়া সোমত্ত জোয়ান মেয়ে। চার হাতে কাজ করে। গম পিষে উঠেই ঘাস কাটতে চলে যায়। এত ঘাস কাটে যে বোঝা টেনে তোলা যায় না। সকলের তাক লেগে যায়। মদ্দমানুষ, যাদের ঘাস কাটাই পেশা, তারা অব্দি বাজি হেরে যায়। এক বোঝা ঘাস বেচে বারো আনা হল। সিলিয়া তাই দিয়ে আটা, চাল, ডাল, তেল, নুন, তরকারি, মশলা সব কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরল, আবার চার আনা বাঁচিয়েও আনল। রুক্মিণী ভেবেছিল সিলিয়া কোনোগতিকে দু-চার পয়সা নিয়ে ফিরবে, খুব বকাবকি করব আর কাল থেকে আর বাজারমুখো হতে দোব না। তার পর যেমন আমার রাজত্ব চলছিল, তেমনই আবার চলবে। কিন্তু জিনিস-

পত্তরের বহর দেখে ওর মাথা ঘুরে গেল। খেতে বসে প্রয়াগ মশলাদার তরকারির খুব তারিফ করল! এমন সুখাদ্য কতকাল পেটে পড়ে নি। খুব খুশি। খেয়েদেয়ে উঠে আঁচাতে যাচ্ছে, দাওয়ায় সিলিয়া দাঁড়িয়ে ছিল। বললে— আজ কত পয়সা পেলি ?

'বারো আনা।'

'বাঃ। তা সবই খরচ করে এলি নাকি। কিছু বেঁচে থাকে তো আমায় দে।'

সিলিয়া চার আনা পয়সা এনে প্রয়াগের হাতে দিল। প্রয়াগ আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে — বা বা বা, তুই যে আজ একেবারে মচ্ছব লাগিয়ে দিলি রে, অ্যাঁ। রুক্মিণী তো দু-চার পয়সা দিতেই বেজার হয়।

'পয়সা তো আর পুঁতে রাখার জন্যে নয়, খরচ করার জন্যে। আমার সে অভ্যেস নয়।'

'এবার থেকে তবে তুইই বাজারে যাস। ঘরের কাজ ও করবে।'

তিন

এবার দুই সতীনে সম্মুখ সমর শুরু হয়ে গেল। সিলিয়া সোয়ামীর ওপর দখল আঁটো রাখার জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে লাগল। শেষ রাত্তির থেকেই তার জাঁতার ভনভনানি কানে আসে। রাত পোহাতেই চলে যায় ঘাস কাটতে। একটু জিরিয়ে নিয়েই বাজারে ছোটে। ফিরে এসেও চুপ করে বসে না। এই দড়ি পাকাচ্ছে, এই খড় কুচোচ্ছে, আবার পরক্ষণেই গিয়ে কাঠ কাটতে বসছে। এক মুহূর্ত বসে নেই। রুক্মিণী ওর কাজের খুঁত ধরে আর ফুরসৎ পেলে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়, গাঁয়ে ঘুরে বেচে আসে।

প্রয়াগের এখন একাদশে বৃহস্পতি। দুই বউ দুদিক থেকে তাকে খুশি রাখার চেষ্টায় নাজেহাল। দুজনেই যা পারে হাতে এনে দিচ্ছে, আর তার সোহাগ পাবার জন্যে রেষারেষি করে খাটছে।

তবে সিলিয়া এখন এমন শক্ত খুঁটি জমিয়েছে যে তাকে নড়ানো শক্ত। একদিন তো একেবারে চুলোচুলিই হয়ে গেল। সিলিয়া সেদিন ঘাস কেটে এনে বসেছে, ঘামে সারা শরীর নেয়ে গেছে। ফাগুন মাস, রোদের খুব তেজ। সিলিয়া ভাবলো চানটান করেই বাজারে যাবে। দোরগোড়ায় ঘাসের বোঝা রেখে পুকুরে নাইতে গেছে। রুক্মিণী চাঙারি থেকে মুঠো দু-চার ঘাস বার করে নিয়ে পড়শির ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এল। তারপর বাঁধন একটু ঢিলে করে আবার সমান করে দিল।

পুকুর থেকে এসে সিলিয়া দেখে ঘাস কম। রুক্মিণীকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে— আমি জানি না। সিলিয়া গাল পাড়তে শুরু করল— যে আমার ঘাস ছুঁয়েছে তার গতরে পোকা পড়ুক, তার বাপ-ভাই মরুক, তার চোখ কানা হয়ে যাক। রুক্মিণী খানিকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল, শেষকালে তার মাথায় খুন চেপে গেল। তেড়ে এসে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিলে।

এই তো সিলিয়া বুক চাপড়ে মড়াকান্না শুরু করে দিলে। সারা পাড়া ভেঙে পড়ল। সিলিয়ার কর্মশক্তি, তার রোজগার সকলেরই চক্ষুশূল ছিল। ও কেন সকলের চেয়ে বেশি ঘাস কাটবে, ও কেন কাঠকুটরো কুড়নোয় সব্বাইকে টেক্কা দেবে, এত ভোরে কেন উঠবে, এত পয়সা কেন কামাবে। নানান কারণে সিলিয়া পাড়া-পড়শির সহানুভূতি হারিয়েছিল। সবাই এসে তাকেই দোষ দিতে লাগল। একমুঠো ঘাসের জন্যে এত কাণ্ড কেউ করে, অমন ঘাস তো লোকে ঝেড়েই ফেলে দেয়! দুমুঠো ঘাস বই, সোনাদানা তো আর নয়। তাই নিয়ে এত। নিয়ে থাকলে পাড়ার কেউই নিয়েছে তো। বিলেত থেকে তো নিসে আসে নি। তাই তুই যে এতগুলো গালমন্দ দিলি, শাপশাপান্ত করলি সে কাকে করলি, পাড়াপড়শিকেই তো?

কালক্রমে সেদিন প্রয়াগের থানার ডিউটি পড়েছিল। সন্ধেবেলা তেতেপুড়ে ফিরে সিলিয়াকে বলল— দে কিছু পয়সা দে, দুটো টান মেরে আসি, দেহে আর কিছু নেই।

সিলিয়া তো ওকে দেখেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে লেগে গেছে। প্রয়াগ গেল ঘাবড়ে।— কী হল, কাঁদ কেন? খারাপ খবরটবর পেলে নাকি? বাপের বাড়ির লোক এসেছিল?

'আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না। বাড়ি চলে যাব।'

'আরে খেলে যা, কী হয়েছে বলবি তো। পাড়ার কেউ কিছু বলেছে? বলে থাকে তো বল্— একবার দিই ঠুকে, ঘানি ঘুরিয়ে আনি।'

সিলিয়া কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল। প্রয়াগের ওপর আজ থানায় খুব একচোট হয়েছে। তেতেপুড়ে ছিল। তার এই-সব শুনে ওর মাথায় খুন চেপে গেল। রুক্মিণী জল আনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ঘড়াটা কাঁখ থেকে নামাবার আগেই প্রয়াগ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মারতে মারতে একেবারে আধমরা করে ছাড়ল। রুক্মিণীও একেবারে পড়ে মার খাবার পাত্রী নয়। সে সমানে মুখ চালালো। আর সেও যত গালাগাল দেয় ও তত তেড়ে এসে মার দেয়। রুক্মিণীর হাঁটু বেয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল, হাতের চুড়িগুলো ভেঙে রক্তারক্তি। শেষকালে রুক্মিণীর যেন আর নড়বার শক্তি রইল না। এক ঠায় বসে বসে গালাগালির অনর্গল স্রোত বইয়ে দিতে লাগল। প্রয়াগ মাঝে মাঝে ছুটে এসে চড় কিল ঘুসি লাথি মেরে যাচ্ছে। রুক্মিণী অনড় হয়ে বসে গাল দিচ্ছে— তুই মর, যমের বাড়ি যা। তোর লাশ চিতেয় উঠুক···

তার কথার ফাঁকে ফাঁকে সিলিয়া ফোড়ন কাটছে— বাব্বা? কী মেয়েমানুষ, কী আস্পদ্দা, কী মুখের তোড়, হে ভগবান, একি মেয়েমানুষ না ডাইনি রে বাবা, মুখের রাখঢাক নেই, লাগাম নেই— ছি—ছি—ছি—। রুক্মিণীর ভ্রূক্ষেপও নেই। সে নিজের ঘোরে বকে চলে— মর্, মর্, তোকে ওলাউঠোয় নিক, তোকে মিরগীতে ধরুক, ভিরমি খেয়ে পড়, ধড়ফড় করে মর···আমি দেখি···এখন আর তার শরীরে রাগদ্বেষ নেই, কেমন যেন উন্মত্ততার ঘোরে বকে চলেছে। ওর ভেতরে শুধু একটা হিংসার আগুন ধকধক করে জ্বলছে।

অন্ধকার হয়ে আসতে রুক্মিণী উঠে দাঁড়াল। তার দু'চোখে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকছে। রাঁধতে রাঁধতে সিলিয়া দেখল রুক্মিণী কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনো কথা বলল না। সদর দোরে বসে প্রয়াগ ছিলিমে টান দিচ্ছিল। রুক্মিণী বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল। সেও কিছু বলল না।

চার

ফসল পাকার মরশুমে দেড়মাস-দুমাস অব্দি প্রয়াগ গ্রামের ক্ষেত পাহারা দেয়। কিসানদের কাছ থেকে দুটো ফসলের ওপর হাল পিছু ওর কিছু ফসল বাঁধা থাকে। মাঘ মাসের গোড়ার দিকেই সে দুটো ক্ষেতের মাঝামাঝি একটু করে ফাঁকা জমির ওপর খানিকটা জায়গা সাফসুতরো করে নিয়ে সেখানে একটা মরাই গোছের চালা তুলে নিয়ে থাকে। চালা বলতে লতাপাতার ছাউনি, রোজ রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া সেরে, কলকে ছিলিম, তামাক, গাঁজা নিয়ে সেই চালায় গিয়ে শোয়। চোত মাসের শেষ পর্যন্ত এই ওর নিয়ম। এখনো সেই সময় চলছে। মাঠে মাঠে পাকা ফসল তৈরি। দু-চার দিনের মধ্যেই কাটা শুরু হয়ে যাবে। প্রয়াগ রাত্তির দশটা অব্দি রুক্মিণীর পথ দেখল। তারপর ভাবল নিশ্চয়ই পড়শিদের কারুর বাড়ি গিয়ে শুয়ে আছে। ও খেয়েদেয়ে লাঠি হাতে নিয়ে সিলিয়াকে বলল দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়। যদি রুক্মিণী আসে তো দোর খুলে দিস, আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু খাওয়াস। তোর জন্যেই আজ অতবড় কাণ্ডটা হল। আজ আমার এত রাগ যে কী করে চড়ল, কে জানে। আমি জীবনে ওর গায়ে হাত তুলি নি। কে জানে কোথায় গেল। আবার ডুবে টুবে না মরে, তা হলে কাল হাতকড়ি পড়বে।

সিলিয়া বলল— সে আসবে কিনা তার ঠিক নেই। আমি একা কী করে থাকব। আমার ভয় করে। আমি আর কোথাও গিয়ে

শুই বরং।

'ঘরে কে থাকবে? তারপর খালি ঘর পেয়ে কেউ যদি থালটা ঘটিটা উঠিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়? তোর ভয়টা কিসের? আরে, রুক্মিণী এক্ষুনি এল বলে।'

সিলিয়া ভেতর থেকে কপাটে খিল দিল। প্রয়াগ ক্ষেতমুখো হল। চরস কসিয়ে হেঁড়ে গলায় ভজন ধরল—

ঠগিনী, ক্যা নৈনা ঝমকাবে।
কদ্দু কাট মৃদঙ্গ বনাবে, নীবু কাট মজীরা।
পাঁচ তরোঙ্গ মঙ্গল গাবে, নাচে বালম খীরা।
রূপা পহির কে রূপ দিখাবে, সোনা পহির রিঝাবে
গলে ডাল তুলসী কী মালা, তীন লোক ভরমাতে॥ ঠগিনী…

ক্ষেতের এ প্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ প্রয়াগ দেখল, ওদিকে সামনের ক্ষেতে যেন আগুন। একবার এক ঝলক যেন জ্বলে উঠল। প্রয়াগ চেঁচিয়ে হাঁক ছাড়ল— এই, কে ওখানে? আরে এই, কে আগুন জ্বালাচ্ছে?

কেউ জবাব দিল না। আগুনের শিখা দাউ দাউ করে ওপর দিকে উঠল।

এবার প্রয়াগের খেয়াল হল ওর চালাতেই আগুন লেগেছে। ওর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ল। সর্বনাশ। মাচানে আগুন লাগাও যা আর তুলোর গাদায় আগুন লাগাও তাই। জোরে হাওয়া দিচ্ছে। মাচানের হাতখানেকের ভেতরেই ক্ষেতভরা পাকা ফসল একেবারে চাদর বিছিয়ে রেখেছে। একটা ফুলকি উড়ে পড়লেই হল একবার, আর দেখতে হবে না। ক্ষেতভরা সোনার ফসল রাতের অন্ধকারেও ঝকমক করছে, এক লহমায় পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সারা গ্রামের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আবার এই ক্ষেতের গায়েই পাশের গ্রামের ফসল ক্ষেত। আগুন একবার লাগলে সব জ্বলে উঠবে। হে ভগবান। আগুন যে বেড়েই চলেছে। আর সময় নষ্ট করা যায় না।

টিকে আর কল্‌কে ওখানেই আছড়ে ফেলে কাঁধের ওপর লোহা-

বাঁধানো লাঠিগাছ ফেলে প্রয়াগ উন্মত্তের মতন মাচানের দিকে দৌড়ল। আলের ওপর দিয়ে ছুটতে অসুবিধে হয়, তাই ও ক্ষেতের মাঝখান দিয়েই ছুটতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে আগুনের শিখা বড়ো হচ্ছে, প্রয়াগের পা আর মাটিতে পড়ছে না। এখন রেসের ঘোড়াও ওর কাছে হেরে যাবে। ও নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত জোরে ছুটতে পারে ও! ওর চোখ তার চালায় আটকে রয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও কিছু নজর পড়ছে না ওর। ওর আর কোনো দিকেই হুঁস নেই। ওর পায়ে পাখনা গজিয়েছে। হাঁফ ধরছে না, পায়ে খিল ধরছে না। দুমিনিটের মধ্যে তিন-চার ফার্লং পথ পেরিয়ে এসেছে ও। চালাটা প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেছে।

চালার আশেপাশে কেউ নেই। কে যে এ কাজ করল, ভাববার সময়ও নেই তখন। খোঁজাখুঁজির তো কথাই ছেড়ে দাও। তবু এক ঝলক রুক্মিণীর নাম মনে এল প্রয়াগের। কিন্তু রাগের সময় নয়। বজ্জাত ছেলের মতন আগুন একবার বাঁদিকে ছুটছে, একবার ডান দিকে। ঠাঠা ক'রে, দাউ দাউ ক'রে, ধকধক ক'রে জ্বলে উঠছে। ক্ষেতের সীমা এই ছুঁলো, এই ছুঁলো বলে। এই মনে হচ্ছে, ধরে ফেলল বুঝি, আর রক্ষে নেই, আবার একটু সরে আসছে, পরক্ষণেই দুনো তেজে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কী করবে এখন প্রয়াগ? কেমন করে নেভাবে? লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নেভাবার জো নেই আর। সেটা প্রচণ্ড আহাম্মকি হবে। তবে কী হবে। যদি ক্ষেতে আগুন ধরে যায়, তা হলে আর গাঁয়ে মুখ দেখাবার জো থাকবে না। আহা রে, সারা গাঁয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে। হাহাকার পড়ে যাবে। আর বেশি ভাবতে পারল না প্রয়াগ। গোঁয়ার গোবিন্দ গেঁয়ো লোকরা বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। লাঠিটা সামলে ধরে এক লাফ দিয়ে আগুন টপকে একেবারে ওর চালার দোরে গিয়ে পড়ল। তারপর জ্বলন্ত মাচানঘরখানাকে লাঠির আগায় বাধিয়ে নিয়ে, সবথেকে চওড়া আলটা ধরে গ্রামের দিকে ফিরে দৌড়ল।

কেউ দেখলে ভাবতে পারত বাতাস কেটে একটা অগ্নিবিমান উড়ে চলেছে। জ্বলন্ত খড়ের টুকরো ওর গায়ে মাথায় পড়ছে, ওর

খেয়াল নেই। একবার মুঠোখানেক আগুন ওর হাতের ওপরেই পড়ল। গোটা হাত পুড়ে গেল। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর পা থামতে ভুলে গেছে, হাত একটুও কাঁপছে না। হাত যদি একটু নড়ে ক্ষেত বাঁচবে না। আর প্রয়াগের কোনো ভয় নেই। কেবল একটুখানি ভাবনা—চালার আগার দিকটা যেখানে লাঠির কুঁদোটা আটকে আছে, ওটা না জ্বলে, ভেঙে পড়ে। তা হলেই মুশকিল। কেননা ছেঁদা হয়ে লাঠিটা গলে গেলে, চালার মাথাটা ওর মাথার ওপর সরাসরি নেবে এলে আর ওর বাঁচার উপায় থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে অনল-সমাধি ঘটে যাবে। প্রয়াগ এটা বুঝেছিল। আর তাই হাওয়ার গতিতে ছুটছিল।

চার ফার্লংয়ের দৌড়। মরণ এখন আগুনের রূপ ধরে মাথার ওপর অগ্নিলীলা করছে—প্রয়াগের মাথার ওপর, আর ক্ষেতের মাথার ওপর। প্রয়াগ জান বাজি রেখে ছুটছে। ওর ছোটার গতিবেগের তীব্রতায় আগুনের মুখ পেছন দিকে ঘুরে গেছে ; তার দাহিকাশক্তির অনেকখানি এখন খরচ হচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে, নইলে এতক্ষণে আগুন মাঝ বরাবর পৌঁছে যাবার কথা। আর তা হলেই হাহাকার। এক ফার্লং পেরিয়ে এল। দেখো প্রয়াগ, পা যেন টলে না। আরো দু'ফার্লং বাকি। আগুন যেন লাঠির মাথায় না পৌঁছোয়, তা হলে আর তোমার রক্ষা নেই। আর মরেও তোমার রক্ষা নেই। অনন্তকাল ধরে তোমার নামে অভিশাপ দিয়ে যাবে মানুষ। লোকের দীর্ঘনিশ্বাসের জ্বালা আরো বড়ো জ্বালা, প্রয়াগ। সাবধান। ব্যস আর একটা মিনিট। আর মোটে দুটো ক্ষেত বাকী। পারবে না! পারতেই হবে। জোর লাগাও। সর্বনাশ। যা ভেবেছিল তাই। লাঠির কুঁদো ওপর দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চালার মুড়ো নেবে আসছে। আর কোনো আশা নেই। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রয়াগ ছুটছে। কিনারার ক্ষেত, কাছাকাছি এসে পড়েছে। এসে পড়ল। আর দুটো সেকেণ্ডের মামলা। সামনে বৈজয়ন্তীর সিংহতোরণ—মাত্র বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। তার ওপারে স্বর্গ—এপারে নরক। কিন্তু এদিক জ্বলন্ত মাচানঘরটা

প্রয়াগের মাথার ওপরে নেমে এসেছে।

এক ঝটকায় এখনো ওটাকে ঘাড়ের ওপর থেকে নিচে ফেলে দেওয়া যায়। তাতে প্রাণ বাঁচে। কিন্তু কার প্রাণ? না, প্রয়াগের প্রাণের ওপর মোহ নেই। তাই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে প্রয়াগ দৌড়োচ্ছে। ওকে আরো কয়েক কদম যেতে হবে। কিন্তু···এইবার, এই প্রথমবার ওর পাটা একটু টলে গেল। নৃশংস আগুন, তবে কি তোমারই জিত হল···?

হঠাৎ কে একজন সামনের গাছতলা থেকে প্রয়াগের দিকে ছুটে এল। মেয়েছেলে। রুক্মিণী। সে তাড়াতাড়ি প্রয়াগের সামনে এসে মাথা নিচু করে জ্বলন্ত খোড়ো চালার নিচে চলে এল। তারপর দু'হাত দিয়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রয়াগ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সমস্ত মুখ ঝলসে গিয়েছিল।

মাথায় চিতা নিয়ে রুক্মিণীকে বেশিক্ষণ থাকতে হয় নি। এক সেকেণ্ডের ভেতর ক্ষেতের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেল। কিন্তু তার মধ্যেই হাত আর মুখ পুরো জ্বলে গিয়ে, ওর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। ওর বুদ্ধি কাজ করছিল না। নইলে এখন ও নিশ্চিন্তে আগুনটা ফেলে দিতে পারত, দিয়ে বাঁচতে পারত। তা না করে ও সেই আগুন সুদ্ধ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপরও কিছুক্ষণ যাবৎ সেই জ্বলন্ত মাচাঘরটা খুব নড়েছিল, খুব ছটফট করেছিল। রুক্মিণী খানিকক্ষণ খুব হাত-পা ছুঁড়েছিল। তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। আগুনটা জ্বলতে জ্বলতে, আস্তে আস্তে নিবতে রইল।

আরো কিছুক্ষণ পরে প্রয়াগের হুঁশ ফিরে এল। তখনো তার সারা দেহ জ্বলছিল। দেখতে পেল, গাছের নিচে খড়ের লাল আগুন দগদগ করছে। দৌড়ে গিয়ে পা দিয়ে আগুন সরিয়ে দিল— তার নিচে রুক্মিণীর আধপোড়া লাশ পড়ে ছিল। প্রয়াগ দুহাতে মুখ চেপে ধরল। ওর আঙুলের ফাঁক বেয়ে আগুন চোঁয়ানো কান্না টপ-টপিয়ে পড়তে লাগল।

সকালবেলায় গ্রামের লোক প্রয়াগকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দিল। এক সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা হল, গ্রামের লোক খুব করেছিল, কিন্তু বাঁচল না।

শরীরে আর কিছু ছিল না। খানিকটা আগুনে শেষ করেছিল, বাকিটা শোকে।

আত্মারাম

বেদী গ্রামের মহাদেব স্যাক্‌রা বিখ্যাত ব্যক্তি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে দোকানের ঝাঁপটি খুলে আগুনের মালসা কোলে বসে বসে ঠুকঠুক করে। নাগাড়ে রোজ ঐ এক আওয়াজ শুনতে শুনতে লোকের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে কোনো কারণে আওয়াজ বন্ধ হলে লোকের মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই। মহাদেব রোজ খুব সকালে একবার করে ভজন গাইতে গাইতে পুকুরপাড়ে বেড়াতে যায়। তার হাতে থাকে তার পোষা তোতাপাখির পিঁজরে। কোনো অচেনা লোক যদি সেই ভোরের ঘোলাটে আলোয় তাকে দেখে, তা হলে তার শীর্ণ শরীর, ফোকলা গাল আর নুয়ে পড়া কোমর দেখলে পিশাচ বলে ভুল করবে। প্রত্যেক দিন—'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা' মন্তর কানে এলেই বোঝা যায় ভোর হয়েছে।

মহাদেবের পারিবারিক জীবন সুখের নয়। তার তিন ছেলে, তাদের তিন বউ, ডজন কয়েক নাতিপুতি হলে হবে কী। তার বোঝা বইবার কেউ নেই। ছেলেরা বলে, 'যতদিন বাবা বেঁচে আছেন, আমরা জীবনটা উপভোগ করে নিই। পরে তো সেই পাথর গলায় বাঁধতেই হবে।' মহাদেব বেচারাকে মাঝেমাঝেই উপোস করে থাকতে হয়। খাবার সময়ে তার বাড়িতে সাম্যবাদের এমন গগন-ভেদী নির্ঘোষ উঠতে থাকে যে, পেটে খিদে নিয়েই তাকে উঠে পড়তে হয়। তার পর থেলো হুঁকোয় তামাক টেনে শুয়ে পড়ে। তার ব্যাবসার জীবন আরো অশান্তির। যদিও সে তার পেশায় সুনিপুণ, যদিও তার ক্ষারক পদার্থ অন্যদের তুলনায় ঢের বেশি পরিমাণ শোধনক্ষম আর তার রাসায়নিক প্রক্রিয়াও অতিরিক্ত দুরূহ, তবু নিন্দুক, সন্দিগ্ধমনা আর ধৈর্যহীন জীবদের মুখ থেকে তাকে অনেক অপবাদ শুনতে হয়। তবে মহাদেব অবিচল গাম্ভীর্য নিয়ে সব কথা শুনে যায়, প্রতিবাদ করে না। গণ্ডগোল মিটে গেলে, মহাদেব তার

তোতা পাখির দিকে তাকিয়ে হেঁকে ওঠে— 'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা।' এই মন্তর আউড়ে আউড়ে তার চিত্ত পূর্ণ শান্তিলাভ করে।

দুই

একদিন ঘটনাক্রমে ছেলেদের কেউ খাঁচার দরজা খুলে ফেলেছে। তোতা উড়ে গেছে। মহাদেব মাথা তুলে খঁাচার দিকে চাইতেই, তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হল। তোতা কোথায় গেল? আবার, বারবার খঁাচার দিকে তাকায়, না তোতা তো নেই। মহাদেব মহা বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, এদিক ওদিক খোঁজে, ঘরের চালে, সব জায়গায় সন্ধান করে করে হয়রান হয়। পৃথিবীতে প্রিয়বস্তু বলতে এক ঐ পাখিটাই। ছেলেপুলে-নাতিপুতি সবাইকেই চিনে নিয়েছে, ঢের হয়েছে। নাতিপুতি শোরগোল করে হামেশা তার কাজে বিঘ্ন ঘটায়। আর ছেলেদের ওপর তার কোনো টান নেই। কেবল তারা নিষ্কম্মা ব'লে নয়, আরো একটা কারণ ছিল।

গুণধর পুত্রদের কল্যাণে তার একমাত্র আনন্দসুধার ভাঁড়ের সংখ্যাও নিয়মিত কম হয়ে যেত। পড়শিদের ওপর মহাদেব বিরক্ত, কারণ তারা প্রায়ই তার মালসা আংরা বের করে নিয়ে যায়। এই সমস্ত কিছু অশান্তি থেকে ত্রাণ পেয়ে শান্তিলাভের একটা জায়গাই তার ছিল— সে ঐ তোতা পাখি। একমাত্র তার জন্যেই ওর কোনো কষ্ট ছিল না। যে বয়সে মানুষের শান্তি ছাড়া আর কোনো ভোগ-বাসনা থাকে না, মহাদেবের এখন সেই বয়স।

তোতাটা চালাঘরের খাপরার ওপর বসেছিল। মহাদেব খাঁচাটা হাতে নিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সুর করে পড়তে লাগল—'আয় আয় সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা।' কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ির ছেলেরা আর পাড়ার ছেলেরা সব একসঙ্গে জমা হয়ে শোরগোল করতে আর হাততালি দিতে শুরু করল। ওদিকে কাকের দল কা-কা করে

মাথার ওপর ঘুরছে। তোতা ভয় পেয়ে আবার উড়ে গেল, আর এবারে গাঁয়ের বাইরে এক গাছের ডালে গিয়ে বসল। মহাদেব খালি খাঁচা হাতে নিয়ে পাখির পেছনে দৌড়ল। তার দৌড়ের বহর দেখে লোকে প্রকৃতই অবাক হল। যদিও এটা মোহমাত্র। তবু মোহের এমন সুন্দর, সজীব, ভাবময় অভিব্যক্তি আর হয় না।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। চাষীরা ক্ষেত থেকে ফিরছিল। রঙ্গরসের এমন একটা সুযোগ তারা অবহেলা করল না। মহাদেবকে রাগিয়ে সবাই মজা পেত। কেউ কাঁকর ছুঁড়তে লাগল, কেউ হাততালি দিতে লাগল। তোতা আবার উড়ল। এবার ওখান থেকে দূরের আমবাগানে একটা গাছের সরু ডালে গিয়ে বসল। মহাদেব খাঁচা হাতে আবার ব্যাঙের মতন লাফাতে লাফাতে চলল। বাগানে যখন পৌঁছল তখন পায়ের তলায় আগুন জ্বলছে, মাথা বনবন করে ঘুরছে। একটু ধাতস্থ হবার পর খাঁচাটা তুলে আবার আওড়াল— 'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা।' তোতা সরু মগডালের আগা থেকে নেমে নিচের দিকের ডালে বসল। বসল বটে কিন্তু শঙ্কিত নেত্রে মহাদেবের দিকে তাকাল। মহাদেব ভাবল, ভয় পেয়েছে। সে খাঁচা রেখে নিজে গিয়ে আর-একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়াল। তোতা ভালো করে চারদিকে দেখল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে গাছ থেকে নেমে এসে খাঁচার ওপর এসে বসল। মহাদেবের হৃদয় উদ্‌বেল হয়ে উঠল। 'সৎ গুরুদত্ত···' মন্ত্র জপ করতে করতে সে ধীরে ধীরে তোতার সামনে এসে যেই উৎসাহ সহকারে লাফ দিয়ে এগিয়েছে, যে তোতাকে ধরবে— অমনি তোতা হাত ফসকে উড়ে গিয়ে আবার গাছের ডালে বসল।

সন্ধে পর্যন্ত এই রকম চলল। তোতা কখনো এ ডালে গিয়ে বসে, কখনো ও ডালে গিয়ে বসে। কখনো যদি-বা খাঁচার ওপরে এসে বসে, খাঁচার দরজায় এসে বসে, তো দানাপানির পাত্রটাত্র দেখে আবার উড়ে যায়। বৃদ্ধকে যদি মূর্তিমান মোহ বলি, তো তোতাকে বলতে হয় মূর্তিময়ী মায়া। মায়া আর মোহের এই লীলা ক্রমে স্থায়ী অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

তিন

রাত হয়ে গেল। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার। ঘন পাতার আড়ালে তোতাটা কোথায় গা ঢাকা দিল কে জানে। মহাদেব জানে রাত্তিরে তোতা কোথাও উড়ে পালাতে পারবে না, বা খাঁচাতেও আসা সম্ভব নয় এখন, তা সত্ত্বেও সে সেখান থেকে নড়বার নাম করল না। আজ সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। নৈশভোজের সময় তো পার হয়ে গেছে, এক ফোঁটা জলও গালে দেয় নি। তা হলে কি হবে। ওর খিদেতেষ্টা কিছুই নেই। তোতা বিহনে তার জীবন অসার, রিক্ত, শুষ্ক। মহাদেব দিনরাত কাজ করত, ক্লান্তি ছিল না, তার কারণ তোতা ছিল তার অন্তরের প্রেরণা। জীবনের বাকি কাজ করত অভ্যেস বশে। সে-সব কাজে তার প্রাণের বিন্দুমাত্র সাড়া ছিল না। একমাত্র তোতাই ছিল ওর চেতনার কেন্দ্র। সেই তোতাই যদি হাত থেকে উড়ে যায়, ওর জীবাত্মাও তবে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

সারাদিনের খিদে তেষ্টা, দৌড়ঝাঁপ— ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে মহাদেবের ঢুলুনি আসে। পরক্ষণেই আবার চমকে উঠে চোখ মেলে চায়। বিপুলবিস্তারী অন্ধকারের বুক চিরে শুধু মাঝে মাঝে তার কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে— 'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা।'

মাঝরাতে হঠাৎ পায়ের সাড়া পেয়ে মহাদেব চমকে জেগে ওঠে। দেখে কাছেই আর-একটা গাছের নীচে অস্পষ্ট আলোয় জনকয়েক লোক বসে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছে। কল্‌কের তামাক পুড়ছে। তামাকের সুগন্ধে মহাদেব চঞ্চল হয়ে ওঠে। উচ্চকণ্ঠে হাঁক পাড়ে— 'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা।' এই বলে পায়ে পায়ে লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যায় তামাক সেবার আশায়। কিন্তু বন্দুকের শব্দ শুনলে যেমন হরিণ দৌড়ে পালায়, ওকে আসতে দেখে লোকগুলো তেমনি উঠে দাঁড়িয়ে সবেগে পালাতে লাগল। কে যে কোন্‌দিকে পালালো বলা মুশকিল। মহাদেব 'দাঁড়াও দাঁড়াও'

বলে চেঁচাতে লাগল। হঠাৎ তার খেয়াল হল— ওরা নিশ্চয় চোর। সে আরো জোরে চেঁচাতে থাকল— 'চোর চোর, ধরো ধরো।' চোরেরা আর পেছু ফিরে তাকাল না।

চোরেরা আলোটালো ফেলেই পালিয়েছিল। তাই আলোয় গাছের নীচে গিয়ে মহাদেব দেখল একটা কলসি মরচে পড়ে কালো হয়ে রয়েছে। মহাদেবের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। কলসিতে হাত দিতেই সোনার মোহর হাতে উঠে এল। একটা মোহর নিয়ে আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। হ্যাঁ, খাঁটি মোহরই বটে। তাড়াতাড়ি করে কলসিটা তুলে নিয়ে মহাদেব বাতিটা নিবিয়ে দিল। তারপর গাছের তলায় গা-ঢাকা দিয়ে বসল। এক রাত্রে সাধু থেকে মহাদেব চোর হয়ে গেল।

তখন ওর ভয় হতে লাগল, চোরেরা যদি ফিরে আসে, ওকে একলা পেয়ে সব মোহর কেড়ে নেয়। সে কতকগুলো মোহর পেট-কোঁচড়ে বাঁধল। তারপর একখণ্ড শুকনো কাঠ তুলে নিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে বেশ কিছু মোহর পুঁতে রাখল। তারপর আবার মাটি দিয়ে গর্তটা ঢেকে দিল।

চার

মহাদেবের মানসনেত্রে কল্পনার একটা পরিপূর্ণ জগতের ছবি ভেসে উঠল। যদিও তখনো ভয় আছে— কোষাগার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তবু অভীপ্সা তার কাজ শুরু করে দিল। মানসপটে গড়ে উঠল এক মর্মর প্রাসাদ, সোনারুপোর বিরাট দোকান চালু হয়ে গেল, পুরনো জ্ঞাতিকুটুমের সঙ্গে আবার কুটুম্বিতে— লোকলৌকিকতা শুরু হল। বিলাসবৈভবের সামগ্রীতে ঘর ভরে গেল। মহাদেব এবার তীর্থযাত্রায় বেরোল, সেখান থেকে ঘুরে এসে বিপুল সমারোহে যজ্ঞ হল, ব্রাহ্মণ-ভোজন হল। এর পরই গড়ে উঠল এক দেবালয় শিবমন্দির—তার লাগোয়া চত্বরে ইঁদারা, তার সঙ্গে

উদ্যান। মহাদেব এখন কেবল প্রতিদিন পুরাণপাঠ আর কথকতা শোনে। তার মর্মরমহলে নিত্য সাধুসজ্জনের সেবা হয়।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, যদি চোরেরা আবার আসে, তবে পালাব কী করে? কলসটা হাতে তুলে একবার ভারটা পরখ করে। তারপর শ-দুই কদম রুদ্ধশ্বাসে দৌড়োয়। বোঝা গেল প্রয়োজনে পায়ে পাখনা গজায় তার। দুর্ভাবনার শান্তি। আবার কল্পনায় বসল মহাদেব। রাত কেটে গেল। ভোরের হাওয়ায় পাখিরা গান গেয়ে উঠল। এমন সময় মহাদেবের কানে এল—

'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা,
রাম কে চরণ মে চিত্ত লাগা।"

এই স্তোত্র মহাদেবের মুখে দিনরাত লেগে থাকে। দিনের মধ্যে কত সহস্রবার সে এই মন্ত্র জপ করে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই স্তোত্র সে অভ্যেসবশে আউড়ে গেলেও এর অন্তর্নিহিত মর্ম কোনোদিন তার হৃদয়কে স্পর্শ করে নি। জড় বাদ্যযন্ত্র থেকে যেমন রাগরাগিণী বেরোয়, তার মুখ থেকেও তেমনি নিরর্থক এই স্তোত্র হরদম বের হয়ে থাকে। কাল পর্যন্ত তার হৃদয়ে তরু মুঞ্জরিত হয় নি; মলয় মারুতে গুঞ্জরিত হয় নি; কিন্তু আজ সেই বৃক্ষে হরিৎশাখা, শাখায় নব কিশলয় মুকুলিত হয়ে উঠেছে। বাতাসে তারই মর্মর গুঞ্জন।

সূর্যোদয়ের মুহূর্ত এসেছে। পূর্বরাগময়ী প্রকৃতি জ্যোতিস্নাতা। এমন সময় তোতাটা উঁচু ডাল থেকে জোড় পায়ে নেবে এল, যেন আকাশ থেকে শুকতারা খসে এল। তোতা পিঁজরেয় বসল। মহাদেব ফুল্ল অন্তরে ছুটে গিয়ে খাঁচা হাতে তুলে নিল। বললে— 'আয় বাবা আত্মারাম। তুই যেমন অনেক কষ্ট দিলি, তেমনি আবার জীবন ভরেও দিলি। এবার আমি তোমায় রুপোর খাঁচায় রাখব, সোনার শেকল গড়িয়ে দেব।' ভগবৎ-করুণার কৃতজ্ঞতায় বিগলিত মহাদেব বারবার অন্তরের ভক্তি উজাড় করে দিতে থাকে। হে ভগবান, তোমার অসীম করুণা; নইলে আমার মতো পাপী কি তোমার দয়া পাবার যোগ্য! বিহ্বল অনুরাগে আজ সব প্রথম মর্ম

উপলব্ধির সঙ্গে স্তোত্র গাথা উচ্চারণ করে মহাদেব— 'সৎ গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা, রামকে চরণমে চিত্ত লাগা।' তারপর একহাতে খাঁচা, অন্য হাতে কলস নিয়ে মহাদেব স্যাকরা ঘরে ফেরে।

পাঁচ

মহাদেব যখন ঘরে ফিরল, তখনো আঁধার কাটে নি। পথে একটা কুকুর ছাড়া আর কারু সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। আর স্যাকরাদের সঙ্গে কুকুরের সম্প্রীতির কথাও বিশেষ শোনা যায় না। মহাদেব কলসিটা একটা ঝোরায় পুরে, ওপর থেকে কয়লা দিয়ে ভালো করে ঢেকে নিজের কুঠুরিতে রেখে দিল। বেলা হতেই সে সোজা পুরোহিতের বাড়ি গেল। পুরুতঠাকুর পুজোয় বসে আপন মনে ভাবছেন— কালই মামলার তারিখ পড়েছে, অথচ হাতে একটা কানাকড়ি নেই, যজমানরাও কেউ ছাওয়া মাড়াচ্ছে না, কী হবে। এমন সময় মহাদেবের পদার্পণ। পণ্ডিতমশায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভাবটা, এই অপয়াটা কোথা থেকে এসে জুটল সাতসকালে। অযাত্রার মুখ দেখলুম, এখন দানা জুটলে হয়। গোঁসা ভরে প্রশ্ন করলেন— কী চাই, কী মনে করে? জান তো সকালবেলাটা আমার পুজোপাটের সময়।

মহাদেব— মহারাজ, আজ আমার এখানে সত্যনারায়ণের কথা।

ঠাকুরমশায়ের বিস্ময়ের পার নেই। নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না যে। তাঁর বাড়ির কেউ ভিখিরিকে ভিক্ষে দিচ্ছে, এটাও বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু মহাদেবের বাড়িতে 'কথা'। অ্যাঁ!— কেন গো, আজ কী?

মহাদেব— না, কিছু না, এমনি ইচ্ছে হল আজ ভগবানের নাম-গান শুনি।

সকাল থেকেই প্রস্তুতিপর্ব শুরু হল। কাছাকাছি পাঁচখানা গ্রামে সুপুরি নিয়ে লোক গেল। কথা হবে, তারপর ভোজেরও

নেমন্তন্ন। লোকে যে শোনে অবাক হয়। ব্যাপার কী? বালিয়াড়িতে দূর্বোঘাস!

সন্ধেবেলায় সমাগত অতিথিদের সামনে উঠে দাঁড়াল মহাদেব। পণ্ডিতজী তখন তাঁর সিংহাসনে বসেছেন। মহাদেব উচ্চকণ্ঠে বললে— ভাইসব, আমার সারাজীবন ছলচাতুরীতে কেটেছে। কত লোককে আমি দাগা দিয়েছি, কত খাঁটি জিনিসকে মেকী করেছি, তা আমার হিসেবের বাইরে। কিন্তু আজ ভগবান আমার ওপর সদয় হয়েছেন তিনি আমার কলঙ্ক ঘুচিয়ে দিতে চান। তাই আমি সমবেত সমস্ত ভাইবন্ধুদের মিনতি করে বলছি— আমার কাছে যার যা-কিছু বাকিবকেয়া পাওনাগণ্ডা আছে, যার গচ্ছিত ধন আমি মেরে দিয়েছি, যার খাঁটি মাল আমি জাল করেছি, যার যা আমি ফাঁকি দিয়েছি— তারা সকলে একে একে আমার কাছে এসে সব হিসেব চুকিয়ে নিন।

যদি কোনো ভাই এখানে উপস্থিত না থাকেন, আপনারা দয়া করে গিয়ে তাকে খবরটা দেবেন, আগামীকাল থেকে নিয়ে এক মাস পর্যন্ত যে-কোনো দিন, যখন খুশি আমার কাছে এসে যেন হিসেব বুঝে নিয়ে যান। আপনারা সবাই আসুন, কড়ায় গণ্ডায় সব হিসেব চুকিয়ে নিন। আপনাদের কথাই যথেষ্ট। কোনো সাক্ষীসাবুদ লাগবে না।

সভা নিস্তব্ধ। ছুঁচ পড়লে শোনা যায়। তারপর কেউ কেউ ফিসফাস গুনগুন শুরু করে দিলে। একজন বললে— আমি বলি নি? আর-একজন বললে— যা যা, কোত্থেকে দিবে, বললেই হল? হাজার হাজার টাকা হবে টোট্যাল করলে, খাবে কি?

এক ঠাকুরসাহেব ঠাট্টা করলেন— আর যাঁরা বৈকুণ্ঠে গেছেন তাদের কী হবে?

মহাদেব জবাব দিলে— তাদের বাড়ির লোক তো আছে।

কিন্তু মনে হল, লোকের আদায় উসুল করার যত না আগ্রহ, তার চেয়ে শতগুণে আগ্রহ রহস্য জানার— মহাদেবের হঠাৎ এত ধন-দৌলত এলটা কোথা থেকে। মহাদেবের কাছে যাবে যে তা

সাহসেই কুলোয় না কারো। দেহাতের সিধে সরল লোক, পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার প্যাঁচ তারা কি অতশত বোঝে! তারপর বেশির ভাগ সবাই প্রায় ভুলে বসে আছে কবে কী বানিয়েছিল, মহাদেবের কাছে— কী পাওনা-থোওনা। তা ছাড়া, আজকের এই পবিত্র সমাবেশে এসে ও-সব কথা ভাবতে গিয়ে ভুলচুক হয়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশি, এই ভয়েও অনেকে মুখ খুলল না। সব চেয়ে বড়ো কথা, মহাদেবের এই অভূতপূর্ব সততা তাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিল।

হঠাৎ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে পুরোহিত মহারাজ বলে উঠলেন— তোমার মনে আছে মহাদেব, সেবার যে কণ্ঠহার গড়াবার জন্যে তোমায় সোনা দিয়েছিলুম, তুমি ওজনেই বেশ কয়েক মাসা সরিয়ে নিলে?

মহাদেব-- হ্যাঁ, মনে আছে। আপনার কত লোকসান গেছে?

পুরুত— তা পঞ্চাশ টাকার কম হবে না।

মহাদেব কোমরের কসি খুলে দুটি মোহর বার করে পুরুতঠাকুরের সামনে রেখে দিল।

এবার সভায় পুজুরির লোভ নিয়ে টীকাটিপ্পনি চলতে থাকল। এ সেরেফ বেইমানি, ধোঁকাবাজি, খুব বেশি হলে দু-চার টাকা লোকসান হয়ে থাকতে পারে। তা ব'লে পঞ্চাশ টাকা, বেচারাকে দুড়িয়ে নিলে গো! বেটার কি দেবতার ভয় নেই। পুজুরি হয়েছে, এদিকে ওই রকম ছোটো নজর। 'ছ্যাঃ ছ্যাঃ'—'হায়-হায়।'

লোকের মনে মহাদেবের ওপর শ্রদ্ধার ভাব জাগল। পুরো ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। কিন্তু হাজার হাজার লোকের একজনও দাবি-দাওয়া নিয়ে দাঁড়াল না। তখন মহাদেব আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে— মনে হচ্ছে আপনারা নিজেদের হিসেব মনে করতে পারছেন না। তাই এ কথা আজ এই পর্যন্তই থাক্। এখন 'কথা' হোক। আমি এক মাস পর্যন্ত আপনাদের প্রতীক্ষায় থাকব। তারপর তীর্থযাত্রায় বেরোব। তাই ভাইসব, আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা— আমাকে উদ্ধার করুন।...

মহাদেব স্যাকরা এক মাস পর্যন্ত পাওনাদারদের প্রতীক্ষায় রইল। রাত্রে চোরের ভয় ঘুমোতে পারত না। এখন আর কাজকর্ম কিছু করে না। এদিকে মদের নেশাও ঘুচে গেছে। অতিথি-অভ্যাগত, সাধু-সন্ন্যাসী কেউ দরজায় এসে পড়লে তাঁর যথাবিহিত সৎকার করে। বহু দূরদূরান্তে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি করে এক মাস গেল। এক পয়সার হিসেব নিতেও কেউ এল না। আজ মহাদেবের ধারণা হল— পৃথিবীতে আজও ধর্ম, মনুষ্যত্ব, সদাচার কী বিপুল পরিমাণে রয়েছে। ওর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। বুঝল— এ দুনিয়ার ভালো মন্দ দুইই আছে। যে যেমন হবে— তার তেমন জুটবে।

ছয়

এই ঘটনার পর পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। এখন কেউ বেদো গ্রামে গেলে দূর থেকেই একটা সোনার কলস দেখতে পাবেন, ওটা হল ঠাকুরদ্বারের কলস। আর পাশেই দেখবেন একটা শান-বাঁধানো দীঘি, তাতে প্রচুর পদ্ম ফুটে রয়েছে। ওই দীঘিতে অনেক মাছ, কিন্তু কেউ ধরে না। দীঘির পাড়ে এক বিরাট সমাধিভূমি, লোকে বলে আত্মারামের স্মৃতিসৌধ। এ সমাধি নিয়ে নানান কিম্বদন্তী আছে। কেউ বলে ঐ রত্নখচিত পিঞ্জর স্বর্গে চলে গেছে। কেউ বলে ওখানে 'সত্ত গুরুদত্ত' ইত্যাদি দৈববাণী হ'ত, তবে আসলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন— পক্ষীরূপী সেই চন্দ্রকে মার্জাররূপী এক রাহুতে গ্রাস করেছিল। লোকে বলে, এখনো নাকি মাঝরাতে দীঘির পাড়ে শব্দ শোনা যায়— সত্য গুরুদত্ত শিবদত্ত দাতা, রামকে চরণমে চিত্ত লাগা।'

মহাদেব সোনারের ব্যাপারেও বহু জনশ্রুতি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মতটি হল এই যে আত্মারাম সমাধিস্থ হবার পরে পরেই মহাদেব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হিমালয়ে চলে যায়, আর ফেরে নি। ওই অঞ্চলে সে আত্মারাম নামেই বিখ্যাত হয়েছিল।

ঈদগাহ

রমজানের পুরো তিরিশটি দিন কাবার করে ঈদ এল। আজকের সকালটা ভারি রমণীয়, ভারি লোভনীয়। গাছগুলোর সবুজে বৈচিত্র্য, ক্ষেতের হরিৎশ্যামশোভায় কিছু অজানা নতুনত্ব, এমন-কি, আকাশের নীলেও আজ যেন এক অভিনব লালিমার আভাস। আজ সকালের সূর্য অন্যদিনের চেয়ে প্রিয়তর, যেন স্নিগ্ধ দৃষ্টির প্রসাদ ঢেলে পৃথিবীর মানুষকে ঈদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। গ্রামে আজ উৎসবের কোলাহল। সবাই ঈদগায় যাবে, তৈরি হচ্ছে। কারো জামায় বোতাম নেই, পাশের বাড়িতে ছুঁচসুতো আনতে দৌড়চ্ছে। কারো জুতো কড়া হয়ে পড়ে আছে তাতে তেল দিতে হবে, তাই তেলীর বাড়ি ছুটেছে। নে রে ভাই, জলদি জলদি বলদ-গুলোকে জাবটাব মেখে দে। ঈদগা থেকে ফিরে আসতে আসতে বেলা দুপুর হয়ে যাবে। তিন কোশ পথ হাঁটা, তারপর শয়ে শয়ে লোক আসবে, তাদের সঙ্গে দেখাশুনো গল্পগাছা, দুপুরের আগে কখনো ফেরা যায়। সবচেয়ে আনন্দ ছেলেদের। কেউ একটা রোজা রেখেছে, তাও দুপুর পর্যন্ত, কেউ তাও রাখে নি। তাতে কী হল। ঈদগা যাবার খুশির বড়ো বখরা তাদের। রোজা বড়োদের ব্যাপার, ওদের জন্যে ঈদ। এতদিন রোজ ঈদের নাম জপ করত, কবে আসবে কবে আসবে, সেই ঈদ এসে গেছে। এখন সেই ঈদগা যেতে দেরি হচ্ছে বলে আর তর সইছে না। বড়োরা যেন কী। তা ঘর সংসারের চিন্তায় তাদের কী প্রয়োজন। ঘরে দুধ চিনি থাক্ আর না-থাক্ বয়েই গেল, তাদের 'সেওয়াইয়া'* খাবার কথা, খাবে। আব্বাজান যে কেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চৌধুরী কায়েম আলির বাড়ি দৌড়চ্ছে, সে খবরে তাদের কী দরকার। আজ চৌধুরী বিমুখ হলে যে খুশির ঈদ কান্নার মহরমে দাঁড়াবে, তা তাদের জানবার কথা নয়।

* 'সেমাই' বা চষির পায়েস।

কারণ তাদের পকেটে এখন কুবেরের ঐশ্বর্য ভরা রয়েছে। তারা বারবার তাই বার করে দেখছে, গুনছে, আবার খুশি হয়ে পকেটে রাখছে। মামুদ গুনছে এক, দুই···দশ···বারো। তার পকেটে বারো পয়সা। মহসীনের কাছে এক, দুই, তিন···আট···দশ···পনেরো পয়সা। এই অসংখ্য পয়সা দিয়ে তারা অজস্র সব পণ্য কিনে বাড়ি ফিরবে— খেলনা, মিষ্টি, বিউগেল, বল আরো কত কী।

সকলের চেয়ে বেশি খুশি হামিদ। বছর চার-পাঁচ বয়স, রোগা-পাতলা গড়ন। বাপ গেল বছর কলেরায় গেছে, আর মাও তার পর থেকে কেন কে জানে কেবল হলদে হতে লাগল, হতে হতে সেও একদিন মরে গেল। রোগ যে কী কেউ ধরতেও পারলে না। কাউকে কোনো দিন রোগের কথা বলে নি। বললেই বা কে শুনছে। নিজের মনের জ্বালা মনেই চেপে রেখে রেখে একদিন দুনিয়া থেকে বিদেয় নিয়ে গেল। এখন হামিদ তার বুড়ো ঠাকুমার কোলেই ঘুমোয়, তার খুশির কামাই নেই। সে জানে তার আব্বাজান টাকা কামাতে গেছে। অনেক টাকা থলেতে পুরে একদিন ফিরে আসবে। আর আম্মা আল্লার বাড়ি থেকে ওর জন্যে ভালো ভালো জিনিস আনতে গেছে। তাই হামিদের খুশির অন্ত নেই। আশা এমনিতেই বড়ো ভালো জিনিস, তায় বাচ্চাদের আশা। তারা কল্পনায় হামেশাই আকাশে প্রাসাদ বানায়। হামিদের পায়ে জুতো নেই, মাথায় একটা পুরনো টুপি তার পটিতে কালো দাগ ধরে গেছে, তাতে হামিদের খুশি কম হয় নি। যখন তার বাবা আর মা দুজনে ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরে আসবে, তখন তার মনের সব কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। তখন ও দেখে নেবে, মহসীন নুরে আর মাহমুদ কোথায় অত পয়সা পায়।

অভাগিনী আমিনা কুঁড়েঘরে বসে কাঁদছে। ঈদের দিন, অথচ ঘরে এক দানা খাবার জিনিস নেই। আজ যদি তার আবিদ থাকত তা হলে কি এমন দুঃখীর মতন ঈদ আসে, ঈদ চলে যায়! কে বলেছিল ঈদকে আসতে? এ বাড়িতে আসতে হবে না। কিন্তু হামিদ! কারো মরাবাঁচায় তার কী আসে যায়। তার অন্তরে আলো, বাইরে

আশা। দুঃখদুর্দশা আসুক-না দল বেঁধে, হামিদের ভুবনমোহন হাসি তাদের টিঁকতে দেবে না।

ঘরের ভেতর গিয়ে হামিদ তার ঠাকুমাকে বলে— তোমার ভাবনা নেই আম্মা। আমি সব্বার আগে চলে আসব। একদম ভয় পেয়ো না।

আমিনার বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে। গাঁয়ের সব ছেলে বাপের হাত ধরে যাচ্ছে। হামিদের মা-বাপ বলতে সব ওই বুড়ী দাদী। দুধের ছেলেকে একলা কী বলে মেলায় যেতে দেয়। যদি ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে যায়। তিন ক্রোশ পথ হাঁটতে পারবে, অতটুকু বাচ্চা! থাক্, গিয়ে কাজ নেই। একটা জুতো নেই, পায়ে ফোস্কা পড়বে না! নাকি কোলে করে নিয়ে যাবে নিজেই। কিন্তু ও গেলে এখানে সেওয়াই রাঁধবে কে। পয়সা থাকলে মেলা থেকে ফেরার সময় জিনিসপত্র কিনে এনে বাড়িতে এসে চটপট রাঁধতে বসে যেত। যেখানে ভিক্ষেই ভরসা, সেখানে এখন জোগাড় করতেই কঘণ্টা লাগে দেখ। সেদিন কহীমনের কাপড় সেলাই করে আট-গণ্ডা পয়সা মজুরি পেয়েছিল। সেই আধুলিটাই ব্যাঙের আধুলির মতন ঈদের জন্যে জমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কাল গয়লানি বেটি যেন মাথা খেতে লাগল, কী করবে। আর কিছু না, ছেলেটার জন্যে দু'পয়সা করে দুধ কেনে, সেটা তো আর বন্ধ করতে পারে না। আনা দুই পয়সা মোটে বেঁচেছে। তা থেকে হামিদকে মেলার জন্যে তিনটে পয়সা দিয়ে আমিনার হাতে আছে মোট পাঁচ পয়সা। এই তো সম্বল, এদিকে ঈদের উৎসব। আমিনা আর কী করবে, যিনি মালিক তিনিই যা করবার করবেন। তার পর পাড়ার সবাই আছে। ধোপানি, নাপতেনি, মেথরানি সবাই আসবে সলামত বাজাবে। তাদের হাতে একটু সেওয়াই তুলে দিতে হবে। আবার অল্পে কেউ সন্তুষ্ট নয়। তা কাকে বাদ দিয়ে কাকে তুষ্ট করবে, বলো। আর বাদ দেবেই বা কেন। আহা, বচ্ছরকার দিন। আহা, আমার হামিদকে খোদা ভালো রাখুন, বেঁচেবর্তে থাক্, পাড়ার কেউ কি আমার পর গো। আর দুঃখের দিনও কি চিরকাল থাকবে।

কেটে যাবে। এ দিনও কেটে যাবে বৈকি।

গ্রাম থেকে মেলার শোভাযাত্রা বেরোল। সব ছেলেদের সঙ্গে হামিদও চলেছে। একবার সবাই মিলে দৌড়ে এগিয়ে যায় তো আবার গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গের বড়োরা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। এরা যে কেন এমন আস্তে হাঁটে, কে বলবে। হামিদের পায়ে যেন পাখির পালক লাগানো। ওর আবার হাঁটতে কষ্ট হবে! শহরতলিতে এসে পড়েছে ওরা। রাস্তার দুধারে বড়োলোকদের বাগান। পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গাছে গাছে আম আর লিচু ধরে আছে। মাঝে মাঝে ছেলেরা কেউ হয়তো একটুকরো পাথর ছুঁড়ে আমগাছে নিশানা লাগাচ্ছে। অমনি মালি দেখতে পেয়ে ভেতর থেকেই গাল দিতে দিতে বেরিয়ে আসছে। ছেলেরা ছুটে পালায়। দূরে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসে। মালিকে খুব বোকা বানিয়েছে।

এবার শহরের আঙিনায় এসে পড়েছে। বড়ো বড়ো ইমারত দেখা যাচ্ছে। এই আদালত, এটা কলেজ, আর এটা হল ক্লাবঘর। তা এত বড়ো কলেজ, এতে কত ছেলে পড়ে। সবাই কিন্তু ছেলেমানুষ নয়, বুঝলে। বড়ো বড়ো লোক, হ্যাঁ মশায়। তাদের বড়ো বড়ো গোঁফ! এত বড়ো হয়ে গেছে, এখনো পড়তে যায়। কে জানে বাবা, আর কত পড়বে, এত পড়েই বা কি করবে। হামিদের মাদ্রাসায় জনাতিনেক বড়ো বড়ো ছেলে আছে, ছেলে তো নয় পিলে। রোজ পিটুনি খায়, পড়ার নামে গায়ে জ্বর। তা এখানেও ঐরকম সব বুড়োধারিরা পড়তে আসে, আর কী। ক্লাবঘরে জাদুর খেলা হয়। শুনেছি নাকি মড়ার খুলি দৌড়োয়। আরো অনেকরকম রঙ তামাসা হয়, কিন্তু কাউকে ভেতরে যেতে দেয় না।

আর এই যে এখানে দেখছ না, এখানে রোজ সন্ধেবেলা সাহেবরা খেলতে আসে। সত্যি, বড়ো বড়ো মানুষ সব, এ্যাই বড়ো বড়ো গোঁফ দাড়িঅলা লোক। আবার মেমরাও খেলে, জানো? আমাদের আম্মাকে একবার দিয়ে দেখ-না, ঐ যে কী বলে যেন— হ্যাঁ 'বেট্' দাও না, ধরতেই পারবে না। একবার ঘোরাতে গেলেই উলটে পড়বে।

মাহমুদ বলে— আমার আম্মার তো হাত কাঁপবে ঠকঠক করে, মাইরি। মহসীন বলে— যা যা, মণ মণ আটা পিষছে হাত কাঁপে না, একবার ব্যাট ধরতে হাত কাঁপবে? বললেই হল, ভারি তো ব্যাট! কত কলসি করে জল তোলে রোজ, পাঁচ কলসি তো তোর মোষেই খায়। তবে? বল তো তোর মেমকে এক ঘড়া জল আনতে, চোখে অন্ধকার দেখবে'খন।

মাহমুদ বললে— তা যাই বল, মা দৌড়তে তো পারে না, লাফ-ঝাঁপ করতে তো আর পারবে না।

মহসীন— তা পারে না বটে। তবে সেদিন আমাদের গোরুটা দড়ি খুলে চৌধুরীদের ক্ষেতে গিয়ে পড়তে আম্মা এমন একখানা ছুট লাগাল না, যে কী বলব— আমিই ধরতে পারি না।

ওরা এগিয়ে চলে। এবার মিষ্টির দোকান শুরু হল। আজ খুব সাজসজ্জা। আচ্ছা, এত মেঠাই খায় কে। দেখ-না, এক-একটা দোকানে মণ মণ মিষ্টি। বলে রাত্তিরে নাকি জিনেরা আসে মেঠাই কিনতে! আব্বা সেদিন বলছিল, আদ্ধেক রাত্তিরে একজন লোক সমস্ত দোকানে দোকানে গিয়ে যত মাল বেঁচেছে সব ওজন করিয়ে কিনে নেয় আর সত্যিকার টাকা দেয়, ঠিক এইরকম টাকা।

হামিদের এ কথা বিশ্বাস হয় না। এইরকম টাকা জিন পাবে কোত্থেকে? মহসীন বলে— দুর, জিনেদের টাকার অভাব কী। যে-কোনো টাকার আড়তে চলে গেলেই হল। ওদের কি কেউ আটকাতে পারে নাকি। লোহার দরজাও ওদের রুখতে পারে না মশায়, হুঁ হুঁ, ভেবেছ কী। হীরে মুক্তো সব সময় ওদের কাছে থাকে। যাকে ভালো লেগে গেল, তাকে ধামা ধামা মণিমাণিক্য বিলিয়ে দেবে। ওরা এই এখানে বসে আছে, আবার পাঁচমিনিটেই কলকাতা পৌঁছে যাবে।

হামিদের মনে এবার প্রশ্ন— জিনরা কি খুব বড়ো হয়?

মহসীন— আই বাপ! মাটিতে দাঁড়ালে মাথা আসমানে ঠেকে যায়। কিন্তু আবার ইচ্ছে করলে লোটার মধ্যেও ঢুকে যেতে পারে।

হামিদ— আচ্ছা কী করে লোকে জিনকে খুশি করে? আমায় কেউ সে মন্তর শিখিয়ে দিলে আমি একদিনেই খুশি করে ফেলি।

মহসীন বললে— তা আমি জানি না, তবে আমাদের চৌধুরী সাহেবের হাতে অনেক জিন আছে, জানি। কারুর কিছু চুরি গেলে চৌধুরী সাহেব ঠিক বার করে দেবেন, চোরের নামও বলে দেবেন। সেদিন জুমরাতীর বাছুর হারিয়েছিল। তিন দিন ধরে খুঁজে খুঁজে হয়রান, কোথাও পায় না, শেষকালে নাজেহাল হয়ে চৌধুরী সাহেবের কাছে যেতেই উনি বলে দিলেন— খোয়াড়ে গিয়ে খোঁজ কর। ঠিক সেখানেই পাওয়া গেল। জিনেরা এসে ওঁকে দুনিয়ার সব খবর বলে দিয়ে যায়।

এবার হামিদ বুঝল। তাই চৌধুরী সাহেবের অত টাকাকড়ি। তাই লোকে ওঁকে অত খাতির করে।

ওরা এগিয়ে যায়। এই হল পুলিশ লাইন। এখানেই কানিস্‌-টেবিলরা কয়েদ করে। রাইটান্‌। কায় কো। সারারাত বেচারারা পাহারা দেয়, ঘুমোয় না। না হলে চুরি হবে। মহসীন এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে— ওঃ কানিস্‌টেবিলরা পাহারা দেয় না হাতি করে। তবে তো তুমি খুব জান। আরে ওরাই তো চুরি করায়, জানো হুজুর। শহরে যত চোর-ডাকাত আছে সব ওদের জানাশোনা। রাত্তিরে ওরা চোরেদের বলে দেয় চুরি করতে। তারপর অন্য পাড়ায় গিয়ে, 'জাগতে রহো, জাগতে রহো' বলে হাঁকাহাঁকি করে। আরে, তাই তো ওদের অত টাকা। আমার মামা একটা থানাতে কানিস্‌টেবিল। কুড়ি টাকা মাইনে পায় মাসে, আর বাড়িতে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠায়। আল্লার কসম। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম— মামা, এত টাকা তুমি কোথায় পাও। তা হেসে বলে— আল্লা দেন, বাবা। তারপর নিজের মনেই বলে— আমরা ইচ্ছে করলে দিনে লাখ লাখ টাকা মারতে পারি। কিন্তু নিই না, কী হবে বদনাম হয়ে যাবে, চাকরি চলে যাবে।

'এরা চুরি করায় আর কেউ এদের ধরে না?' হামিদ সপ্রশ্ন হল।

হামিদের মূর্খতা দেখে মহসীনের অনুকম্পা হল। বললে—

আরে পাগল, ওদের কে ধরবে। ওরা নিজেরাই তো চোর ধরবার লোক। তবে আল্লা ওদের সাজাও দেন খুব। পাপের ধন পাপেই যায়। এই তো কদিন আগেই মামার বাড়িতে আগুন লেগেছিল। সর্বস্ব পুড়ে গেছে। একটা বাসন অব্দি বাঁচে নি। কদিন গাছতলায় শুয়েছে, মাইরি, আল্লার দিব্যি, গাছতলায়। তারপর কোথা থেকে কে জানে একশো টাকা ধার করে আনে, তবে বাসনকোসন কেনে।

হামিদ— একশো তো পঞ্চাশেরও বেশি। না?

"কোথায় একশো আর কোথায় পঞ্চাশ। পঞ্চাশ টাকা তো একটা থলিতেই ধরে যায়। একশো টাকা ত্নটো থলেতেও আঁটবে না।"

আস্তে আস্তে লোকালয় ঘন হচ্ছে। ঈদগা যাত্রীদের আরো দল চোখে পড়ছে। রঙবেরঙের পোশাক পরনে। কেউ একায়, কেউ টাঙায়, কেউ বা মোটর গাড়িতে চলেছে। গায়ে আতরের খোশবু, মনে খুশির জোয়ার। পল্লীবাসীদের এই ছোট্ট যাত্রীদল, তাদের দৈন্য-ত্নর্দশার কথা ভুলে গেছে, দিব্যি শান্ত প্রসন্ন চিত্তে ধর্মস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে। ছেলেপুলের দলের তো কথাই নেই। শহরের যা দেখে তাই চমৎকার। একটা কিছু দেখেছে তো দেখছেই, তাকিয়েই আছে, পেছন থেকে মোটরে ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে, তবু হুঁস নেই। হামিদ তো আর-একটু হলে গাড়ি চাপা পড়েছিল।

দূর থেকেই ওরা ঈদগা দেখতে পেল। মাথার ওপর তেঁতুলের ঘন সবুজ ছায়া। নিচে পাকা শানের ওপর জাজিম বিছোনো। রোজার ব্রতধারীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাতারে কাতারে লোক, লোকে লোকারণ্য। বাঁধানো রকের ওপর সবাইকে ধরে নি, লোকে নিচেও দাঁড়িয়েছে। সেখানে আর জাজিম নেই। যারা পরে এসেছে তারা পেছনের সারিতে দাঁড়াচ্ছে। সামনে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। এখানে কেউ বিত্তের বিচার করে না, ক্ষমতার বিচার করে না। ইসলামের চোখে সবাই সমান। গাঁয়ের যাত্রীরাও সবাই উজু করে গিয়ে পিছনের সারিতে দাঁড়াল। কী সুন্দর,

শোভন পরিচালন-ব্যবস্থা। কয়েক লক্ষ মাথা একই সঙ্গে সিজদায়* আভূমি প্রণত হচ্ছে, আবার সবাই একসাথে খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার সকলে কোমর ভেঙে দাঁড়াল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসল। নামাজের এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েকবার চলল, যেন একটিমাত্র বোতামে লক্ষলক্ষ বিজলীবাতি একসঙ্গে জ্বলছে, একসঙ্গে নিবছে, জ্বলছে আবার নিবছে। ক্রমান্বয়ে এই চলেছে। এ এক অপরূপ দৃশ্য। এই ছন্দোবদ্ধ সমবেত প্রণতির মধ্যে এমন এক সীমাহীন বিস্তারের ইঙ্গিত রয়েছে, যা প্রতিটি হৃদয়কে ভক্তিতে, মহিমায়, ভূমার পরম ঐশ্বর্যের সম্ভারে ভরপুর করে তোলে। মনে হয় নিখিল ভ্রাতৃত্ববোধের একটিমাত্র অচ্ছেদ্যসূত্রে সমস্ত মানুষের আত্মা গ্রথিত হয়ে রয়েছে।

দুই

নমাজ শেষ হল। এখন মিলন-মেলা। একে অপরকে আলিঙ্গন করছে। মেঠাই আর খেলনার দোকানে দোকানে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। পল্লীবাসীর দল এ ব্যাপারে বাচ্চাদের থেকে কিছু কম উৎসাহী নয়। এই দেখ দেখ, এই হল নাগরদোলা। এক পয়সা দিয়ে চড়তে হয়। এই মনে হবে তুমি আকাশে চড়েছ, আবার তক্ষুনি দেখবে মাটিতে আছড়ে পড়ছ। এখানে চরখি, ওখানে কাঠের হাতি, ঘোড়া, উট সবাইকে শিক দিয়ে গেঁথে রেখেছে। এক পয়সা দাও আর বসে পড়ো। এক পয়সায় পঁচিশ চক্করের মজা। মাহমুদ, মহসীন, নূর— সবাই একবার করে ঘোড়ায় চড়ল, উটে চড়ল। হামিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। তিন পয়সা তো সম্বল। তা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে ঘুরপাক খেতে ও মোটেই রাজি নয়।

*সিজদা— নামাজের একটি অঙ্গ।

চরখি থেকে নেবে এল সবাই। এবার খেলনা কেনার পালা। এদিকে সার বাঁধা খেলনার দোকান। রকমারী খেলনা। সেপাই আর ফেরিঅলা। রাজা আর উকিল। ভিস্তি আর ধোপানী আর সাধু। বাঃ বাঃ কী চমৎকার! মোহিত না হয়ে পারা যায় না। মাহমুদ একটা সেপাই কিনল। খাঁকি উর্দি, লাল পাগড়ি, কাঁধে বন্দুক। দেখে মনে হচ্ছে বুঝি এক্ষুনি কাকে কয়েদ করে নিয়ে এল। মহসীনের ভিস্তি পছন্দ হল। মশক কাঁধে কোমর ভেঙে চলছে, এক হাতে মশকের মুখটা চেপে ধরা। খুশিখুশি ভাব। যেন গান গাইছে। দিল বুঝি মশকের জল ঢেলে। নূর উকিলের প্রেমে মোহিত। উকিলের মুখে মনীষার ছাপ। কালো চোগা, সাদা আচকান, আচকানের পকেটে ঘড়ি, সোনার চেন, হাতে আইনের মোটা বই। মনে হচ্ছে এইমাত্র উকিল সায়েব আদালত থেকে জেরা সেরে বেরোলেন। এ-সব খেলনার দাম দু'পয়সা করে। হামিদের হাতে তিনটে তো মোটে পয়সা। এত দামী খেলনা কিনবে কী করে। তারপর এ-সব মাটির খেলনা হাত থেকে পড়লেই চুরমার হয়ে যাবে। একটু জল পড়লেই রঙ গলে যাবে। এ খেলনা নিয়ে কী হবে, কোনো কাজের নয়।

মহসীন বলে— আমার ভিস্তি রোজ সকাল সন্ধে জল দিয়ে যাবে।

মাহমুদ— আমার সেপাই ঘরবাড়ি পাহারা দেবে। চোর এলে তক্ষুনি বন্দুক নিয়ে ফায়ার করে দেবে।

নূর— আমার উকিল খুব মামলা লড়বে।

সম্মী— আমার ধোপানী রোজ কাপড় কেচে দেবে।

হামিদ খেলনার নিন্দেয় পঞ্চমুখ হল।— ভারি তো মাটির খেলনা। পড়ে গেলেই গুঁড়িয়ে যাবে। মুখে নিন্দে করছে, কিন্তু লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছে। মনে মনে ইচ্ছেটা একবার হাতে নিয়ে দেখে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়েও দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেরা অত অনাসক্ত হতে জানে না। নতুন খেলনা কেউ হাতছাড়া করে না। হামিদের লালসা অপূর্ণ থেকে যায়।

খেলনার পর মিষ্টি। কেউ রেউড়ি কেনে, কেউ গুলাবজামুন কেনে, কেউ সোহন হালুয়া। খুব মজা করে খাচ্ছে। হামিদ সমাজ থেকে ভেন্ন। বেচারা তিন পয়সার খদ্দের। এদিক-ওদিক লোভী চোখে তাকায়। একবার ভাবে কিছু কিনে খাবে। কিন্তু ভেড়ে না।

মহসীন ওকে ডাকে— এই হামিদ, রেউড়ি খাবি ? নে না, খেয়ে দেখ্ কী সুন্দর গন্ধ।

হামিদের একবার সন্দেহ হল, মহসীন কি এত উদার হবে। হয়তো সত্যি দেবে না, লোভ দেখাচ্ছে মিছিমিছি। তবু জেনেশুনেও এগোয়। মহসীন দোনা থেকে একটা রেউড়ির দানা নিয়ে হামিদের দিকে বাড়িয়ে ধরে। হামিদ যেই হাত বাড়াল, অমনি মহসীন হাতটা মুখে পুরে দিল। মাহমুদ, নূর, সম্মী সবাইয়ের কী মজা। হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। হামিদ মর্মান্তিক চটে গেল।

মহসীন— আচ্ছা এবার ঠিক দেব, আল্লার কিরে, এই নিয়ে যা।

হামিদ— যা যা, চাই না। আমার পয়সা নেই নাকি।

সম্মী— তিনটে তো মোটে পয়সা। তাতে কী কী খাবি।

মাহমুদ— হামিদ, তুই আমার থেকে গুলাবজামুন নিয়ে যা।

মহসীনটা ভারী পাজি ! ঠকায়।

হামিদ— মিষ্টি এমন-কিছু ভালো জিনিস নয়। বইতে লেখে মিষ্টি খেলে খারাপ হয়।

মহসীন— হ্যাঁ, এদিকে মনে মনে বলছিস পেলেই খাই। পয়সা বার কর না।

মাহমুদ— আমি বুঝেছি ওর চালাকি। যখন আমাদের পয়সা শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে।

মিষ্টির দোকানের পরেই লোহার জিনিসের দোকান। আর কিছু গিলটি করা নকল সোনার গয়না। ওখানে ছেলেদের কোনো আকর্ষণ নেই। তারা এগিয়ে গেল। হামিদ একটা লোহার দোকানে দাঁড়িয়ে পড়ে। এক জায়গায় কটা চিমটে রাখা রয়েছে। হামিদের খেয়াল হল, দাদীর একটাও চিমটে নেই। রুটি সেঁকতে

গিয়ে দাদীর হাত পুড়ে যায়। একটা চিমটে নিয়ে গিয়ে দাদীকে দিলে দাদী খুব খুশি হবে। আর কোনোদিন দাদীর আঙুল পুড়বে না। আর ঘরেও একটা কাজের জিনিস হল। খেলনা কিনে কী হবে। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট। কিছুক্ষণ ভালো লাগে। তারপর কেউ আর ফিরেও তাকায় না। বাড়ি যেতে যেতেই দেখ আস্ত থাকে কি না, ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাবে'খন। আর চিমটে কত কাজের জিনিস। রুটি চাটু থেকে নামাও আর উনুনে সেঁকে নাও। আবার কেউ আগুন চাইতে এল তো উনুন থেকে আংরা তুলে দিয়ে দাও। ঠাকুমা বেচারীর তো সময় নেই যে বাজার থেকে চিমটে কিনে নিয়ে যাবে আর অত পয়সাই বা কই। তাই রোজই হাত পুড়িয়ে ফেলে।

হামিদের সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে। দোকানে দাঁড়িয়ে সবাই সরবত খাচ্ছে। ছেলেগুলো ভারি লুভো। এতগুলো মিষ্টি কিনল, তা সবাই একা একা গব গব করে খেল, আমাকে কেউ একটাও দিল না। আবার বলে চল্ একসাথে খেলা করি। এটা করে দে, ওটা করে দে। এবার বলে দেখুক-না, কেমন করে দিই। খা মিষ্টি খুব, মুখে ঘা হবে'খন, গায়ে ফুসকুড়ি বেরোবে, ফোঁড়া হবে, তখন বুঝবি। আর খেয়ে খেয়ে লোভ বেড়ে যাবে তখন পয়সা কোথায় পাবে। বাড়ি থেকে পয়সা চুরি করে মার খেয়ে মরবে। বইতে কি কখনো মিথ্যে কথা লেখে? আমি তো আর মেঠাই খাই নি, আমার জিভ খারাপ হবে না। ঠাকুমা চিমটে দেখে দৌড়ে এসে আমার হাত থেকে নিয়ে বলবে— দেখ দিকি, আমার বাপি সোনা আমার জন্যে চিমটে কিনে এনেছে। কত ভালোবাসবে। খোদার কাছে দোয়া মানাবে। তারপর পাড়ার মেয়েদের দেখাবে। তখন সারা গাঁয়ের লোক বলাবলি করবে, হামিদ কী ভালো ছেলে দেখ, ঠাকুমার জন্যে মনে করে মেলা থেকে চিমটে কিনে এনেছে। আর ওদের খেলনা দেখে কে আদর করবে, বয়ে গেছে। বড়োদের আশীর্বাদ সোজা আল্লার দরবারে পৌঁছে যায়। আল্লা খুব শোনেন। আমার কাছে পয়সা নেই। তাই মাহমুদ আর মহসীন আমাকে মেজাজ

দেখাল। আমিও ওদের মেজাজ দেখাব। খাও না, খাও মেঠাই কত খাবে, খেল গে তোমাদের খেলনা নিয়ে। আমার ও-সব চাই না। আমার অত শখ নেই যে দেমাক দেখাবে তার খেলনা নিয়ে খেলব। আচ্ছা যা, আমি গরিব আছি, আছি ; তোদের কাছে কিছু চাইতে গেছি? আমারও আব্বা আর আম্মা ফিরে আসুক। তখন দেখাব তোদের, কত খেলনা কিনতে পারিস, তখন দেখা যাবে। আমি তোদের ঝুড়িঝুড়ি দেব এক-একজনকে। দেখিয়ে দেব, দেখ বন্ধুদের সঙ্গে কী করে মিশতে হয়। হুঁঃ ভারি তো এক পয়সার রেউড়ি কিনেছে, তা আবার দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। ছিঃ। ওরা সব হাসবে চিমটে দেখে। হাসুক গে। বয়েই গেল। হামিদ দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল — চিমটের কত দাম।

দোকানী দেখল ছেলেটার সঙ্গে বড়ো কেউ নেই। বললে, ও তোমাদের খেলার জিনিস নয় খোকা।

'বেচবে কিনা বলো না?'

'বেচব বৈকি। বেচব বলেই তো বয়ে এনেছি।'

'তা হলে বলো-না কত দাম।'

'ছ পয়সা লাগবে।'

হামিদের মুখে শুকিয়ে গেল। বললে— বলো-না ঠিক করে কত হলে দেবে।

'ঠিকঠিক পাঁচ পয়সা পড়বে। নেবে তো নাও। না নাও তো এগিয়ে যাও।'

হামিদ সাহস করে বলল — তিন পয়সায় দেবে?

এ কথা বলেই আর না দাঁড়িয়ে হাঁটা লাগাল। পাছে দোকানী এবার ধাতানি দেয়। কিন্তু দোকানি ধাতানি দিলে না। ডেকে এনে চিমটেটা হাতে তুলে দিল। চিমটেটা নিয়ে হামিদ ওটাকে বন্দুকের মতন কাঁধে তুলে নিল। আর গটমট করে বুক ফুলিয়ে সঙ্গীসাথীদের কাছে গিয়ে হাজির হল। দেখা যাক কী এত কথাবার্তার ঘটা চলেছে ওদের।

মহসীন ওকে দেখে হেসে ফেলে। বলে — এই এটা কী এনেছিস

রে পাগলা। চিমটে দিয়ে কী করবি ?

হামিদ চিমটেটা তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে চ্যালেঞ্জ করল— দেখি তুই তোর ভিস্তিটাকে এমনি করে আছাড় মার তো, টেঁকবে না, হাড়গোড় ভেঙে দ' হয়ে যাবে।

মাহমুদ অবাক বলে — সে কিরে, চিমটে কি একটা খেলনা হল ?

হামিদ— খেলনা নয় তো কী তবে। কাঁধে রাখলে বন্দুক, হাতে নিলে ফকিরের চিমটে। ইচ্ছে হলে বাজনা বাজাতে পারি। চিমটের বাড়ি এক ঘা বসালে তোদের সব খেলনা একসঙ্গে যমের বাড়ি যাবে। আর তোদের সব খেলনা একসঙ্গে করেও যদি ঘা মারিস, চিমটের কিছুই হবে না। বাঃ রে আমার বাঘের বাচ্চা। চিমটেকে আদর করে হামিদ।

সম্মী একটা ডুগডুগি কিনেছিল। চিমটের প্রভাবে পড়ে বলে —আমার ডুগডুগির সঙ্গে বদলা বদলি করবি ? এটার দাম দু'আনা।

হামিদ ডুগডুগির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল— আমার চিমটে এক খোঁচায় তোর ডুগডুগির পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ভারি ডুগডুগি ! এক পরত চামড়ার তাপ্পি লাগিয়ে দিলেই আওয়াজ ঢ্যাবঢেবে হয়ে যাবে। একটু জল পড়লেই গেল বারোটা বেজে। আর আমার চিমটে বাহাদুরকে আগুনে, জলে, ঝড়ে তুফানে যেখানে খুশি রাখ না, ঠিক থাকবে।

চিমটে ততক্ষণে সবাইকেই বশীভূত করে ফেলেছে। কিন্তু মুশকিল হল কারুর কাছেই আর পয়সা নেই। তা ছাড়া মেলা ছাড়িয়ে চলে এসেছে। বেলা নটা বেজে গেছে, রোদ চড়ে যাচ্ছে। বাড়ি যাবার তাড়া রয়েছে। বাপের কাছে যে বায়না করবে তারও আর উপায় নেই। হামিদটা ভারি ধড়িবাজ। এইজন্যেই এতক্ষণ পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। খরচ করে নি।

এখন ওরা দুটো দল। এক তরফে মহসীন, মাহমুদ, সম্মী, নুর— আর সকলে। অন্য তরফে হামিদ একা। শাস্ত্রবিচার হচ্ছে। সম্মীটা ধর্মত্যাগী, বিধর্মী। বিপক্ষ দলে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু বাদবাকিরা হামিদের চেয়ে দু-এক বছরের বড়ো হলেও হামিদের

আক্রমণে বিপর্যস্ত ও আতঙ্কিত। ন্যায়বল আর নীতির শক্তি হামিদের পক্ষে। এখন একপক্ষে মাটি, অন্য পক্ষে লোহা, তায় সে লোহার আবার ইস্পাতের তেজ। লড়তে চায়। তা এরকম অসম লড়াইয়ে পড়ে, মাটির বন্দুক ফেলে দিয়ে মাটির বীর সেপাই তো কাপুরুষের মতন দৌড়ে পালায়। উকিল সায়েবের তো কথাই নেই, চোগায় মুখ ঢেকে মাটিতে শুয়ে পড়েন। কিন্তু চিমটে, অপরাজেয় পরাক্রমী চিমটে, বাহাদুর, রুস্তমেহিন্দ চিমটে বলে লাফ দিয়ে বাঘের ঘাড়ে চড়ে তার চোখ ফুটো করে দেবে।

ডুবন্ত মহসীন খড়কুটোর মতন একটা যুক্তি চেপে ধরে। বলে— আচ্ছা, জল ভরতে তো পারবে না।

হামিদ চিমটেকে সোজা খাড়া করে রেখে বলল— এর বাড়ি এক ঘা বসালেই ভিস্তি দৌড়ে গিয়ে জল তুলে এনে দোরে ছিটোতে থাকবে।

মহসীন পরাস্ত। তার দশা দেখে মাহমুদ সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল। বললে— গোঁয়ার্তুমি করলে ধরে বেঁধে কাছারিতে নিয়ে যাবে। তখন কী করবে। এই উকিল সায়েবেরই তখন পায়ে ধরতে হবে তো।

এই কঠিন যুক্তির জবাব ছিল না হামিদের কাছে। সে প্রতিপ্রশ্ন রাখে— আমাদের ধরবে কে ?

নূর উদ্ধত স্বরে বলে— এই বন্দুকঅলা সেপাই ধরবে।

হামিদ মুখ বেঁকায়— ওই ক্ষীণজীবী এই বাহাদুর রুস্তমেহিন্দকে ধরবে, তবেই হয়েছে। এসো-না এখনই কুস্তি হয়ে যাক। এর চেহারা দেখেই পালাবে। ধরবে !

মহসীন নতুন অস্ত্র পেয়েছে। বলল— তোমার চিমটের মুখ রোজই আগুনে পড়বে। ভেবেছিল হামিদ নিরুত্তর হয়ে পড়বে। কিন্তু তা হল না।

হামিদের যেন জবাব তৈরি ছিল। বলে— যারা বীর তারাই আগুনে ঝাঁপ দেয় হুজুর, তোমার ঐ উকিল, সেপাই আর ভিস্তি আগুন দেখলে নেড়িকুত্তার মতন ঘরে ঢুকে পড়বে। আগুনে ঝাঁপ

দেওয়া— ও-সব এই বাহাদুর রুস্তমেহিন্দ্ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

মাহমুদ— উকিল সায়েব চেয়ার টেবিলে বসবে। আর তোর চিমটে রান্না-ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকবে।

এ কথাটা সম্মী আর নূরেরও খুব পছন্দ হল। বাঃ বাঃ খুব জুতসই কথা। ঠিকই তো। চিমটে যখন হয়েছে, তখন রসুইখানা ছাড়া আর কোথায় থাকবে।

এ কথার লাগসই জবাব হামিদও দিতে পারল না। কাজেই চোটপাট শুরু করল— না আমার চিমটে রান্নাঘরে থাকবে না, তোর কী। উকিল সায়েব কুরসিতে বসলে চিমটে গিয়ে তাকে মেঝেয় আছাড় মারবে। আর উকিলের আইনকানুন উকিলের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।

এ-সব মোটেই যুক্তিতর্কের কথা নয়। গালিগালাজ। কিন্তু আইন-কানুন পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারটা কেমন করে যেন বাজি মেরে দিলে। ঢোঁড়া সাপে জাত গোখরোকে কামড়ে দিলে যেমনটা হয় ব্যাপারটা তাই ঘটল। হামিদের তিন জবরদস্ত প্রতিপক্ষ এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কারণ, আইন-কানুন মুখ থেকে বার করবার জিনিস। তাকে পেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটা একেবারেই অচল হলেও কথাটায় নতুনত্ব আছে। মানতেই হবে। হামিদেরই জিত হল। মহসীন, মাহমুদ, নূর, সম্মী, একে একে সবাই মেনে নিল যে তার চিমটে— রুস্তমেহিন্দ্।

বিজেতা বিজিতপক্ষের কাছে স্বভাবত যে সংবর্ধনা পায়, হামিদও তাই পেল। আর সকলে তিন আনা চার আনা করে পয়সা খরচ করেছে। অথচ কোনো জিনিস কাজের হয় নি। হামিদ তিন পয়সায় কেল্লা মাত করে দিল। আর সত্যই তো। খেলনার কিসের ভরসা? ভেঙেচুরে যাবে। হামিদের চিমটে এখন কত বছর টিঁকবে।

সন্ধির শর্ত নির্ধারণ হতে লাগল। মহসীন বলল— দে তো তোর চিমটেটা একবার, হাতে করে দেখি। তুই আমার ভিস্তি নিয়ে দেখ্।

মাহমুদ আর নূরও পালাক্রমে তাদের খেলনা বিনিময়ের প্রস্তাব পেশ করল। এ-সব শর্তে হামিদের বিশেষ আপত্তির কারণ ছিল না। চিমটে হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। আবার সকলের খেলনাই হামিদের হাতে এল। আহা কী সুন্দর খেলনা!

হামিদ এবার বিজিতপক্ষকে সান্ত্বনা দিল— না রে, আমি মিছিমিছি তোদের রাগাবার জন্যে বলছিলুম। এই-সব চমৎকার খেলনার কাছে কি ঐ চিমটে লাগে!

কিন্তু মহসীন অ্যাণ্ড পার্টি আর এই স্তোকবাক্যে ভুলল না। চিমটের এখন জয়জয়কার। টিকিট সেঁটে গেছে একবার, এখন কি আর জল দিয়ে খুলবে।

মহসীন— কিন্তু এই খেলনার জন্যে তো কেউ আর আমাদের 'দোয়া' দেবে না।

মাহমুদ— হ্যাঁ দোয়া দেবে ভালো করে। যাও না বাড়ি। উলটে মার দেবে। আম্মা ঠিক বলবে, মেলায় মাটির খেলনা ছাড়া আর কিছু পেলি না?

হামিদকে এ কথা স্বীকার করতে হল যে চিমটে দেখে ঠাকুমা যত খুশি হবে, খেলনা দেখে কারুর মা তেমন খুশি হবে না। হামিদের তো ছিল কুল্লে তিনটে পয়সা। তাতে যা কিনেছে তাতে অনুশোচনা করার কিছু নেই। আর তা ছাড়া ওর তিন পয়সার চিমটেই তো এখন সব খেলনার রাজা— চ্যাম্পিয়ন।

রাস্তায় মাহমুদের খিদে পেল। তার বাপ তাকে কলা খেতে দিল। মাহমুদ হামিদের সঙ্গে ভাগ করে খেল। আর কাউকে দিল না। বাকিরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ সবই ঐ চিমটের কল্যাণে।

তিন

বেলা এগারোটা নাগাদ গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। মেলার যাত্রীরা ফিরে এসেছে। মহসীনের ছোটো বোন দৌড়ে এসে দাদার হাত থেকে ভিস্তি কেড়ে নিয়ে খুশির চোটে এইসান্ লাফ মারলে যে ভিস্তিমিঞা সঙ্গে সঙ্গে মাটি নিলেন, তথা পরলোকগমন করলেন। তার ফলে ভাই-বোনে প্রচণ্ড মারপিট। তারই ফলশ্রুতিতে মা কোপাবিষ্ট হয়ে ভেতর থেকে এসে ঘা-কতক করে ভাইবোনকে সমান ভাবে ভাগ করে দিলেন। তুজনের কান্না শুনলে পাথর গলে যায়।

নূরে মিঁয়ার উকিল যেহেতু সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি তাই তার পরিণতির ইতিহাসও তার মর্যাদানুযায়ী আর-একটু বেশি গৌরবময়। হাজার হোক উকিলের সম্মান আছে। মাটিতে বা তাকের ওপর তো রাখা যায় না। দেয়ালে পেরেক পুঁতে তার ওপর কাঠের তক্তা রেখে তার ওপর কাগজের গালচে পেতে উকিলকে বেশ ভোজরাজার মতন সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। নূরে ভক্তিভরে তাঁকে চামরব্যজন করছিল। আদালতে খসখসের পর্দা, বিজলীর পাখা থাকে। এখানেও কিছু ব্যবস্থা না করলে নয়। বাঁশের পাখাই সই। নইলে, আইনের গরম তো যেমন তেমন গরম নয়। উকিল সায়েবের মাথা গরম হয়ে যায় যদি। পাখার হাওয়ার তাড়নায় অথবা বাঁটের ঘায়ে ঠিক জানা যায় নি, উকিল সায়েব মেঝেয় ঠিকরে পড়েন, আর ওঠেন নি। কারণ, তাঁর মাটির দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এরপর খুবই উচ্চৈস্বরে শোক ও বিলাপ হয়েছিল। আর উকিল সায়েবের অস্থি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

বাকি রইল মাহমুদের সিপাহী। গ্রামে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পাহারায় বহাল করা হয়। কিন্তু পুলিশের সেপাই সাধারণ মানুষ নয় যে নিজের পায়ে হাঁটবে। সে পালকিতে যাবে। তাই ঝুড়ি এল, তাতে লাল রঙের কিছু ছেঁড়া নেকড়ার ডাঁই, সেপাই সায়েব তাতে আরামে শুলেন। মাহমুদ ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে

নিজেদের ঘরের দরজায় পায়চারী করছে। তার তুই ছোটোভাই, 'ছোনেবালে দাগতে লহো' হাঁক দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাত্তির অন্ধকার না হলে জমে না। একবার একটা ঠোক্কর লেগে ঝুড়িটা মাহমুদের হাত থেকে ছিটকে পড়ল। সেপাই তার বন্দুকসুদ্ধ মাটিতে পড়ল, তার একখানা পা খোঁড়া হয়ে গেল।

মাহমুদের হঠাৎ খেয়াল হল যে ও একজন পাকা ডাক্তার। ওর এমন মলম জানা আছে যাতে খোঁড়া পা আগাগোড়া জোড়া লেগে যায়। কেবল একটু ডুমুরের আঠা চাই। ডুমুরের আঠা এনে ঠ্যাং জোড়া হল। কিন্তু সেপাইকে দাঁড় করালেই ঠ্যাং আবার খসে যায়। শল্যবিদ্যা সাফল্যমণ্ডিত হল না। কাজেই সেপাইয়ের আরো একটা পা ভেঙে দিতে হল, নইলে যে বসতেও পারে না, দাঁড়াতেও পারে না। এখন যা হোক এক জায়গায় বসে থাকতে পারবে। সেপাই এখন এক জায়গায় বসে বসেই পাহারা দেয়। ঐ ভাবে থাকতে থাকতে সেপাই সন্ন্যাসী হয়ে গেল। আবার কখনো বা দেবতা হয়ে যায়। তার ঝালরদার লাল পাগড়ি চেঁছে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। এখন তার যে-কোনো ভূমিকায় রূপান্তরিত হতে পারবে, যখন তখন। মাঝে মাঝে এখন তাকে দিয়ে বাটখারার কাজও চলে।

এবারে হামিদের খবরটা নেওয়া যাক। তার সাড়া পেয়েই আমিনা দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর তার হাতে চিমটে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—

'চিমটে কোত্থেকে পেলি ?'

'কিনেছি।'

'ক পয়সা দিয়ে ?'

'তিন পয়সা দিয়ে।'

'আ, আমার কপাল !'

আমিনা মাথায় হাত দিয়ে বসল। কী বে-আক্কেল ছেলে গো। এই এতখানি বেলা অব্দি কিচ্ছু পেটে পড়ে নি। পয়সা দিলুম খেতে তা কিনে নিয়ে এল কী ? না চিমটে। হ্যাঁ রে অ ছেলে, সারা মেলায়

ঐ লোহার চিমটে বই আর-কিছু চোখে দেখতে পেলি নি ?

হামিদ তখন একটু অপ্রতিভ হল। বললে, 'তোমার হাত আগুনে পুড়ে যায়, তাই আমি চিমটে কিনে আনলুম।'

আনন্দে, গর্বে, স্নেহে, বিস্ময়ে বুড়ী যেন কেমন হয়ে গেল। তার রাগ গলে জল হয়ে গেল। এ স্নেহ ভাষায় প্রকাশ হবার নয়। মৌল স্নেহের রস আর স্বাদ আলাদা, বড়ো গভীর। এইটুকু বাচ্চা, এর মনে এত আত্মত্যাগ, এত মমতা, এত বড়ো বিবেক। সঙ্গীরা খেলনা মেঠাই কিনছে দেখে নিশ্চয় মনে সাধ হয়েছে। তবে ? এত সংযম ও কোথায় শিখল ? মেলায় গেছে, সেখানেও বুড়ো ঠাকুমার কথা মনে রেখেছে। আমিনা বিহ্বল হয়ে গেল।

আর এবার বেশ মজার ব্যাপার ঘটল। বাচ্চা হামিদ বুড়ো মানুষের মতো গম্ভীর হয়ে দাদীর হাবভাব দেখছে। আর বুড়ী দাদী তখন বাচ্চা মেয়ের মতন হাউ হাউ করে কাঁদছে আর আঁচল পেতে দোয়া মানাচ্ছে। তার চোখ বেয়ে জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়ছে। দাদী কাঁদছে। কেন, কে জানে। হামিদ এর রহস্য বুঝতে পারে না।

কফিন

ঝোপড়ার* দোরে বাপ-বেটায় চুপচাপ বসে আছে, কোলের গোড়ায় আগুন পোয়াবার মালসা, তার আংরা অনেকক্ষণ নিবে ছাই হয়ে গেছে। ভেতর থেকে একটা কাতরানির আওয়াজ আসছে। ছেলের জোয়ান বউ বুধিয়া প্রসব-বেদনায় আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। থেকে থেকে তার কলজে-নেংড়ানো গোঙানি বাপ-বেটার কানে আসছে, তারা কানে হাত চাপা দিচ্ছে, পাঁজরা চেপে ধরছে। শীতের রাত, বিশ্বপ্রকৃতি নৈঃশব্দ্যের অতলে ডুবে আছে, সারাটা গ্রাম অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

বাপের নাম ঘিসু। বলে— মনে হচ্ছে বাঁচবে না। সারাদিন তোলপাড় করেছে। যা না, একবার দেখে আয় না।

ছেলে মাধব খিঁচিয়ে ওঠে— মরতেই যদি হয় তো তাড়াতাড়ি মরছে না কেন? দেখে কী করব?

বাপ বলে— তুই তো বড়ো পাষণ্ড রে! বছরভর যার সঙ্গে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘর করলি, তার ওপর একরত্তি মায়া নেই।

'তা কী করব, ওর ছটফটানি আর হাত-পা চালা চোখে দেখা যায় না।'

এই চামার পরিবারের বদনাম সারা গাঁয়ে। ঘিসু একদিন কাজ করে তিনদিন জিরোয়। মাধবটা এমন গতরখেকো যে আধঘণ্টা কাজ করলে ঘণ্টা খানেক ছিলিম ফুঁকবে। সেইজন্যে ওদের কেউ ডাকে না। ঘরে একমুঠো দানা পড়ে থাকতে, ওদের কাজে বেরোতে নেই, মাথার দিব্বি দেওয়া আছে। দু-চার সাঁঝ হরিমটর চিবোবার পর, অগত্যা ঘিসু গিয়ে গাছে চড়ে কাঠকুটরো ভেঙে আনে, মাধব যায় সেগুলো বাজারে বেচতে। তারপর যতক্ষণ না সেই পয়সাগুলো ওড়ানো হচ্ছে, ততক্ষণ এদিক-ওদিক টোকলা

---

* ঝুপসি— খোড়ো চালার কুঁড়েঘর।

সেধে বেড়াবে। গ্রামে কাজের অভাব হয় না। চাষার গ্রাম, খেটে-খাওয়া মানুষের হাজার রকম কাজ আছে। কিন্তু নিতান্ত কাজের চাপে মজুর মুনিষের টানাটানি না পড়লে ওদের বাপবেটাকে কেউ ডাকে না। নেহাৎ দায়ে ঠেকলে, একজনের কাজ দুজন করবে। জেনেশুনেও যখন তাতে রাজি হতে হয়, তখনই বাপবেটার ডাক পড়ে।

ওরা যদি সাধু হত, ওদের সংযম নিয়ম পালনের কোনো প্রয়োজনই পড়ত না, কারণ সন্তোষ আর তিতিক্ষায় ওরা স্বভাবসিদ্ধ। আদর্শ নিরাসক্ত জীবন। ঘরে তৈজসপত্র বলতে দুটো মাটির সানকি, ছেঁড়া ত্যানা পরে লজ্জা নিবারণ হয়, বিষয়চিন্তা-রহিত। মাথায় ধারকর্জের পাহাড়। মারধর, গালাগাল হরদম হচ্ছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। এত গরিব, যে উসুল হবে না জেনেও, দৈন্যদশা দেখে লোকে টাকাটা সিকেটা ধার দেয়। ফসলের সময় এর ক্ষেতের আলুটা মুলোটা, ওর ক্ষেতের মটর যা পায় তুলে এনে পুড়িয়ে খায়। তাও না জুটল তো কারুর ক্ষেত থেকে পাঁচ-দশ ঝাড় আখই তুলে নিয়ে এল, তাই চুষে রাত কাবার করে দিল। এই আকাশবৃত্তির ওপর দিয়েই ঘিসুর পরমায়ুর ষাট বছর কেটে গেল। তার উপযুক্ত পুত্র মাধবও এখন বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলছে, বরং বাপের নাম আরও উজ্জ্বল করছে। আজও কারুর ক্ষেত খুঁড়ে আলু নিয়ে এসেছিল, মালসার আগুনে দুজনে তাই পুড়িয়ে খাচ্ছিল। ঘিসুর বউ অনেকদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে। মাধবের বিয়ে হয়েছে গত বছর। বউটা এসে থেকে সংসারের জন্য খেটে খেটে হাড়মাস কালি করেছে, বাড়িতে খানিকটা নিয়মকানুনের পত্তন করেছে ; এই বেহায়া দুটোকে দুবেলা যমের বাড়ি পাঠিয়েছে, তবু তাদের নড়ে বসাতে পারে নি। বরং ঘরে বউ আসায় ওদের আরো পায়াভারী হয়েছে। কেউ কাজে ডাকলে, যেন গরজ নেই এমন ভাবে ডবল মজুরী হাঁকে। বউটারই যত খোয়ার।

ঘরের ভেতর মেয়েছেলেটা প্রসব-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কাটা ছাগলের মতো আছাড়পিছাড় খাচ্ছে— বাইরে এরা দুটোয় বসে বসে আলু পোড়াচ্ছে, আর বোধ হয় অপেক্ষা করছে, কতক্ষণে

মেয়েমানুষটা মরবে। তারপর ওরা আরামে ঘুমোবে।

আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ঘিসু বলে— কী ব্যাপারটা কী ওর, একবার গিয়ে দেখ দিকি। পেত্নীর নজর লেগেছে আর কী। রোজা ডাকতে গেলেও তো এক টাকা চাইবে। মাধব ভাবে, হ্যাঁ, আমি চোখের আড়াল হই আর তুমি আলুর বড়ো ভাগটা মেরে দাও আর কী। বলে—'আমি যাব না, ভয় লাগে।

'ভয় কিসের। আমি তো এখানে রইছি।'

'তা তুমিই গিয়ে দেখ-না।'

'মর। ওকি আমার বউ। আমার বউ যখন মরে, আমি তিনদিন তার শেয়র ছেড়ে নড়ি নি। জানিস। আর আমায় দেখে লজ্জা পাবে না? যার মুখ দেখলুম না কোনো দিন, আজ তার আদুড় গা দেখব? বেচারি আমায় দেখলে আড়ষ্ট হয়ে পড়বে। ভালো করে হাত-পা ছুঁড়তেও পারবে না।'

'আমি ভাবছি, যদি ছেলেপুলে হয় তো কী হবে। সোঁঠ, গুড়, তেল— ঘরে তো কিছুই নেই।'

'ও সব এসে যায় রে। ভগবান দিয়ে দেয়। আজ যে একটা ছেদাম ঠেকাচ্ছে না, কাল দেখবি সেই যেচে এসে টাকা সাধছে। আমার ন'নটা ছেলে হয়েছে, ঘরে কানাকড়িও ছিল না। ভগবান ঠিক ঠেকা পার করে দিয়েছেন।

পাঠক এদের ধরন-ধারণ দেখে আশ্চর্য হবেন না। কারণ, ভেবে দেখুন এ সমাজে এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এখানে যারা অষ্ট-প্রহর খেটে মরছে, তাদেরও নাভিশ্বাস উঠছে— ঘিসু-মাধবদের থেকে তাদের হাল কিছুমাত্র ভালো নয়। এখানে যারা চাষ করে সমাজের মুখে অন্ন তুলে দেয়, তারা খেতে পায় না। আর যারা চাষাদের ভোগা দিয়ে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়, তারা সম্পন্ন গৃহস্থ। বরং আমি বলব ঘিসু কিষানদের তুলনায় ঢের বেশি বুদ্ধিমান তাই নির্বোধ শ্রমজীবীদের পালে না প'ড়ে মতলববাজ বৈঠকীদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। তবে হ্যাঁ, বৈঠকবাজদের কায়দা-কানুন শিখবার সুযোগ ছিল না তার। তা থাকলে গাঁয়ের মুখিয়া মোড়ল হয়ে বসত,

গাঁসুদ্ধ ইতরজনের পেন্নাম পেত। তা না থাক্, তবু তার তো একটা সান্ত্বনা যে যতই লক্ষ্মীছাড়া দশা হোক, চাষাদের মতন খেটেও মরছে, পেটেও মরছে তা তো না। আর তার ধন নিয়ে নেপোরা দই মেরে যেতেও পারছে না।

দুই বাপবেটায় মালসা থেকে আধপোড়া আলু বের করে আগুন-আগুন খাচ্ছে। জুড়োতে তর সইছে না। কাল থেকে পেটে দানা পড়ে নি। জিভ পুড়ে যাচ্ছে। খোসা ছাড়ালে আলুর উপরটা তেমন গরম লাগে না, কিন্তু দাঁতের চাপ পড়তেই ভেতরের আগুন-গরম শাঁস, জিভ, টাকরা, মায় আলজিভ পর্যন্ত পুড়িয়ে খাক করে দেয়। আবার সেই আংরা মুখে না রেখে পেটে পুরে দেওয়াই সবদিক দিয়ে শ্রেয়। পেটে তলিয়ে গেলে সেখানে ঠাণ্ডা করার অনেক যন্তর আছে। তাই বাপবেটায় গবগব করে গিলছে। অবিশ্যি আগুন গেলার প্রতিযোগিতায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে ঘিসুর অনেক কালের পুরনো কথা মনে পড়ছে। বছর কুড়ি আগে জমিদারবাবুর বিয়েতে বরযাত্রী খেয়েছিল। ও-রকম নেমন্তন্ন লোকে জীবনভর ভুলতে পারে না। বলে — সে কী ভোজ! জীবনে আর একটা অমন খেলুম না। কন্যেপক্ষ সব্বাইকে পেট ভরা পুরি খাইয়েছিল, ছোটোবড়ো সবাইকে— খাঁটি ঘিয়ে ভাজা। তার সঙ্গে তিনরকম শাকভাজা, একটা রসা রসা তরকারি। আর চাটনি, রায়তা, দই, মিষ্টি— আহা সে যে কী আস্বাদ, তোকে কী বলব! যা খুশি চাও, যত খুশি খাও। মানা করবার কেউ নেই। আর লোকে টেনেওছে তেমনি। এমন খেয়েছে, যে জল খাবার জায়গা নেই। পরিবেশন করছে তো করছেই, বারণ করলে শুনছে না, হাত চেপে ধরলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাতে দিয়ে যাচ্চে— গরম গরম গোল গোল সুগন্ধি কচুরি। মুখ ধুয়ে উঠতেই এলাচ দেওয়া পানের খিলি। কিন্তু পান খাবে কে। আমি তো দাঁড়াতেই পারছি না। চট করে গিয়ে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম। আহা কী দিল-দরিয়া মানুষ।

মাধব মনে মনেই খাবারগুলো চেখে নেয়। বলে— আজকাল

আর কেউ অমন ভোজ খাওয়ায় না।

'এখন কে খাওখাবে। সে কালই নেই। এখন সব বেটা কিপটেমি শিখেছে। বে-থায় খরচ কোরো না, ক্রিয়াকর্মে খরচ কোরো না। আ মর, খরচ করবি না তো গরিবদের যে তুহাতে লুটছিস, সে মালগুলো ধরবে কোথায়। লোটবার বেলায় তো কিপটেমি নেই।'

'তুমি কতগুলো পুরি খেলে? এক কুড়ি হবে?'

'এক কুড়ির বেশি।'

'আমি হলে খান পঞ্চাশেক সাঁটতুম।'

'আমিও পঞ্চাশ খানার কম খাই নি। তাগড়া জোয়ান ছিলুম যে॥ তুই তো আমার আধখানাও হোস নি।'

আলু খেয়ে আকণ্ঠ জল গিলে, যে যার ধুতির মুড়ো খুলে মুড়ি দিয়ে ওইখানেই মালসার পাশে কাত হল। হাঁটু তুটো পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে দিয়ে এমন করে পড়ে রইল, যেন তুটো বড়োসড়ো ময়াল সাপ কুণ্ডলিপাকিয়ে শুয়ে আছে।

ওদিকে বুধিয়া সমানে কাতরাচ্ছে।

তুই

সকালে মাধব ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখল— বউটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মুখের তুপাশে মাছি ভনভন করছে। পাথরের মতন চোখ তুটো শিবনেত্র হয়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ ধুলোয় মাখামাখি। বাচ্চাটা পেটের মধ্যেই মরে রয়েছে।

মাধব দৌড়ে বেরিয়ে এসে বাপকে ডেকে তুলল। তারপর তুজনে মিলে গলা ফাটিয়ে হাহাকার করতে আর বুক চাপড়াতে লাগল। মড়া কান্না শুনে পাড়ার লোক ছুটে এল। চিরাচরিত প্রথামত তারা বাপবেটাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

কিন্তু বেশি কাঁদাকাটার সময় নেই। পোড়াবার কাঠের জোগাড়

করতে হবে, মড়া ঢাকবার নতুন কাপড়ও চাই। পয়সা কড়ি? বরং শকুনির বাসায় খুঁজলে মাংস পাওয়া যাবে, কিন্তু এদের বাড়িতে একটা পয়সাও বেরোবে না।

বাপছেলেতে কাঁদতে কাঁদতে জমিদার বাড়ি গেল। নচ্ছার ছুটোর মুখ দেখলে তাঁর পিত্তি জ্বলে যায়। কাজ করতে ডাকলে টিকির দেখা পাওয়া যায় না, চুরি করতে ওস্তাদ। ঘা-কতক দিয়েওছেন এর আগে কবার। জিজ্ঞেস করেন— কী রে ঘিসুয়া, কাঁদিস কেন? আজকাল তো ডুমুরের ফুল হয়েছিস। আর এ গাঁয়ে থাকবি না বুঝি।

ঘিসু মাটিতে মাথা লুটিয়ে চোখে জল ভ'রে বলে— কী বলব হুজুর, আমার বড়ো বিপদ। মাধবের ইস্তিরি কাল রাত্তিরে স্বর্গবাস করেচে। রাতভর যন্তরনা পেয়ে গেছে, আমরা দুজন সারারাত ঠায় শেয়রে বসে। ওষুধ বিষুধ যদ্দুর পেরেছি করেছি, কিন্তু হায় হায় মালিক— দাগা দিয়ে চলে গেল। দুটো ফুটিয়ে দেবার কেউ রইল না। সব্বোনাশ হয়ে গেল। ঘরটা শ্মশান হয়ে গেল। গোলামের আপনিই মা-বাপ। আপনি ছাড়া কার দোরে দাঁড়াব। ঘাটের দায় সারতে পারব না হুজুর। হাতে খুদকুঁড়ো যা সম্বল ছিল, হাত খালি করে চিকিচ্ছে করেছি। এখন আপনি দয়া করলে তবে ঘাটে তুলতে পারি।

জমিদার দয়ালু ব্যক্তি। কিন্তু ঘিসুর ওপর দয়া করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা। একবার ভাবলেন, বলি— দূর হ' এখান থেকে হারামজাদা বদমাস। ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না। আজ গরজে পড়ে দৌড়ে এসেছে খোশামোদ করতে, নচ্ছার কোথাকার। কিন্তু মানুষের শোকের সময় শক্ত কথা বলা যায় না। রাগ মনে চেপে দুটো টাকা ফেলে দিলেন। ওর দিকে চেয়েও দেখলেন না।

জমিদার স্বয়ং দু'টাকা দিয়েছেন, কাজেই গ্রামের বেনে-মহাজনেরা ফেরায় কোন্ সাহসে। ঘিসু জমিদারের নামে ঢেঁটরা পিটতেও ভালোই জানত। কেউ দু-আনা দিলে, কেউ চার-আনা দিলে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘিসুর ট্যাঁকে পাঁচ টাকার মতন জমা হল

কোথাও থেকে কাঠের জোগাড় হল, কোথাও থেকে তেলের। দুপুরবেলায় ঘিসু আর মাধব বাজারে গেল ঘাটকাপড় কিনতে। এদিকে আর-পাঁচজন গেল মাচার বাঁশ কাটতে।

গাঁয়ের কোমলমতি মেয়েছেলেরা দলে দলে এসে শব দেখে গেল, দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলে গেল।

বাজারে এসে ঘিসু বললে— হ্যাঁ রে মাধব, কাঠকাটরা যা পাওয়া গেছে তাতেই দাহ হবে তো ?

মাধব বলে— হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঠ অনেক আছে, এখন বাকি শুধু কাপড় কেনা।

ঘিসু— চল্ তবে একটা পাতলা গোছের কফিনের কাপড় কিনে ফেলি।

'হ্যাঁঃ যা-হোক একটা হলেই হল। লাশ উঠতে উঠতে রাত হয়ে যাবে। রাত্তিরে কাপড় কে দেখছে।'

'কী বেয়াড়া নিয়ম বাপু। বেঁচে থাকতে ছেঁড়া ত্যানা তাই একটা জোটে না যে গা ঢাকবে। মলেই ওমনি নতুন কাপড় চাই। —হেঁঃ।'

'কফিনের কাপড় মড়ার সঙ্গেই চিতায় উঠবে তো ?'

'না তো কী, তোর জন্যে তুলে রাখবে। ছ্যাঃ এই পাঁচটাকা আগে পেলে বউটাকে ওষুধ কিনে দেওয়া যেত।'

ওরা দুজনেই দুজনের মনের কথা টের পায়। খানিক কাপড়ের বাজারে টহল মারে। এ দোকান ও দোকান করতে থাকে। রঙ-বেরঙের রেশমি শাড়ি, রকমারি সুতী বস্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, কিছুই পছন্দ হয় না। এই করতে করতে সন্ধে উতরে যায়। তখন কী এক অজ্ঞাত দৈবী প্রেরণার বশে দুজনে একটা পানশালার দোরে এসে দাঁড়ায়। তারপর যেন নির্ধারিত নিয়ম মাফিক সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘিসু শুঁড়ির গদীর কাছাকাছি গিয়ে বলে— সাহুজী, এদিকে এক বোতল।

ছাঁকা তেলে ভাজা মাছের চাট আর চানাচুর আসে। বোতল আসে। বাপবেটায় রকে বসে পরম শান্তিতে ঢোঁকে ঢোঁকে পান করে।

ঢকঢক করে কয়েক ভাঁড় সাবাড় করার পর দুজনের বেশ একটা মৌতাতের আমেজ এল।

ঘিসু বলল— মড়াটাকে কফিনে মুড়ে লাভটা কী। খামোকা। কাপড় তো বউয়ের সঙ্গে যাচ্ছে না। চিতায় পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে, সম্ভবত নিজের সততার বাবদ দেবতাদের সাক্ষী মেনে, বলে— দুনিয়ার দস্তুর। নইলে লোকে বামুনকে এত হাজার হাজার টাকা দেয় কেন। পরলোকে কী পায় না পায়, কে দেখতে গেছে।

'বড়োলোকদের টাকা আছে, তারা ফুঁকে দিক্‌গে। আমাদের মতন মানুষরা টাকা কোথায় পাবে?'

'কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কফিনের কাপড় কোথায়? তখন কী বলবে?'

ঘিসু হাসে— আরে দুর, তুইও যেমন। বলে দেব ট্যাঁক থেকে কোথায় পড়ে গেছে। কত খুঁজলুম, পাওয়া গেল না। লোকে বিশ্বাস করবে না বটে, তবে আবার ওরাই টাকা দেবে।

মাধবও হাসে— এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে। বলে— আহা, বড়ো ভালো ছিল মেয়েমানুষটা। মরেও আমাদের খাইয়ে গেল।

আধ বোতলের ওপর উড়ে গেল। ঘিসু এইবার সের দুই পুরি আনাল। সঙ্গে চাটনি, আচার, মেটলির তরকারি এল। শুঁড়িখানার সামনেই দোকান। মাধব লাফিয়ে গিয়ে দুটো পাতায় সম্ভার সাজিয়ে নিয়ে এল। পুরো দেড় টাকা খরচ হয়ে গেল। পুঁজি প্রায় নিঃশেষ। সামান্য কিছু খুচরো পড়ে রইল।

দুজনে তখন বেশ মেজাজে বসে খাওয়াদাওয়া করছে। দেখে মনে হচ্ছে দুটো জঙ্গলের বাঘ শিকার সামনে নিয়ে বসেছে। জবাবদিহির পরোয়া নেই, বদনাম হবার ভয় নেই। কিছু না। ও-সব তুচ্ছ ভাবনাচিন্তার বেড়া ওরা অনেকদিন আগেই পেরিয়ে এসেছে।

ঘিসু দার্শনিক ভঙ্গিমায় বলে— এই যে আমাদের আত্মা তৃপ্তি পাচ্ছে, এতে কি তার পুণ্য হবে না?

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে মাধব সায় দেয়-- আলবৎ হবে, একশো বার হবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেয়ো। আমরা কলজে উজাড় করে আশীর্বাদ করছি। আজ যে খাওয়া খেলুম, তা জীবনে কখনো খেতে পাই নি।

খানিক পরে মাধবের মনে একটু অস্বস্তি দেখা দেয়। বলে— আচ্ছা বাবা, একদিন-না-একদিন আমাদেরও তো যেতে হবে ওপারে।

ঘিসু ছেলের এই বালকসুলভ প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না। ও এখনই পরলোকের চিন্তা করে সাম্প্রতিক ফুর্তিটা নষ্ট করতে রাজি নয়।

মাধব আবার বলে— সে যদি ওখানে আমাদের ধরে, বলে, কেন আমায় ঘাট-বস্তর কিনে দাও নি? তখন কী জবাব দেবে?

'তোর মুণ্ডু।' — ঘিসু আন্তরিক বিরক্ত হয়।

'কেন? জিজ্ঞেস করতে পারে না? নিশ্চয় পারে'—

'কে তোকে বলেছে যে ঘাটবস্তর জুটবে না? তুই আমাকে এতই গাধা বলে ঠাউরেছিস। ষাট বছর ধরে কি আমি ঘোড়ার ঘাস কেটেছি। কফিন ঠিক আসবে, বেশ ভালো কাপড়ের কফিন হবে, দেখিস।'

মাধবের বিশ্বাস হয় না, বলে— কোত্থেকে হবে? টাকা তো ফুঁকে দিলে। তোমায় তো কিছু বলবে না। ওর সিঁথেয় সিঁদুর দিয়েছি আমি, ধরলে আমায় ধরবে।

ঘিসু তপ্তস্বরে— আমি বলছি কফিনের ব্যবস্থা হবে, তবু তোর ভরসা হচ্ছে না?

'কিন্তু দেবেটা কে, তা তো বলছ না।'

'যারা এখন দিয়েছে, তখনও তারাই দেবে। তবে হ্যাঁ, এবার আর তোর-আমার হাতে দেবে না।'

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। তারাদের দীপ্তি আরো তেজালো হচ্ছে। সেইসঙ্গে শুঁড়িখানার রঙ-তামাশাও বাড়ছে। কেউ প্রাণ খুলে গান গাইছে, কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ নিবিড় আশ্লেষে

সহচরের গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ মদের ভাঁড় হাতে নিয়ে বন্ধুর অধরে তুলে ধরছে।

গোটা পরিবেশটা নেশায় ভরপুর, মৌতাতে মশগুল। এখানেও নিশ্বাসে নেশা। মাতাল হতে বেশি মদের দরকার হয় না। কারুর কারুর এক চুমুকেই কাজ হচ্ছে। জীবনের ব্যর্থতা এখানে হাতছানি দিয়ে আনে। খানিকক্ষণ যাবৎ লোকে ভুলে থাকে— বেঁচে আছে কি মরে গেছে। নাকি, বেঁচেও নেই, মরেও নেই।

বাপ-বেটায় খুব আয়েস করে চুমুক দিচ্ছে। এখন সমবেত সকলের নজর ওদের ওপর। ওরা বড়ো ভাগ্যবান। পুরো বোতলটা মাঝখানে রেখে বসে আছে।

ভরা পেটে মাধব সদাশিব। একটা ভিখিরি বহুক্ষণ ধরে লোলুপ চোখে ওদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাতায় কখানা পুরি পড়ে ছিল, মাধব এবার পাতাটা সুদ্ধ্ তার হাতে ফেলে দেয়। দানের গৌরব, ঔদার্যের উল্লাস জীবনের এই প্রথম অভিজ্ঞতা —মাধবকে স্ফীত করে তোলে।

ঘিসু বলে— নে যা খুব করে খা আর আশীর্বাদ কর। যার দৌলতে খেলি, সে তো মরে গেছে। তবে তোর আশীর্বাদ তার কাছে নিশ্চয় পৌঁছাবে। মন ঢেলে, প্রাণ ঢেলে একবার আশীর্বাদ কর দিকি বাবা। বড়ো কষ্টের ধন রে বাপ্।

মাধব আবার আকাশে তাকায়, বলে— বউটা আমার বৈকুণ্ঠে যাবে গো বাবা, বৈকুণ্ঠের রানী হবে।

ঘিসু আর বসে থাকতে পারে না, উঠে দাঁড়ায়, অফুরন্ত উল্লাসের প্রবাহে সাঁতরাতে থাকে। বলে— হ্যাঁ বাবা, যাবে বৈকি। বৈকুণ্ঠে তো যাবেই। কাউকে দুঃখু দেয় নি, কাউকে ভোগায় নি। নিজে মরতে মরতে আমাদের জীবনের সব অপূর্ণ লালসা পূর্ণ করে দিয়ে গেছে। সে পুণ্যবতী যদি বৈকুণ্ঠে না যায় তো কে যাবে? পেট মোটা বড়োলোকগুলো? যারা দুহাতে গরিবের গলা টিপে তার রক্ত চুষে খায়— আর পাপ ধোবার জন্যে গঙ্গায় নাইতে যায় আর মন্দিরে ভোগ চড়ায়— তারা যাবে?

কিন্তু মাতালের বৈশিষ্ট্য হল মুহুর্মুহুঃ ভাব পরিবর্তন। শ্রদ্ধা, গৌরব, হর্ষ — পরের মুহূর্তেই বদলে গেল। এবার ভগ্ন আশা আর বিষাদের পালা।

'কিন্তু বাবা'— মাধব কাঁদকাঁদ হয়ে ফিসফিস করে বলতে থাকে— 'বেচারী সারা জীবন বড়ো কষ্ট পেয়ে গেছে। আহাহা, কী যন্ত্রণায়— ভুগে ভুগে মরেছে। ও হো-হো…'

'কেঁদো না বাবা'—ঘিসু ছেলেকে ভোলায়। — 'এই মায়াজাল ছিঁড়ে, সব জঞ্জাল মুক্ত হয়ে সে যে চলে যেতে পেরেছে, এই ভেবে খুশি হও। আহা বড়ো ভাগ্যবতী, পুণ্যময়ী মা আমার, তাই এত তাড়াতাড়ি মায়ামোহের বন্ধন কাটাতে পেরেছে।'

বাপবেটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৈরাগ্যের গান গায়—

"ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে।"

তাদের চারপাশে পানরসিকের দল মুগ্ধ কৌতূহলে তাদের দিকে তাকিয়ে। মত্ত, মগ্ন পিতাপুত্র বৈরাগ্য-গাথা গাইতে থাকে। তারপর গানে কুলোয় না। নাচ শুরু করে। সে কী উদ্দাম নর্তন। লম্ফ-ঝম্প-কুর্দন— পতনের উন্মাদনা। তারপর কিছুক্ষণ চলে রঙ্গ অভিনয়ের পালা। ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে দুজনে। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত নেশার ঝোঁকে অবশ হয়ে বাপবেটায় শুঁড়িখানার মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে। ওখানেই পড়ে থাকে।

* বাংলাভাষায় 'কফিন' শব্দটার প্রচলিত অর্থ বোধ হয় দারুময় শবাধার। হিন্দীতে এই শব্দটা শবাচ্ছাদনের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই গল্পে কফিন বলতে শবদেহ ঢাকা দেবার নববস্ত্র বোঝানো হয়েছে। ইচ্ছে করেই মূল হিন্দী শীর্ষকটি বজায় রাখা হয়েছে। —অনুবাদক

দুধের দাম

ইদানীং বড়ো বড়ো শহরে দাই, নার্স, লেডি ডাক্তারের চল হয়েছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে আঁতুড়ঘরের কর্তৃত্ব আজো সেই হাড়ি মেথরের হাতে, আর অদূর ভবিষ্যতে যে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে তারও আশা নেই। বাবু মহেশনাথ গ্রামের জমিদার, আর শিক্ষিত ব্যক্তি। প্রসবাগারের ব্যবস্থায় উন্নতি হওয়া দরকার এটা উপলব্ধি করেন। কিন্তু সে পথে অন্তরায়গুলি নির্মূল করা তো সহজসাধ্য নয়। কোনো নার্স সহজে পাড়াগাঁয় যেতে চায় না, আর যদি-বা অনেক বলা-কওয়ায় রাজি হল তো এমন লম্বা চওড়া ফি হাঁকে যে জমিদারবাবুর মাথা হেঁট করে চলে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। লেডি ডাক্তারের দোর পর্যন্ত যাবার আর সাহস হয় না। তার ফি দিতে হলে হয়তো আদ্ধেক সম্পত্তি বেচতে হবে। কাজেই তিন মেয়ের পর চতুর্থ সন্তান (এটি পুত্র-সন্তান) ভূমিষ্ঠ হবার সময়েও সেই সনাতন কালের গূদড় আর গূদড়ের বউ। ছেলেপুলে বেশির ভাগই রাত্তিরের দিকে হয়। একদিন মাঝরাত্তিরে জমিদারের চাপরাসী এসে গুদড়ের দরজায় এমনই হাঁকা-হাঁকি শুরু করল যে পাড়াপড়শি জেগে উঠল। হবেই তো। মেয়ে হয় নি তো, যে চাপা গলায় ডাকবে।

গূদড়ের বাড়িতে আজ মাসাবধিকাল এই শুভদিনের আশায় সাজ-সাজ রব চলেছে। ভয় ছিল এবারেও আবার মেয়ে না হয়। তা হলেই সেই একটা টাকা আর একটা শাড়ি বাঁধা আছে। এই ব্যাপার নিয়ে ওদের স্ত্রীপুরুষে কতবার ঝগড়া হয়ে গেছে, বাজি ধরাধরি হয়েছে। বউ বলেছিল— এবার যদি ছেলে না হয় তো আমার কান কেটে ফেলিস, হ্যাঁ হ্যাঁ এই রইল কথা। বলে, সব লক্ষণ ছেলের। আর গূদড় বলেছিল— দেখে নিস মেয়ে হবে এই বলে দিলুম, ভরা ভর্তি মেয়ে হবে। ছেলে হলে আমার গোঁপ কামিয়ে ফেলব। হ্যাঁ হ্যাঁ যাঃ কামিয়ে ফেলব গোঁপ। মনে মনে গূদড়ের

কী সুপ্ত এষণা ছিল কে বলবে। হয়তো বউয়ের জেদ বাড়িয়ে দিয়ে পুত্রকামনাকে জোরালো করে ছেলে হওয়ার পথ সুগম করতে চাইত।

আজ মুঙ্গী বলে— এবার নে রে দেড়ে, কই গোঁপ কামালি না? তখনই বলেছি ছেলে হবে, তা কথায় কে কান দেয়। বাবুর নিজের কথাই সাতকাহন। এখন কী হয়? আয়, আজ নিজে হাতে তোর মুড়ো গোঁপ মুড়িয়ে ছাড়ব।

গূদড় বলে— আচ্ছা রে ভালোমানুষের বেটি, মুড়োস 'খনে। গোঁপ কি একবার কামালে আর গজাবে না নাকি? তেরাত্তির বাদেই দেখবি আবার যেমনকার তেমনি। কিন্তু পাওনা থোওনা সব কিন্তু আধাআধি বখরা বলে রাখলুম।

মুঙ্গী বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখায়, তারপর নিজের তিন মাসের ছেলেটাকে বাপের জিম্মেয় রেখে সেপাইয়ের সঙ্গে যাবে ব'লে উঠে দাঁড়ায়।

গূদড় পেছু ডাকে— আরে এই, শুন যা। কোথায় চললি দৌড়ে? ছেলের মুখ দেখতে আমায় যেতে হবে না? বা রে। ছেলেকে কে সামলাবে?

মুঙ্গী দূর থেকেই আওয়াজ দিলে— ওই ছেলে ভুঁয়ে শুইয়ে রেখো। এসে দুধ খাওয়াব।

দুই

মহেশবাবুর বাড়িতে এবারেও মুঙ্গীর খুব খাতির যত্ন। সকালে সুজিসেদ্ধ লাপসি, দুপুরে পুরি আর হালুয়া, তার ওপর বিকেলে একবার আবার রাত্রেও আরো একবার কুল্লে চারসাঁঝ ভরপেট খাওয়া— একলা মুঙ্গী নয় গূদড়েরও। মুঙ্গী দিনভর এখানেই থাকে, নিজের ছেলেকে দিনেরাতে একবার দুবারের বেশি বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না। তার জন্যে বাইরের দুধের বন্দোবস্ত। মুঙ্গীর দুধ জমিদারবাবুর ভাগ্যবান ছেলেতে খায়। আর আঁতুড়ের এগারো দিন কেটে গেলেও মুঙ্গীর দুধ ছাড়ানো গেল না। গিন্নি-

ঠাকরুণ এমনিতে বেশ গায়ে গতরে ভালো। কিন্তু এবার কী হল কে জানে তাঁর দুধ হল না। মেয়ে তিনটের বেলায় এত বেশি দুধ হয়েছিল যে মেয়েগুলোর বদহজম হয়ে যেত। আর এবার ছেলেটার বেলা এক ফোঁটা দুধ নেই। তা মুঙ্গী দাই তো রয়েছেই, ছেলে তার দুধই খায়।

গিন্নি ঠাকরুণ বলেন— মুঙ্গী, আমার বাচ্চাটাকে টেনে তোল্, তারপর যদ্দিন বাঁচবি বসে খাবি। পাঁচ বিঘে জমি খয়রাতি করে দোব'খন। নাতিপুতি নিয়ে সুখে থাকবি।

ওদিকে মুঙ্গীর পেটের ছেলেটা রোজের দুধ হজম করতে পারে না, বমি করে দিন দিন রোগা হয়ে যায়।

মুঙ্গী বলে— বউদি, এবার কিন্তু মুণ্ডনের সময় চুড়ি নোব, বলে রাখলুম।

বউঠাকরুণ হাসেন। বলেন— হ্যাঁ হ্যাঁ নিস, তা এখন থেকে চোখ রাঙাচ্ছিস কেন। কিসের চুড়ি নিবি, রুপোর না সোনার?

'বারে, রুপোর চুড়ি পরে কি লোক হাসাব নাকি!'

'বেশ তো, সোনারই নিবি, বলছি তো।'

'আর ছেলের বিয়েতে সোনার বিছেহার নোব, আর চৌধুরীর (অর্থাৎ গূদড়) জন্যে হাতের তোড়া।'

'ভগবান যদি সে সুদিন দেন তো তাও পাবি, নিশ্চয় পাবি।'

বাড়িতে বউঠাকরুণের পরেই মুঙ্গীর রাজত্ব। দাসীচাকরানি, রাঁধুনি-বাম্‌নি থেকে চাকরবাকর সবাই ওর মেজাজ বুঝে কথা কয়। বেশি কথা কি স্বয়ং বউঠাকরুণকেও দাবিয়ে চলে। একদিন তো মহেশবাবুকেই ধমকে ওঠল। তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। কথা হচ্ছিল হাড়ি-মেথরদের নিয়ে। মহেশনাথ বুঝি বলেছিলেন— পৃথিবীতে আর যাই হোক, হাড়ি হাড়িই থাকবে। তাকে মানুষ করা শক্ত।

তা সেই কথার পিঠে মুঙ্গী অমনি বলে উঠল— কর্তাবাবু, এই হাড়িরাই তো কত বড়ো বড়ো ঘরের লোককে মানুষ করে। তা তাকে আবার মানুষ করবে কে।

বাবুর মুখের উপর কথা বলার আস্পদ্দা! অন্য সময় হলে

মুঙ্গীর ধড়ের ওপর মাথা থাকত! কিন্তু আজ বাবু যেন সদাশিব। হা হা করে হেসে বললেন— বাঃ, আমাদের মুঙ্গী একটা কথার মতো কথা বলেছে তো।

বছর খানকের বেশি মুঙ্গীর শাসনকাল স্থায়ী হল না। দেব-দ্বিজের আপত্তি দেখা গেল: এত বড়ো ঘরের ছেলে কিনা হাড়ি-বউয়ের দুধ খাবে! মোটেরাম শাস্ত্রী তো প্রায়শ্চিত্তের বিধানই দিয়ে বসলেন। দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া হল বটে, তবে প্রায়শ্চিত্তের কথাটা হাসিঠাট্টার মধ্যে উড়ে গেল। মহেশনাথ বললেন— খুব বললে যা হোক শাস্ত্রীজী, কাল অব্দি ঐ হাড়ির রক্ত খেয়ে বেঁচে রইল, আজ তাতে ছুঁতের দোষ হয়ে গেল। বলিহারি আপনাদের ধর্ম!

শিখা চেতিয়ে ধরে শাস্ত্রীজী জবাব দিলেন— হতে পারে কাল পর্যন্ত বালকটি হাড়িবউয়ের রক্তমাংস আস্বাদ করে জীবনধারণ করেছে। কিন্তু কালকের কথা কাল, আজকের কথা আজ। শ্রীক্ষেত্রে ছুঁৎ অচ্ছুৎ সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খায়, কিন্তু তা বলে এখানেও খাবে নাকি। রোগে ব্যাধিতে আমরাও স্পর্শদোষ মানি নে, বাসি কাপড়েও খাই, অন্নভক্ষণও করে থাকি। আবার সেরে ওঠার পর তো নিয়ম পালন করতেই হয়। আপদ্ধর্মের জন্যে তো বিধান আলাদা আছেই।

'তার মানে ধর্ম এক-এক সময় এক-এক রকম বদলায়, বলুন?'

'তা বৈকি। রাজার ধর্ম আলাদা, প্রজার ধর্ম আলাদা। ধনীর ধর্মে আর গরিবের ধর্মে তফাত তো থাকবেই। রাজারাজড়ারা যা খুশি খান, যার তার সঙ্গে বসে খান, যার তার সঙ্গে বিয়ে থা করুন, তাঁদের সব চলে— কোনো বন্ধন নেই। তাঁরা সমর্থ পুরুষ। বাঁধন হল মাঝারি লোকের জন্যে।'

প্রায়শ্চিত্ত অবিশ্যি হল না। কিন্তু মুঙ্গীকে গদীচ্যুত হতে হল। তবে হ্যাঁ, দানদক্ষিণা এত পেয়েছিল যে একলা বয়ে নিয়ে যেতে পারে না, তার সোনার চুড়িও পেয়েছিল। একখানার জায়গায় দুখানা নতুন শাড়ি— তাও মেয়েদের বেলায় যেমন মামুলী নয়নমুখ জুটেছিল তেমন নয়, দস্তুর মতন ভালো শাড়ি।

তিন

সেই বছরেই প্লেগের মড়কে গুদড় দেহ ছাড়ল। মুঙ্গী হাড়িনী একলাই রইল। গেরস্তালি কিন্তু আগের মতোই চলে। লোকে তাক করে বসে থাকে— মুঙ্গরী আর কদিন বৈধব্য টেকে দেখা যাক। এই তো অমুক ভাংগীর সঙ্গে কথাবার্তা হল, তমুক সরদার আসা-যাওয়া করল। কিন্তু কার্যত মুঙ্গী কারুর ঘরেই গেল না, কারুর ঘরই করল না। এমনি করে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেল। তার ছেলে মঙ্গল, রুগ্ণ শীর্ণ শরীর নিয়েই দিব্যি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। বাবুদের বাড়ির সুরেশের পাশে তাকে ঠিক যেন চামচিকের মতন দেখায়।

সেদিন মুঙ্গী মেথরানী মহেশবাবুর বাড়ির নর্দমা সাফ করছিল। ক মাসের জঞ্জাল জমা হয়ে রয়েছে। উঠানের ওপর জল জমে যায়। মুঙ্গী নর্দমার মুখে একটা মোটা বাঁশ চালিয়ে দিয়ে নাড়া দিচ্ছিল। গোটা ডান হাতটা নালীর ভেতর ঢুকে রয়েছে। হঠাৎ একটা চাৎকার দিয়ে হাত বার করে আনল। একটা কালো সাপ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে এল, লোকজন মিলে দৌড়ে গিয়ে সাপটাকে মারল। কিন্তু মুঙ্গীকে বাঁচানো গেল না। গোড়ায় গাফিলতি হয়েছিল, ভেবেছে জলঢোড়া সাপ, বিষধর নয়। শেষ-কালে যখন বিষ শরীরে চারিয়ে গেল, জ্বলে যেতে লাগল, তখন বোঝা গেল জলের সাপ নয়— আসল গোখরো।

অনাথ মঙ্গল দিনভর মহেশবাবুর দরজায় ঘুরঘুর করে। ঘরে এঁটোকাঁটা পাতকুড়োনো যা বাঁচে, তা দিয়ে অমন পাঁচ-দশটা ছেলের পেট ভরে যায়। খাবার অভাব হত না। তবে হ্যাঁ, মাটির সান্‌কিতে ওপর থেকে খাবার ফেলে দেওয়া ব্যাপারটা ওর বড়ো খারাপ লাগে। আর সবাই খায় ভালো ভালো বাসনে, ওর বেলায় মাটির তৈরি সান্‌কি।

এমনিতে এ-সব ভেদাভেদ নিয়ে ওর মাথাব্যথা হত না, কিন্তু পাড়ার ছেলেগুলো কেবলই ওকে ক্ষেপায় আর ইচ্ছে ক'রে অপমান

করে। কেউ ওকে নিয়ে খেলতে চায় না। এমন-কি যে কাঁথায় ও শোয় সেটাও অস্পৃশ্য। বাড়ির সামনে একটা নিমগাছ, তারই নিচে মঙ্গলের আস্তানা। একখণ্ড ছেঁড়া কাঁথা, ছুটো মাটির সান্‌কি আর একখানা ধুতি স্থরেশবাবু পরে ফেলে দিয়েছেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই জায়গাটা একই রকম আরামদায়ক। অসহায় মঙ্গল, আগুনঝরা লু, মুষলধারা বৃষ্টি আর হাড়জমানো শীতের মধ্যেও ঐ জায়গায় দিব্যি বেঁচে রইল, বরং আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য ভালো হল। ওর স্বজন বলতে ছিল একজনই। পাড়ার এক নেড়ি কুকুর। তার স্বগোত্রীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এসে মঙ্গলের শরণ নিয়েছিল। ছুজনে একসঙ্গে খায়, এক কাঁথায় শোয়, ছুজনের মেজাজ মোটামুটি একই রকম আর উভয়েই উভয়ের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত। ওদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

গ্রামের ধর্মাত্মা লোকেরা জমিদারবাবুর এবম্বিধ উদারতায় আশ্চর্য হয়ে যান। ঠিক সদর দরজার সামনেই এইভাবে হাড়ির ছেলেটা পড়ে থাকে— বাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাতও হবে না— এ বাপু ষোল আনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার। ছিঃ। এরকম চলতে থাকলে তো ছুদিনেই ধর্মের দফা গয়া-গঙ্গা। ভংগীও যে ভগবানের স্বষ্টি, সেকি আমরা জানি না। তার সঙ্গে কোনোরকম ছুর্বব্যবহার করা আমাদের উচিত নয়, এও সকলের জানা কথা। ভগবানের নামই তো পতিত-পাবন। কিন্তু সমাজের মর্যাদা বলেও তো একটা কথা আছে। জমিদার গাঁয়ের মালিক, তাঁর বাড়ি যেতেই হয়। পা বাড়াতে ঘেন্না হলেও উপায় নেই।

মঙ্গল আর টমির ভেতর বেশ গভীর সৌহার্দ্য ছিল। মঙ্গল বলে — দেখ ভাই টমি, আর একটু সরে শো। নইলে আমি কোথায় শোব বল্। গোটা কাঁথাটা তো তুই দখল করে আছিস।

টমি কুঁইকাঁই করে। সরে শোবার নামও করে না। বরং আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে এবং মঙ্গলের মুখ চাটতে থাকে।

রোজ বিকেলের ঝোঁকে মঙ্গল একবার করে নিজের বাড়ি দেখতে, আর কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে বসে কাঁদতে যায়। খড়ের চাল

প্রথম বছরেই পড়ে গেছে। পরের বছর একটা দেয়াল পড়ল। এখন আস্ত দেয়াল বলতে কিছু নেই। ভাঙাচুরো আধখানা দেয়াল তার ওপরের দিকটা ছুঁচলো হয়ে গেছে। এই ওর সম্পত্তি, ওর স্নেহের উত্তরাধিকার।

এই ওর ভালোবাসার স্মৃতিতীর্থ। এরই আকর্ষণে ও প্রতিদিন একবার করে এখানে আসে, টমি সর্বদাই ওর সঙ্গী। ভাঙা দেয়ালের ওপর চড়ে মঙ্গল তার জীবনের অতীত স্মৃতি আর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়ে যখন মশগুল হয়ে থাকে, টমি তখন তার কোলে চড়ে বসবার নিষ্ফল প্রয়াসে বার বার লাফ দেয় আর ব্যর্থ হয়।

একদিন ছেলেরা জটলা করে খেলছে। মঙ্গলও সেখানে আছে। দূরে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছে। সুরেশের তাকে দেখে দয়াই হল, নাকি খেলার জুড়ি পাচ্ছিল না— ঠিক বলতে পারব না। কারণটা যাই থাক পেছনে, সুরেশ স্থির করল আজ মঙ্গলকে খেলায় নেবে। এখানে কে দেখতে আসছে। 'এই মঙ্গল, খেলবি ?'

মঙ্গল— না ভাই, শেষকালে মালিক দেখতে পেলে পিঠের চামড়া তুলে নেবে। তোমার আর কী, পালিয়ে বাঁচবে।

সুরেশ— তা এখানে কে দেখতে আসছে। চল্ চল্ খেলি গে। আমরা ঘোড়সওয়ার খেলছি। তুই ঘোড়া হবি, আমরা তোর পিঠে চড়ে দৌড় করাব।

মঙ্গল একটু সন্দিগ্ধ হল। বললে— আমি কি বরাবরই ঘোড়া থাকব নাকি। না আমাকেও সওয়ার হতে দেবে ? সেটা আগে বলে দাও।

বড়ো জটিল প্রশ্ন। ও প্রসঙ্গ নিয়ে তো কেউ চিন্তা করে নি। সুরেশ একটু ভেবে বলে— তোকে কে পিঠে বসতে দেবে, বল। তুই একটু ভেবে দেখ। হাজার হোক তুই ভাঙ্গী তো।

মঙ্গল শক্ত হল। বললে— আমি তো বলি নি আমি ভাঙ্গী নই। কিন্তু তুমি আমার মার দুধ খেয়েই বড়ো হয়েছ। আমায় চড়তে না দিলে আমি ঘোড়া হব না। তোমরা ভারি চশমখোর। নিজেরা বেশ সওয়ারী করবে, আর আমি একলাই সব সময়ে ঘোড়া হয়ে

থাকব।

সুরেশ ধমকে বলল— তোমাকে ঘোড়া হতেই হবে। এই বলে সে মঙ্গলকে ধরবার জন্যে দৌড়ল। মঙ্গল পালাচ্ছে, সুরেশও পেছনে ছুটছে। মঙ্গলও জোরে ছোটে সুরেশও গতি বাড়ায়। কিন্তু বেশি খাওয়া-দাওয়া করার ফলে সুরেশের শরীরটা থলথলে, ছুটতে গেলে হাঁফ ধরে যায়।

ও দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁক দিয়ে বলে— মঙ্গল, ভালো চাও তো এসে ঘোড়া হও। নইলে ধরতে পারলে বেদম মারব।

'তোমাকেও ঘোড়া হতে হবে।'

'আচ্ছা আমিও হব।'

'না তুমি পরে মানবে না। আগে তুমি ঘোড়া হও, আমি চাপি, তারপরে আমি ঘোড়া হব।'

সুরেশ আসলে ধাপ্পাই দিচ্ছিল, মঙ্গল ধরে ফেলেছে। মঙ্গলের দাবিদাওয়া শুনে সঙ্গীরা সুরেশকে বললে— দেখছিস, বদমায়েসীটা দেখছিস বেটার। হবে না, ভাংগী তো।

ওরা তিনজনে মিলে মঙ্গলকে ধরে জোর করে তার পিঠে চড়ল। সুরেশই পয়লা সওয়ার। সে মুখে টিকটিক করে আর বলে— চল্ ঘোড়া চল্।

মঙ্গল খানিকদূর গেল। কিন্তু ঐ ভারী বোঝার ভারে তার কোমর ভেঙে যাবার জোগাড়। পিঠটা কুঁকড়ে সুরেশের উরুর নিচে থেকে সরে আসতেই সুরেশ মহারাজ একেবারে চিতপাত। তারপরেই ভেঁপু বাজাতে শুরু করে। সুরেশের কান্না যে শোনে নি, সে বুঝবে না কী বস্তু। ছোটো লাইনের ইঞ্জিনের ভেঁপুর সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ওর মা যেখানেই থাকেন, ছেলের কান্নার আওয়াজে তাঁর টনক নড়বেই। ঝিকে ডেকে বলেন— দেখ তো রে সুরেশ কোথায় কাঁদছে। জিজ্ঞেস কর তো কে মেরেছে। জিজ্ঞেস করতে হল না। সুরেশ চোখ ডলতে ডলতে হাজির হল। কান্নার সুযোগ পেলেই সে নালিশ নিয়ে মার আদালতে হাজির হয়। মা অমনি মোণ্ডা মেঠাই এনে শোক ভুলিয়ে দেন। ফলে,

আট বছর বয়সেও প্রভু একেবারে গোবর গণেশ। অতিরিক্ত আহারে তার দেহ, আর অতিরিক্ত আদরে তার বুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে।

মা প্রশ্ন করেন— কাঁদছিস কেন রে, কে মেরেছে?

সুরেশ— মঙ্গল ছুঁয়ে দিয়েছে।

কথাটা মার বিশ্বাস হয় না। মঙ্গল এতই নিরীহ প্রকৃতির, যে তার দ্বারা কোনো দুষ্টুমি-নষ্টামির সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু সুরেশ যখন দিব্যি গেলেছে, তখন তার কথা বিশ্বাস করতেই হয়। মঙ্গলকে ডেকে ধমক দিলেন— কীরে, বজ্জাতি শিখছিস, না? বলে দিয়েছি না সুরেশকে কখনো ছুঁবি না? মনে নেই? মনে আছে কিনা বল।

মঙ্গল চাপা গলায় বলে— মনে থাকবে না কেন।

'তাহলে ওকে ছুঁলি কেন?'

'আমি ছুঁই নি।'

'ছুঁস নি তো ও কাঁদছে কেন?'

'পড়ে গেছে বলে কাঁদছে।'

আবার মিছে কথা! মাঠাকরুণ মোক্ষম রেগে গেলেন। ছড়ি দিয়েও যদি পিটতে চান, তবুও অসময়ে চান করতে হবে। অশুচির তড়িৎপ্রবাহ তো আর ছড়ির বাধা মানবে না। কাজেই দাঁতে দাঁত চেপে একটু ধাতস্থ হলেন। আর গালাগালে যতটা কুলোয় বাকি রাখলেন না। তারপর হুকুম দিলেন— এক্ষুনি এখান থেকে দূর হয়ে যা। ফের যদি এমুখো হবি, তো খুন করে ফেলব। দুবেলা বসে খেয়ে খেয়ে বাড় বেড়ে গেছে না? ইত্যাদি।

মঙ্গলের আর নতুন করে ক্ষতি কী হবে। সে ভয়ে ভয়ে ছেঁড়া কাঁথা আর মেটে সানকি বগলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আর কখনো এমুখো হবে না। মরে গেলেও না। কী আর হবে। বড়জোর না খেতে পেয়ে মরে যাবে তো। তা এ রকম বেঁচে থেকে লাভ কী। গ্রামে হাড়ির কোনো আশ্রয় নেই। মঙ্গলের কোনো ঠিকানা নেই। সে তার ফেলে আসা দিনের সোনার স্মৃতি-জড়ানো ভাঙা কুঁড়েতেই ফিরে গেল। সেখানে বসে বসে মঙ্গল ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদে। আবার স্মৃতি এসে ওর বেদনা ভোলায়। টমিও ওকে খুঁজতে খুঁজতে খানিক পরেই এসে হাজির হল। ওরা দুজনে একত্র হবার পর দুঃখ ভুলতে বেশি সময় লাগে না।

চার

কিন্তু দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের আত্ম-গ্লানিও ক্ষীণ হয়ে আসে। ওই বয়েসের খিদে। কিছু না পেলে শরীরের রস-রক্ত খায়। তাই খেয়ে খিদে আরো মজবুত হয়। চোখে আপনা থেকেই মেটে সানকির ওপর গিয়ে পড়ে। ওখানে থাকলে এতক্ষণে সুরেশের পাতের মেঠাইটা আসটা জুটতো। এখানে খাবেটা কী— হরিমটর?

টমির সঙ্গে পরামর্শে বসে— কী খাবি রে টমি, আমার তো হরিবাসর।

টমি কুঁই কুঁই করে। সম্ভবত বলতে চায়— ওহে, এরকম অপমান তো অঙ্গের ভূষণ, জীবনভরই থাকবে। ওতে ভেঙে পড়লে চলবে কী করে। আমাকে দেখে শেখো না, কত ডাণ্ডা, কত চোখ-রাঙানি, গালমন্দ, আবার খানিক পরে ঘুরে ফিরে লেজ নাড়তে নাড়তে ঠিক একই জায়গায় গিয়ে হাজির হই। তোমার আমার জন্মই তো এই করতে ভাই।

মঙ্গল— তা তুমি যাও না, যা জোটে খাও গে। আমার চিন্তা করতে হবে না।

টমি তার সারমেয় ভাষায়:জবাব দেয়— তা কী হয়। আমি একলা যাই কী করে, তোমায় সঙ্গে করেই যাব।

'আমি যাব না।'

'তা হলে আমিও যাব না।'

'না খেয়ে মরবে যে?'

'তুমিই কি বাঁচবে?'

'আমি মলে কাঁদবার কেউ নেই।'

টমি বলে— আমারও একই দশা রে ভাই। আশ্বিন মাসে যে কুত্তীটার সঙ্গে পিরীত জমিয়েছিলুম, সে বিশ্বাসঘাতিনী এখন কাল্লুর ঘর করছে। মন্দের ভালো যে ছ্যানাপোনাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গ্যাছে, নইলে আর এ্যাদিনে ন্যাজ নেড়ে বেড়াতে হত না। পাঁচ পাঁচটা ছ্যানাকে কে খাবার জোগাত।

খানিক পরেই খিদে আবার যুক্তি খুঁজে বার করে।

'মাঠান হয়তো আমায় খুঁজছে, কী বল টমি।'

'তা তো খুঁজবেই। বাবুজির আর সুরেশের খাওয়া হয়ে গেছে। কাহার তাদের পাত কুড়িয়ে এঁটোকাটা নিয়ে আমাদের ডাকাডাকি করছে।'

'বাবুজি আর সুরেশের পাতে ঘিটা একটু বেশি মাত্রায় থাকে। আর সেই যে মিষ্টি মিষ্টি জিনিসটা— কী যেন? হ্যাঁ মালাই।'

'আহা সব আস্তাকুঁড়ে যাবে গো।'

"দেখি না কেউ খুঁজতে আসে কিনা।"

"খুঁজতে আবার কে আসবে! তুমি কি পুরুত ঠাকুর? একবার ছুবার 'মঙ্গল, মঙ্গল' বলে হাঁক পাড়বে, তারপর পাতা নিয়ে আদাড়ে ফেলে দেবে।"

'আচ্ছা চল্ তা হলে যাই। আমি কিন্তু আড়ালে থাকব। আমায় নাম ধরে না ডাকলে আমি কিন্তু ফিরে চলে আসব। এই বলে রাখলুম।'

ছু'জনে আবার মহেশনাথের দেউড়ির সামনে হাজির হয়। টমির আর তর সয় না। সে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেখে মহেশবাবু আর সুরেশ খেতে বসেছে। দেখে টমি চুপচাপ ছাঁচতলায় বসে পড়ে। বসল তো, এদিকে মনে মনে ভয়, কেউ ছু'ঘা বসিয়ে না দেয়।

চাকরদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। একজন বললে— আজ মংলাটাকে দেখতে পাচ্ছি না তো। মাঠান বকেছিলেন বলে ভেগেছে বোধ হয়।

দ্বিতীয় জন বলে—আপদ গেছে। সকালবেলায় রোজ হাড়ির

মুখ দেখতে হয়।

মঙ্গল আরো গাঢ় আঁধারে গা ঢাকা দেয়। তার মনের আশা ভরাডুবি হয়ে যায়।

মহেশবাবুর আহার সাঙ্গ হল। চাকরে হাত ধুইয়ে দিচ্ছে। এবার গড়গড়া টানবেন, তারপর শুতে যাবেন। সুরেশ মার কাছে বসে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে। গরিব মঙ্গলের কথা ভাববার কে আছে বল। এতখানি রাত হয়ে গেল, কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলে না—কী খেলি।

মঙ্গল খানিকক্ষণ হতাশ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে যাবে যাবে করছে, দেখে, কাহার একটা পাতায় থালার উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছে। মঙ্গল অন্ধকার থেকে আলোতে আসে। আর মনকে চোখ ঠারা যায় না।

কাহার বলে— আরে তুই এখানে? আমি বলি তুই কোথায় চলে গেলি। নে খেয়ে নে। ফেলতে নিয়ে যাচ্ছিলুম।

মঙ্গল করুণ কণ্ঠে বলে— আমি তো অনেকক্ষণ থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

'তা এতক্ষণ বলিস নি কেন?'

'মারের ভয়ে।'

'আচ্ছা নে খেয়ে নে। কাহার পাতা তুলে নিয়ে মঙ্গলের হাতের ওপর আলগোছে ফেলে দেয়। মঙ্গল কাঙালীর মতো দাতার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে।

টমিও ভেতরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এবার দুজনে গিয়ে নিমগাছের তলায় পাত পেতে বসে।

মঙ্গল খেতে খেতে টমির মাথায় হাত বুলোয়। বলে—দ্যাখ টমি, পেটের জ্বালা কী জিনিস। লাথি ঝাঁটা মেরেও এই যে দুটো পাত কুড়োনো দিচ্ছে এও যদি না জুটত কী করতিস?

টমি সম্মতিসূচক লেজ নাড়ায়।

'সুরেশকে আমার মা বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছে।'

টমি লেজ নাড়ে।

'লোকে বলে, দুধের দেনা শোধ করা যায় না। কেন করা যাবে না? এই তো ওরা আমার মা'র দুধের দাম আমাকে শোধ করে দিচ্ছে।'

টমি আবার লেজ নাড়ে॥

দুই বলদের কাহিনী

লোকে বলে জীবজগতে গাধাই হল সবচেয়ে বেশি নির্বোধ। কোনো মানুষকে পয়লা নম্বরের নিরেট আহাম্মক বলে স্থির করলে, নিয়মমাফিক আমরা তাকে গাধা উপাধি দিই। গাধা সত্যই বেকুব, নাকি ও উপাধিটা তার সরল স্বভাব আর নির্বিরোধী সহিষ্ণুতার পুরস্কার, নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। গোরু শিং দিয়ে গুঁতোয়; সদ্য বিয়োনা গাই তো সিংহিনীর মতো শিং নেড়ে তেড়ে আসে। কুকুরও বড়োই অসহায় জীব, তবু কখনো-সখনো তারও রাগ হয়। কিন্তু গাধাকে কেউ কখনো রাগ করতে দেখে নি, বা শোনেও নি। বেচারাকে যতখুশি মার, যত পার পচাগলা ঘাস খেতে দাও, তার মুখে অসন্তোষের চিহ্নও দেখতে পাবে না। বোশেখ মাসে এক-আধবার প্রমোদ কেলি করা ছাড়া আর অন্য সময় তাকে কখনো হাসিখুশি করতেও দেখি নি। তার মুখে সদাসর্বদাই একটা স্থায়ী বিষাদের ছায়া। সুখেদুঃখে, লাভে-ক্ষতিতে, কোনো অবস্থাতেই তার কোনো পরিবর্তন আমার চোখে পড়ে নি। মুনি-ঋষিদের যা যা গুণ, তার সব কিছুরই পরাকাষ্ঠা গাধার মধ্যে দেখা যায়, অথচ মানুষ তাকে বেকুব বলে। সদ্‌গুণরাশির এমন সমাদর বড়ো একটা দেখা যায় না। সম্ভবত সারল্য জিনিসটা পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী নয়। এই দেখুন-না, আফ্রিকাতে ভারতবাসীদের কী দুর্দশাই-না হচ্ছে। কেন, তাদের কি আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া যেত না? বেচারারা মদ খায় না, অসময়ের জন্যে দুটো পয়সা বাঁচিয়ে রাখে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, কারুর সঙ্গে ঝগড়া ফ্যাসাদ করে না, কারুর সাতেপাঁচে থাকে না, দু-কথা কেউ বললেও মুখ বুজিয়ে থাকে। তবু তাদের বদনাম। বলে, তারা জীবনের মান নিচু করে ফেলে। তারাও যদি ঢিলটি খেলে পাটকেলটি ছুঁড়তে শিখত, তা হলে হয়তো সভ্য বলে পরিচিত হত। জাপানের দৃষ্টান্ত সামনেই রয়েছে। একবার

যুদ্ধজয় করেই দুনিয়ার সভ্যজাতিদের মধ্যে তার স্থান হয়ে গেছে।

তবে গাধার এক দোসর আছে। তার চেয়ে এক ধাপ নিচে। সে হল 'বলদ'। গাধা শব্দটা যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়, প্রায় তার অনুরূপ ইঙ্গিতবহ আর-একটি শব্দ হল 'বাছুরের জ্যেঠামশায়'। কেউ কেউ হয়তো বলদকেই বেকুবদের শিরোমণি বলে গণ্য করবেন, তবে আমার মত আলাদা। বলদ কখনো সখনো গুঁতোয়, আবার বেশ আড়িয়াল ধরনের বলদও দেখা যায়। আরো কিছু কিছু পদ্ধতিতে বলদ তার অসন্তোষ প্রকট করে থাকে। কাজেই আমি তো বলব, তার স্থান গাধার একধাপ নিচে।

ঝূরী কাচ্ছীর দুটো বলদ ছিল। তাদের নাম হীরা আর মোতী। দুটোই পশ্চিমা জাতের— দেখতে সুন্দর, কাজে চৌকস, বেশ উঁচু কাঠামো। অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে ভারি ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল। দুটোতে পাশাপাশি বা মুখোমুখি বসে বসে পরস্পর নিঃশব্দে ভাববিনিময় করত। একে অপরের মনের মনের কথা কেমন করে ঠাহর করত, তা আমি বলতে পারব না। নিশ্চয়ই ওদের কোনো গুপ্তশক্তি ছিল, জীবজগতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সত্ত্বেও মানুষের যা ছিল না। ওরা এ ওকে চেটে কিংবা শুঁকে ভালোবাসা জাহির করত। কখনো কখনো দুজনে শিঙে শিঙ লাগিয়ে ঠেলাঠেলিও করত। তবে সেটা আদৌ বিরোধ নয়, নেহাৎই আমোদের ব্যাপার, বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হলেই যেমন একটু কিলটা-চড়টা হয়ে থাকে। তা না হলে বন্ধুত্ব কেমন যেন ফিকে থাকে, ফস্‌ফস্‌ করে, তাতে তেমন যেন আঁট থাকে না, ভরসা থাকে না। লাঙলে কিংবা গাড়িতে দুই বলদকে একসঙ্গে জোতা হলে, ওরা বেশ ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে চলত। দুজনেই চেষ্টা করত যেন বেশির ভাগ ওজনটা তার নিজের কাঁধে থাকে। দুপুরে হোক সন্ধেয় হোক, জোয়াল খুলে জিরোবার সময়ে এ ওর গা চেটে দিয়ে ক্লান্তি দূর করত। নাদায় খোল-ভুসি পড়ার পর দুই স্যাঙাত একসঙ্গে নাদায় মুখ ডোবাত, একজন মুখ তুললে অন্যজনও সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে নিত। একবার ঝূরী বলদজোড়াকে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠায়।

তা বলদরা কী করে জানবে, কোথায় যাচ্ছে কেন, পাঠানো হচ্ছে। মনে করল, মালিক বুঝি বেচে দিয়েছে ওদের। তা ওদের নিয়ে এরকম বেচাকেনা ওদের ভালো লাগল কি মন্দ লাগল, তা আর কে জানতে যাচ্ছে, কিন্তু ঝুরির শালা বলদ নিয়ে যেতে এসে হিমসিম খেয়ে গেল। পেছন থেকে হাঁকে তো ডাইনে বাঁয়ে ছোটে। সামনে থেকে টানে তো পেছনে হাঁটে। মারলে, দুটোই একসঙ্গে শিং নিচু করে হুংকার ছাড়ে। বোধহয় ভগবান ওদের মানুষের ভাষা দিলে ঝুরীকে গিয়ে বলত— 'আমরা তো তোমার সেবা করতে কোনো কসুর করি নি, তবে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়াছ কেন। এত মেহনত করি, তাতেও যদি না হয়, তো নয় আরো খাটিয়ে নাও। তোমার চাকরিতে আমরা তো মরে যেতেও রাজি আছি। আমরা কখনো ঘাসখড় নিয়ে বায়না করি নি। তুমি যা খেতে দিয়েছ, মাথা হেঁট করে খেয়ে নিয়েছি, তবে তুমি এই জহ্লাদটার হাতে আমাদের তুলে দিলে কেন?'

নতুন জায়গায় পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। সারাদিন পেটে দানাপানি পড়ে নি। কিন্তু যখন নাদে জাবনা দিয়ে গেল দুজনের কেউ খাবারে মুখ দিল না। এতদিন যে-বাড়িকে নিজেদের বাড়ি ভাবত, আজ ওরা সেখান থেকে অনেকদূরে। নতুন বাড়ি, নতুন গাঁ, নতুন লোক— ওদের কাছে সব-কিছু পর পর লাগছিল।

ওরা নিজেদের মূক ভাষায় কী সব পরামর্শ করে। চোখ টেপাটিপি করল। তারপর শুয়ে পড়ল। গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, দুজনে তড়াক করে উঠে, একটানে গলার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে ঘরের দিকে ছুটল।

বেজায় মজবুত দড়ি, ছেঁড়ার সাধ্যি যে কোনো বলদের হতে পারে, এটা কেউ আন্দাজ করতে পারে নি। কিন্তু ওদের গায়ে তখন হাতির বল, এক-এক ঝটকায় রশি ছিঁড়ে ফাঁক।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঝুরী দেখে দুই বলদ ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে। তাদের গলায় আধছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। হাঁটু অব্দি কাদায় প্যাঁকে বোঝাই, আর চোখের ভাষায় বিদ্রোহ, অভিমান, আর

ভালোবাসা।

ঝুরী বলদদের দেখে স্নেহে উতলা হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরল। সে এক চোখ-জুড়োনো দৃশ্য। বাড়ির ছেলেরা, পাড়ার ছেলেরা সবাই জড় হয়ে গেল, হাততালি দিয়ে হীরা-মোতীকে স্বাগত জানাতে লাগল। গ্রামের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটল তা নয়, কিন্তু সচরাচর ঘটে না। শিশুপালসভায় স্থির হল এই যুগল পশুবীরকে মানপত্র দিতে হবে। কেউ বাড়ি থেকে রুটি আনে, কেউ গুড়, কেউ চুনি, কেউ বা ভুষি।

একজন বলে— এমন বলদ আর কারো নেই।

দ্বিতীয় তাকে সমর্থন করে— এত দূরের পথ দুজনে একলা চলে এসেছে।

তৃতীয় জন বলে—বলদ নয়, ও-জন্মে নিশ্চয় ওরা মানুষ ছিল।

এ-কথার প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না কারুর।

বলদ দুটোকে উঠোনে দেখামাত্র ঝুরীর বউ একেবারে জ্বলে উঠল। বললে— কী রকম নেমকহারাম বলদ দেখেছ। একটা দিন ওখানে কাজ করল না। ঠিক পালিয়ে এসেছে।

বলদদের ওপর এরকম অভিযোগ ঝুরীর সহ্য হল না। বললে— নেমকহারাম হবে কেন, খেতেটেতে দেয় নি বোধ হয়, তাই চলে এসেছে— কী করবে।

তার বউ রেগে উঠে বললে— হ্যাঁ হ্যাঁ, বলদকে খাওয়াতে এক তুমিই শিখেছ, আর সবাই জল খাইয়ে রাখে।

ঝুরী রাগাবার জন্যে বলে— খেতে পেলে পালাবে কেন?

বউ আরো রেগে ওঠে— পালিয়ে আসবে না। তারা তো আর তোমার মতন উজবুক নয় যে বলদকে কোলে করে আদর করবে। খাওয়াতেও জানে, আবার তেমনি কসে খাটিয়েও নিতে জানে। আর এই দুটো জুটেছে দুনিয়ার নিষ্কম্মা, ভেগে পড়েছে। দাঁড়া, তোদের দেখাচ্ছি, আজকে তোদের খোল-ভুষি দেয় কে দেখব আমি। শুকনো খড় খাইয়ে রাখব, আর কিছু দেব না, খাবি খা, না খাবি মর্।

তাই হল। মজুরকে কড়া হুকুম দেওয়া হল বলদদের যেন শুকনো

খড় ভুষি দেওয়া হয়।

দুই বলদ নাদায় মুখ দিয়ে দেখে পানসে লাগছে। রসকসও নেই, চেকনাইও নেই। স্বাদ লাগে না। খাবে কী? আশা-ভরা চোখে দোরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝুরী মজুরকে ডেকে বলে— একটু-খানি খোল নিয়ে গিয়ে ফেলে দে-না।

মজুর বললে— মালকিন্ তা হলে মেরেই ফেলবে।

'চুরি করে নিয়ে আয়-না।'

'না দাদা, শেষে তুমিই আবার গিয়ে বলে দাও।'

দুই

পরদিন ঝুরির শালা আবার এল। এবার বলদদের গাড়িতে জুতে নিয়ে চলল।

মোতী দু-চারবার গাড়িসুদ্ধু রাস্তার কিনারে নালার মধ্যে উলটে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হীরা সামলে নিল। তার সহিষ্ণুতা কিছু বেশি।

সন্ধের সময় বাড়ি পৌঁছে ঝুরির শালা একটা মোটা কাছি দিয়ে দুটো বলদকে বেঁধে রাখল। তারপর কালকের ত্যাঁদড়ামির শোধ তুলল। নিজের বলদজোড়াকে খোল, চুনি, ভুষি সব-কিছু খাওয়াল। আর হীরা-মোতীর বরাদ্দ সেই শুকনো ভুষি।

ওদের বলদজীবনে এর চেয়ে বড়ো অপমান আর কখনো হয় নি। ঝুরী ওদের গায়ে ফুলের ছড়িও ছোঁয়ায় নি কোনোদিন। ঝুরী জিভের ডগায় আওয়াজ করলেই ওরা উড়তে থাকে, এখানে ওদের পিঠে মার পড়েছে। একে তো অপমানের ব্যথা তার ওপর শুকনো ভুষি! ওরা নাদার দিকে ফিরেও চাইল না।

পরদিন সকালে গয়া ওদের হালে জুতল, কিন্তু ওরা বোধ হয় কসম খেয়েছিল, একটা পা তুলল না। গয়া মারতে মারতে হয়রান হয়ে গেল, ওরা অচল অটল। শেষে যখন পাষণ্ডটা হীরার নাকের ওপর খুব জোরে এক-ঘা মেরেছে, তখন মোতীর রাগ চরমে উঠে গেল।

হালটাল সুদ্ধ দে ছুট্। লাঙল, ফাল, জোয়াল, রশি ভেঙেচুরে সব একাকার। গলায় বড়ো বড়ো দড়ি বাঁধা না থাকলে তাদের ধরার সাধ্য ছিল না কারো।

হীরা মূক ভাষায় বললে— দৌড়োনো ভুল হয়েছে।

মোতী জবাব দিলে— তোকে তো নিকেশ করে এনেছিল।

'এবার খুব পিটবে।'

'পিটুক গে, বলদ হয়ে জন্মেছি, মার তো খেতেই হবে।'

'গয়া আরো দুজনকে নিয়ে ছুটে আসছে। দুটোর হাতেই লাঠি।'

মোতী বললে— বলিস তো একবার মজা দেখিয়ে দিই। লাঠি আনা বের করে দিই।

হীরা বুঝিয়ে বলে— না রে ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়।

'আমাকে মারলে আমিও দুটোকে তুলে আছাড় দেব।'

'না রে, আমাদের জাতের ধর্ম তা নয়।'

মোতী রুষ্টচিত্তে বসে পড়ল। গয়া এসে ওদের ধরে নিয়ে চলল। বরাত ভালো যে এবার আর মারধর করলে না, নাহলে মোতীও এবার ছেড়ে কথা কইত না। বোধ হয় তার ভাবগতিক দেখেই গয়া আর তার সঙ্গীরা বুঝে ফেলেছিল যে এবারের মতন চুপ মেরে থাকাই মঙ্গল।

আজও ওদের সেইরকম শুকনো ভুষি খেতে দেওয়া হল। ওরাও চুপচাপ পড়ে রইল। বাড়ির লোকেরা খেতে গেল। এইসময় একটা ছোট্ট মেয়ে দুটো রুটি হাতে করে বেরিয়ে এল। আর ওদের মুখে দিয়ে চলে গেল। ওই একটা রুটিতে ওদের আর কী হবে, পেটের খিদে মিটল না, কিন্তু মনের খিদে পরিতৃপ্ত হল। অন্তত এবাড়িতেও ভদ্র মানুষের বাস আছে তা বোঝা গেল। মেয়েটা হল ভৈঁরোর মা-মরা মেয়ে। সৎমা ওকে খুব মারত, তাই হীরা-মোতীর সঙ্গে ওর একধরনের আত্মিক সখ্য হয়ে গিয়েছিল।

ওরা দিনভর ক্ষেত চষে, ডাণ্ডা খায়, রুখে দাঁড়ায়। সন্ধেবেলায় গোয়ালে বাঁধা থাকে, রাত্তিরে সেই মেয়েটা এসে দুটো রুটি খাইয়ে যায়। অনুরাগের এই দানের এত শক্তি যে দু-গাল করে শুকনো

ভুষি চিবিয়েও ওরা দুর্বল হয়ে পড়ল না। কিন্তু ওদের অন্তরে, ওদের চোখে মুখে, প্রত্যেক লোমকূপে বিদ্রোহের বারুদ ঠাসা রইল।

একদিন মোতী আবার বোবা ভাষার দুঃখু করল— হীরা রে, আর যে সহ্য হয় না।

'কী করতে চাস ?'

'দুটো-একটাকে শিঙে তুলে আছাড় দিই।'

'কী জানিস, ঐ যে ফুটফুটে সোনার মেয়েটা আমাদের রোজ রুটি খাইয়ে যায় ওরই বাপ এ বাড়ির মালিক। মেয়েটা যে অনাথ হয়ে যাবে।'

'তা হলে বাড়ির গিন্নিটাকেই নাহয় আছাড় দিই, কী বল। ঐটাই তো মেয়েটাকে মারে।'

'কিন্তু মেয়েছেলের গায়ে শিং তোলা বারণ, মনে নেই ?'

'দুর, তোর জ্বালায় কিছুই করার উপায় নেই! তা হলে বল, দড়ি ছিঁড়ে ভেগে পড়ি।'

'হ্যাঁ, তাতে আমি এক্ষুনি রাজী। কিন্তু এই মোটা দড়ি ছিঁড়বি কী করে ?'

'তার একটা উপায় আছে। আগে দড়িটা একটু চিবিয়ে নে। তারপর ঝটকা মারলেই ছিঁড়ে যাবে।'

রাত্তিরে মেয়েটা রুটি খাইয়ে চলে যাবার পর, দুই বন্ধুতে দড়ি চিবোতে লেগে গেল। কিন্তু মোটা কাছি মুখে আঁটে না। বেচারারা অনেক চেষ্টা করেও পেরে উঠল না।

হঠাৎ ঘরের দোর খুলে সেই মেয়েটাই আবার বেরিয়ে এল। ওরা মাথা নিচু করে ওর হাত চেটে দিল। দুজনেরই লেজ খাড়া হয়ে গেল। মেয়েটা ওদের ঘাড়ে গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল— খুলে দিচ্ছি। চুপিচুপি পালিয়ে যা। নইলে এরা মেরে ফেলবে। আজ ঘরে পরামর্শ হচ্ছিল, যে তোদের নাকে কড়া পরিয়ে দেবে।

মেয়েটা ওদের গলার দড়ি খুলে দিতেও ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মোতী নিজেদের ভাষায় জিজ্ঞেস করল— কী হল,

যাবি না নাকি।

হীরা বলে— যাব তো। কাল এই অনাথ মেয়েটার দুর্গতির এক শেষ হবে। সবাই ওকেই সন্দেহ করবে।

হঠাৎ মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল— ও বাবা, বাবা, পিসেমশায়ের বলদ দুটো পালাল, ঐ পালিয়ে গেল, ছুটে এসো…

গয়া হকচকিয়ে ভেতর থেকে বেরোতেই হীরা মোতী পালাল। গয়া যত দৌড়োয় ওরাও তত দৌড়োয়। গয়া হাঁকডাক শুরু করল। তারপর গ্রামের কিছু লোককে সঙ্গে নেবে বলে একবার বাড়ির দিকে ফিরল। দুই বন্ধুর আরো সুযোগ হয়ে গেল। সিধে দৌড় লাগাল। এমন দৌড়লো যে রাস্তার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান রইল না। যে পথ দিয়ে এখানে এসেছিল, সেই চেনা পথের দিশা পেল না। এপথে নতুন নতুন গ্রাম। শেষকালে দুজনে একটা ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল— এখন কী করা উচিত।

হীরা বলে— মনে হচ্ছে রাস্তা হারিয়েছি।

মোতী — তুই তো বেহুঁশের মতন ছুট্ লাগালি। ওটাকে মেরে ফেলে দিলেই লেঠা চুকে যেত।

হীরা— ওকে মেরে ফেললে লোকে কী বলত। সে তার ধর্ম ছেড়েছে বলে কি আমরাও অধর্ম করব?

এদিকে ক্ষিদেয় দুজনের জান যায়। ক্ষেতভরা মটরের শাক। চরতে লাগল। এক-একবার কান খাড়া করে শোনে, কেউ আসছে না তো!

পেট ভরা খাবার পর, দুজনে মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে খুব খানিক নাচল কুঁদল। প্রথমে বেশ আওয়াজ করে ঢেঁকুর তুলল। তারপর শিঙে শিং বাধিয়ে ঠেলাঠেলি খেলল। মোতী হীরাকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে নালার ধারে নিয়ে গেল। পরে গিয়ে হীরার হল রাগ। সেও ঠেসে ধরল। মোতী দেখল খেলার থেকে ঝগড়া হবে— একধারে সরে দাঁড়াল।

তিন

আরে এ কী রে ভাই, একটা ষাঁড় না? হাঁকার মারতে মারতে এদিকে ছুটে আসছে যেন। আরে এ যে দেখছি সামনে এসে পড়েছে। দুই বন্ধু এ-পাশ ও-পাশ তাকায়। ষাঁড়টার হাতির মতন গতর। ওর সঙ্গে লাগতে গেলে শিঙে ফুঁকতে হবে। কিন্তু না লেগেও উপায় নেই। ষাঁড় ওদের দিকেই তেড়ে আসছে। ওদের ছাড়বে না। উঃ কী ভয়ানক চেহারা।

মোতী নিজেদের ভাষায় বলল— বেগতিক। জান বাঁচাবি কী করে? উপায় বার করতে হয়।

হীরা উদ্‌বিগ্ন স্বরে— বেটার বড়ো দেমাক, কাকুতি-মিনতি করলে শুনবে না।

'পালাই চল্ না।'

'ধেৎ, পালাব কেন কাপুরুষের মতন?'

'তা হলে মর্ এখানে দাঁড়িয়ে। এ শর্মা কাট মারছে।'

'দাঁড়া দাঁড়া, যদি তাড়া করে?'

'তা হলে শীগ্‌গিরই কিছু ফন্দি বার কর।'

'উপায় একটাই। দুজনে মিলে একসঙ্গে হামলা করা। আমি সামনে থেকে চোট দেব, তুই পেছন থেকে। দুদিক থেকে মার পড়লে পালাতে পথ পাবে না। যেই আমার দিকে তেড়ে আসবে তুই পাশ থেকে পেটের ভেতর শিং ঢুকিয়ে দিবি। জানের ঝুঁকি নিয়ে লড়তে হবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।

প্রাণ হাতে করে দুই বন্ধু ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ষাঁড় পড়ল বেগতিকে। এর আগে একক শত্রুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ সে অনেক করেছে। কিন্তু এমন সংঘবদ্ধ প্রতিপক্ষের সংঘর্ষে সে অভ্যস্ত নয়। যেই হীরার ওপর পড়ে, মোতী পেছন থেকে তাড়া করে। ষাঁড় তার দিকে ফিরলেই হীরা শিং দিয়ে ঢুঁ মারে। ষাঁড়ের ইচ্ছেটা দুটোকে আলাদা আলাদা করে পেড়ে ফেলবে। কিন্তু ও দুটো আসল ওস্তাদ। তাকে সে-রকম কোনো সুযোগই দেয় না। একবার

ষাঁড় ভাবল হীরাকে নিকেশ করে ছাড়বে, সে হীরার ওপর পড়তেই মোতী এসে পাশ থেকে পেটে শিং ঢুকিয়ে দিল। ক্রুদ্ধ ষাঁড় পেছন ফিরতেই সঙ্গে সঙ্গে হীরা উলটো দিক থেকে পেটের অন্য পাশে শিং ফুটিয়ে দিলে। শেষ পর্যন্ত বেচারা ঘায়েল হয়ে পালাল আর দুই বন্ধু বহুদূর অব্দি তাকে তাড়া করে গেল। শেষে ষাঁড়টা বেদম হয়ে পড়ে গেল। তখন ওরা তাকে ছেড়ে দিলে।

বিজয়গর্বে উল্লসিত দুই বন্ধু হেলতে দুলতে চলেছে।

মোতী ওদের সাংকেতিক ভাষায় বলে— আমার তো সাধ যাচ্ছিল দিই বেটাকে সাবাড় করে।

হীরা বকে দিল— ছিঃ, শত্রু পড়ে গেছে, তার ওপর শিং চালাবি। মোতী বলল— ও-সব ভণ্ডামির কথা। শত্রুকে এমন মার মারতে হয় যাতে আর উঠতে না পারে।

হীরা— এখন কী করে বাড়ি ফেরা যায়, সেই চিন্তা কর।

মোতী— আগে কিছু খাওয়া যাক, তারপর ভাবব।

সামনেই মটরের ক্ষেত। মোতী ঢুকে পড়ল। হীরা বারণ করছিল কিন্তু শুনল না। সবে দু-চার গরাস মুখে দিয়েছে কী দু-দিক থেকে দুজন লোক লাঠি নিয়ে এসে ওদের দুই বন্ধুকে ঘিরে ফেলল। হীরা ছিল আলের ওপর, কেটে বেরিয়ে এল। মোতী জল ছেঁচা ভিজে মাটির ক্ষেতে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ক্ষুর কাদায় ডুবে যেতে লাগল। ছুটে পালাতে পারল না। ধরা পড়ে গেল। হীরা দূর থেকে দেখল সঙ্গী বিপদে পড়েছে, দেখে ফিরে এল। ফাঁসলে দুজনে একসঙ্গে ফাঁসব। রাখালরা ওকেও ধরে ফেলল।

পরদিন সকালে দুই সঙ্গীকে খোঁয়াড়ে বন্দী করা হল।

চার

জীবনে এই প্রথমবার দুই বন্ধুর এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হল— সারাটা দিন চলে গেল এক কণা খাবারও জুটল না। ওরা বুঝতেই পারছিল না যে এ কোন্ পাষণ্ডর হাতে পড়ল। এর তুলনায় গয়া

তো দেবতা। এই নতুন অতিথিশালায় গোটা কয়েক মোষ, কটা ছাগল, কটা ঘোড়া আর কটা গাধা ছিল ওদের সঙ্গে সহবন্দী। কারুর সামনে একগাছা ঘাসও ছিল না। সব মড়ার মতন মাটিতে পড়েছিল। কেউ কেউ এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে দাঁড়াবারও শক্তি নেই। সারাদিন হীরা-মোতী একদৃষ্টে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কেউ জাব নিয়ে আসে না। তখন দুজনে দেওয়ালের নোনামাটি চাটতে শুরু করে। কিন্তু তাতে কি ক্ষিদের শান্তি হয়?

রাত্তিরেও যখন কিছু জুটল না তখন হীরার মনে বিদ্রোহের জ্বালা ধরল। বলল— মোতী রে, আর তো থাকতে পারি না।

মোতী ঘাড় গুঁজে জবাব দিল— আমার মনে হচ্ছে প্রাণটা এবার বেরিয়ে যাবে।

'অত দমে যাস নি, পালাবার একটা পথ বার করতে হবে।'

'আয়, দেয়াল ভেঙে ফেলি।'

'আমার দ্বারা এখন আর কিছু হবে না।'

'বাঃ হয়ে গেল! এই তাকত নিয়েই বড়াই।'

'সব বড়াই বেরিয়ে গেছে ভাই।'

কাঁচা মাটির দেয়াল। হীরার গায়ের জোর তো রয়েছেই, ছুঁচলো শিং দেয়ালে গিঁথে দিয়ে জোরসে এক চাপ দিতেই একটা চাঙড়া খসে পড়ল। উৎসাহ বেড়ে গেল। ছুটে ছুটে এসে দেয়ালের ওপর ধাক্কা মারতে লাগল। প্রতিবারই একটু একটু করে মাটি খসতে থাকল।

ঠিক এই সময়ে খোঁয়াড়ের চৌকিদার লণ্ঠন হাতে নিয়ে জানোয়ারদের হাজরি নিতে আসছিল। এসে ঐ কাণ্ড দেখে হীরাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে মোটা রশি দিয়ে বেঁধে রেখে গেল।

মোতী পড়েইছিল। বললে— সেই মার খেতে হল। লাভটা কী হল।

'সাধ্যে যতটা কুলোয় ঘা তো মেরেছি।'

'ওরকম ঘা মেরে কী লাভ, যাতে বাঁধন আরো শক্ত হয়?'

'বাড়ে বাড়ুক বাঁধন, ধাক্কা মেরেই যাব।'

'জানে মরতে হবে।

'পরোয়া নেই। এমনিও মরতে হবে, ওমনিও মরব। ভেবে দেখ্‌ দেয়ালটা পড়ে গেলে কতগুলো জীবন বেঁচে যায়। এতগুলো প্রাণী এখানে পড়ে রয়েছে। না খেয়ে খেয়ে ওদের আর কিছু নেই। এই রকম আর দু-চারদিন গেলেই সবকটা মরবে।'

'সে তো ঠিক কথা। আচ্ছা নাও, এবার আমিও লাগাই ঘা কয়েক গুঁতো ঠেলা।'

মোতীও দেয়ালে শিংয়ের গুঁতো মারল কয়েক ঘা। খানিকটা মাটি ঝরতেই উৎসাহ পেল। তারপর আর কী, ও জান লাগিয়ে দেয়ালের সঙ্গে লড়ে গেল— যেন দেয়ালটা ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনি ঘণ্টা দুয়েক শক্তি পরীক্ষার পর হাতখানেক দেয়াল ধসে পড়ল। মোতী দুনো তাকত নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই আধখানা দেয়াল পড়ে গেল।

দেয়াল পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আধমরা জীবগুলো চেতিয়ে উঠল। প্রথমেই ঘোড়া তিনটে লাফ দিয়ে ছুটে পালাল। তারপর ছাগলগুলো। তারপর মোষগুলোও বেরিয়ে গেল। গাধা দুটো কিন্তু যেমনকার তেমনই দাঁড়িয়ে আছে।

হীরা বললে— কী, তোমরা দুটোয় পালাচ্ছ না যে ?

গাধা বললে— যদি আবার ধরে ?

'ধরে ধরবে, কী হবে ? এখন পালাবার সুযোগ পাচ্ছ, পালাও না।'

'আমাদের বড়ো ভয় করে। আমরা এখানেই পড়ে থাকি।' আদ্ধেক রাত কেটে গেছে। গাধারা তখনো দাঁড়িয়ে ভাবছে যাবে কি যাবে না। আর মোতী তার বন্ধুর দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করে চলেছে। শেষকালে ও হাল্লাক হয়ে হার মানতে, হীরা বললে, তুই চলে যা, আমি এখানে পড়ে থাকি। কপালে থাকলে আবার দেখা হবে।

জলভরা চোখে মোতী বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললে— তুই কী বলছিস রে হীরা। আমি কি এতই স্বার্থপর ? আমরা এতকাল একসঙ্গে কাটালুম। আর আজ তোকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আমি চলে যাব !

হীরা বললে— তোকে যে ভীষণ মারবে ভাই! ওরা বুঝতে পারবে এ সব তোরই শয়তানি। তোকে বেঁধেছে সেই একই দোষে।

মোতী জাঁকের সঙ্গে বললে— সে দোষে যদি আমায় মারে, তো কী হয়েছে, মারুক না। আর-কিছু না হোক নটা দশটা জীবের প্রাণ তো বাঁচাতে পেরেছি। তারা তো সবাই আশীর্বাদ করছে, কী বল?

এই বলে মোতী গাধা দুটোকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে দেয়ালের ফুটো দিয়ে বার করে দিল। তারপর দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে রইল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড়ের পাহারাদার আর মুনসী আর সব লোকজনদের যে কী পরিমাণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, সে আর বলে দরকার নেই। শুধু এইটুকু খবরই যথেষ্ট যে মোতীর খুব উত্তমমধ্যম ধোলাই হল এবং তাকেও আর-একটা কাছিতে বেঁধে রাখা হল।

পাঁচ

এক সপ্তাহ পর্যন্ত দুই বন্ধু সেই খোঁয়াড়ে আটক হয়ে রইল। কেউ এককণা ঘাসও দিল না খেতে। তবে দিনে একবার জল দেখিয়ে যেত। ওরা এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে আর উঠতে পারে না; কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। পাঁজরা গোনা যায়।

একদিন খোঁয়াড়বাড়ির সামনে ঢোল বাজতে থাকে। দুপুর নাগাদ জনা পঞ্চাশ ষাট লোক জড় হয়ে গেল। ওদের দুই বন্ধুকে বের করা হল। জনে জনে ওদের নেড়ে চেড়ে দেখে, তারপর মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। এমন মড়ার মতন জানোয়ার কে কিনবে, খদ্দের হয় না।

একসময় এক দাড়িঅলা এগিয়ে আসে। লোকটার চোখ দুটো লাল, চেহারা অতিমাত্রায় রুক্ষ, কর্কশ। লোকটা হীরা-মোতীর কুঁচকির কাছটায় টিপুনি দিয়ে, খোঁয়াড়ের কেরানির সঙ্গে কী যেন

কথাবার্তা বলতে থাকে। লোকটা যে কে আর কেন ওদের টেপা-টিপি করছে, ওদের আর বুঝতে বাকি থাকে না। ওরা একে অপরের দিকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে একবার দেখে, তারপর মাথা হেঁট করে।

হীরা বলে— গয়ার বাড়ি থেকে মিথ্যেই পালিয়েছিলুম, এখন আর বাঁচার ভরসা নেই।

মোতী বীতশ্রদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয়— বলে ভগবান সকলের ওপর দয়া করেন। তাঁর দয়া কি আমাদের জন্যে নয়?

হীরা— আমাদের বাঁচা-মরায় ভগবানের কিছু যায় আসে না। যাক, ভালোই হল। কদিন তো ওর কাছে থাকা যাবে। একবার ভগবান সেই মেয়েটার রূপ ধরে বাঁচিয়েছেন। বলা যায় না, এবারেও বাঁচাতেও পারেন।

মোতী— এ লোকটা কসাই, ছুরি চালাবে, দেখিস।

হীরা— তাতে আর কী। মাংস, চামড়া, শিং হাড় সব-কিছুই কোনো-না-কোনো কাজে লাগবে তো।

নিলেম হয়ে যাবার পর দুই বন্ধুকে নিয়ে দাড়িঅলা চলল। দুজনের রক্ত হিম হয়ে গেল। পা চলে না। তবু মারের ভয়ে প্রাণপণে পড়িমরি করে ছুটে চলল। চাল একটু ঢিমে হলেই কসাইটা খুব জোরে ডাণ্ডা মারতে থাকে।

যেতে যেতে ওরা দেখতে পায় গাঁয়ের গাইবলদের পাল সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে চরছে। তারা সবাই খুব খুশি, গা দিয়ে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে। কোনোটা লাফাচ্ছে, কোনোটা প্রসন্ন মনে বসে বসে আরামে জাবর কাটছে। কত সুখের জীবন এদের। কিন্তু কী স্বার্থপর দেখ! ওদের দুই ভাইকে যে কসাইয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে যেন কারো ভ্রূক্ষেপই নেই।

হঠাৎ— রাস্তাঘাট যেন ওদের চেনা চেনা লাগল। হ্যাঁ, এই তো সেই রাস্তা যেখান দিয়ে গয়ার সঙ্গে ওরা গিয়েছিল। ওদের গতি আপনা থেকেই বেড়ে গেল। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ, সব দুর্বলতা লোপ পেয়ে গেছে। আহা, এই তো সেই ক্ষেত, ওদের নিজেদের ক্ষেত। এই কুয়োতেই তো ওরা 'মোট' চালাত। হ্যাঁ,

ঠিক এই-ই সেই ইঁদারা।

মোতী বলল— আমাদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।

হীরা বলল— ভগবানের দয়া।

মোতী—আমি দৌড় লাগাচ্ছি।

হীরা— লোকটা কি ছাড়বে?

মোতী— একে পেড়ে ফেলছি এক্ষুনি।

হীরা— না না, চল এক ছুটে গোয়াল ঘরে হাজির হই। ওখান থেকে আর নড়ব না।

দুই স্যাঙাত অনেকদিন পরে উন্মত্ত আনন্দে দুটো বাছুরের মতন দৌড়ল। তারপর অনেক মমতায় ঘেরা নিজেদের পুরনো নিরাপত্তার আশ্রয়ে এসে দাঁড়াল। দাড়িঅলা ওদের পেছনে পেছনে ছুটছিল।

ঝুরী দুয়োরে বসে রোদ পোহাচ্ছিল। বলদদের আসতে দেখে পাগলের মতন এসে তাদের বুকে জড়িয়ে আদর করতে লাগল। হীরা-মোতীর চোখে আনন্দাশ্রু। ওরা ঝুরীর হাত চাটতে থাকে।

দাড়িঅলা এসে বলদদের রশিতে হাত দেয়।

ঝুরী বলে— দড়ি ছাড়ো, আমার বলদ।

'তোমার বলদ কী রকম? আমি পিঁজরাপোল থেকে নীলেমে কিনলুম।'

ঝুরী— আমি তো দেখছি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ। চুপচাপ রাস্তা দেখো। আমার বলদ, আমি ছাড়া কারুর বেচবার এক্তিয়ার নেই।

'আমি থানায় নালিশ করব।'

'আমার বলদ। তার সাক্ষী হল ওরা আমার বাড়িতে রয়েছে।'

দাড়িঅলা চটে উঠে জবরদস্তি ধরে নিয়ে যাবে বলে বলদদের দিকে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মোতী শিং চালাল। দাড়িঅলা পিছিয়ে গেল। মোতী পিছু নিল। দাড়িঅলা দৌড়তে থাকে, মোতী তাড়া করে যায়। দাড়িঅলাকে গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েও মোতী কিছুক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে থাকে। দাড়িঅলা দূর থেকে গালাগাল

দিচ্ছে, ঢিল ছুঁড়ছে। আর বিজয়ী বীরের মতন মোতী তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের লোক তামাশা দেখতে ভেঙে পড়ে। সবাই হাসছে।

দাড়িঅলা হার মেনে চলে যাবার পর, বিজয়গর্বে হেলতে দুলতে মোতী বাড়ি ফেরে।

হীরা বলে— আমি ভয় পাচ্ছিলুম, তুই না রাগের বশে মেরেই বসিস।

মোতী বলল— আমাকে ধরতে এলে মার খেত নিশ্চয়।

'আর আসবে না।'

'এসে দেখুক-না একবার, মজা বুঝিয়ে দেব।'

'যদি গুলি ছুঁড়ে মারে?'

মোতী বললে— মরে যাব সেও ভালো, ওর হাতে তো পড়ব না।

হ'রা বললে— আমাদের জানকে কেউ যেন জানই মনে করে না।

মোতী— আমরা সাদাসিধে সরল জীব কিনা, তাই।

অল্পক্ষণের ভেতরেই নাদা ভরে খোল ভুষি চুনি আর দানা দেওয়া হল। তুই বন্ধু খাচ্ছে। ঝুরী তাদের গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর জনা বিশেক ছেলে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে। সারা গাঁয়ে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেছে। ঠিক এই সময় বাড়ির কর্ত্রী বেরিয়ে এল। হীরা-মোতীকে আদর করে কপালে চুমু খেল।

নেমকের দারোগা

যখন নতুন লবণ দপ্তর খোলা হল, আর বিধিদত্ত এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে জারী করা হল, তখন লোকেও লুকিয়ে চুরিয়ে নুনের কারবার শুরু করে দিল। নানা ধরনের ছল-চাতুরীর সূত্রপাত হল, কেউ ঘুষ দিয়ে, কেউ চালাকি করে কাজ হাসিল করতে লাগল। আমলাদের পোয়াবারো। পাটোয়ারী-গিরি মানসম্মানের কাজ, ছেড়েছুড়ে অনেকেই এই বিভাগের বরকন্দাজ হয়ে বসল। এই দপ্তরের দারোগার চাকরির জন্যে অমন অনেক উকিল-মোক্তারেরও জিভে জল আসত। এ সেই সময়ের কথা, যখন ইংরেজি শিক্ষা আর খৃস্টধর্ম এই দুটোকে লোকে এক করে দেখত। এখন এ দেশে ফারসির প্রাবল্য। প্রেমের উপাখ্যান আর শৃঙ্গার রসের কাব্য পড়ে ফারসি জানা লোকেরা তখন দেশের উচ্চতম পদে বহাল হতেন। মুনসী, বংশীধরও তাই জুলেখার বিরহ-বৃত্তান্ত সমাপ্ত ক'রে, নল-নীলের যুদ্ধ কিংবা আমেরিকা-আবিষ্কারের তুলনায় মজনু বা ফরহাদের প্রেমকাহিনীকে অধিক গুরুত্ব দিতে শিখে, এবার রোজগারের সন্ধানে বেরোলেন। তাঁর পিতৃদেব অভিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ছেলেকে বোঝালেন— বাবা, সংসারের দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। ঋণের বোঝায় ডুবে রয়েছে। মেয়েগুলো যেন ঘাসপাতার মতন রোজ বেড়ে চলেছে। আর আমার কথা তো ছেড়েই দাও, ঝড়ে পড়া গাছ, আজ আছি কাল নেই। এখন তুমিই হলে বাড়ির আশা ভরসা। চাকরি সে চাকরিই, চাকরিতে পদমর্যাদার কথা মোটেই ভেবো না। চাকরি হল পীরের দরগা। চোখ কান খোলা রাখবে। এমন চাকরি খুঁজবে, যাতে দু'পয়সা উপরি আয় হয়। মাস-মাইনে পূর্ণিমার চাঁদ, মাসে একদিনই চোখে দেখা যায়, তারপর দিনে দিনে কমতে কমতে লোপ পেয়ে যায়। আর উপরি হল বহমান স্রোত যাতে সবসময়ের তেষ্টা মেটে। বেতন দেয় মানুষে,

তাই তাতে বৃদ্ধি নেই। উপরি আমদানি ঈশ্বরের করুণার দান, তাই তাতে স্ফীতি আছে, উন্নতি আছে। তুমি স্বয়ং কৃতবিদ্য ছেলে, তোমাকে আমি কী বোঝাব। এ-সব বিষয়ে বিবেক বুদ্ধি বড়ো প্রয়োজনীয় বস্তু। মানুষকে দেখবে, তার প্রয়োজন বুঝতে চেষ্টা করবে, আর সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করবে। উপরন্তু যা উচিত বুঝবে, করবে। যার গরজ আছে দেখবে তার প্রতি কঠোর আচরণ তোমার নির্ঘাত লাভ হবে। কিন্তু যে তেমন ঠেকায় পড়ে নেই, তার ওপর দাঁও মারার সুবিধে কম। এই কথাগুলো সবসময়ে খেয়াল রেখে চোলো। এ আমার সারাজীবনের পুঁজি।

বংশীধর আজ্ঞাকারী ছেলে। বাপের উপদেশ আর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে একদা বাড়ির বাইরে পদার্পণ করল। বিস্তীর্ণ সংসার-মরুপথে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা, ধৈর্য আর আত্মপ্রত্যয় ছাড়া তার আর-কোনো সহায় সম্বল ছিল না। এরাই তার বন্ধু, সহযাত্রী পথ-প্রদর্শক। তবে বংশীধরের যাত্রা শুভ। অল্পদিনেই লবণ বিভাগের দারোগার কাজে বহাল হয়ে গেল। উত্তম বেতন, আর উপরির দিগন্ত অনন্তবিস্তারী। বৃদ্ধ মুনসীজীর কাছে এই শুভ সংবাদ পেঁছিতে তাঁর খুশির আর ইয়ত্তা রইল না। স্থানীয় মহাজনের সুর নরম হল, শুঁড়ির দোকানের মালিকের আশালতা মুঞ্জরিত হল। প্রতিবেশীদের অনেকের হৃদ্‌যন্ত্রে শূলবেদনা দেখা দিল।

শীতকাল— তায় রাত্তির। নিমকদপ্তরের সেপাই, চৌকিদার সবাই নেশায় মশগুল। মুনসী বংশীধর এখানে এসেছেন মাস ছয়েকের বেশি হয় নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর আচরণ আর কর্মকুশলতায় অফিসার-বর্গ মুগ্ধ হয়ে গেছেন। আমলারা তাঁর ওপর খুব বিশ্বাস রাখেন। নুনের আপিস থেকে পুব দিকে মাইল খানেকের মাথায় যমুনা নদী; নদীর ওপর নৌকো দিয়ে অস্থায়ী ধরনের পুল বাঁধা আছে। দারোগা সাহেব ঘরের দোর বন্ধ করে মিঠে ঘুমে মগ্ন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেললেন। যমুনার কল্লোল গানের বদলে কানে এল গাড়ির গড়গড় আওয়াজ, সেইসঙ্গে মাঝিমাল্লাদের কোলাহল। উঠে বসলেন। এত রাত্তিরে নদীর ওপারে গাড়ি যাচ্ছে কেন?

কোথাও কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়। চিন্তায় সন্দেহ বেড়ে গেল। উর্দি পরে, পিস্তল পকেটে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পুলের ওপরে হাজির হলেন। গোরুর গাড়ির এক দীর্ঘ সারি পুল পার হয়ে ওপারে যাচ্ছিল। দারোগা চড়া সুরে প্রশ্ন করলেন— কার গাড়ি ?

অল্পক্ষণ চুপচাপ। লোকজনদের মধ্যে একটু কানাকানি হল। তারপর সামনের গাড়ি থেকে জবাব এল—

'পণ্ডিত অলোপীদীনের।'

'কে পণ্ডিত অলোপীদীন ?'

'দাতাগঞ্জের।'

মুনসী বংশীধর চমকে উঠলেন। পণ্ডিত অলোপীদীন এই এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী জমিদার। লাখ লাখ টাকার লেনদেন, তেজারতির কারবার— এ অঞ্চলে ছোটো-বড়ো এমন লোক নেই যে তাঁর কাছে ঋণী নয়। এ ছাড়া বিরাট ফলাও ব্যাবসা। অত্যন্ত প্রতিপত্তিসম্পন্ন পুরুষ। ইংরেজ অফিসাররা তাঁর এলাকায় শিকার করতে গেলে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর বাড়িতে বারো মাসই সদাব্রত।

মুনসীজী আবার প্রশ্ন করেন— গাড়ি কোথায় যাবে ? উত্তর এল— কানপুর। তখন জানতে চাইলেন গাড়িতে কী আছে ! এবার সবাই নিরুত্তর। মৌনতা দারোগার সন্দেহ বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় থেকে তিনি কড়া ধমক দিলেন— কী সবাই বোবা হয়ে গেলে নাকি ? আমি জানতে চাইছি গাড়িতে কী মাল যাচ্ছে ?

এবারেও উত্তর না পেয়ে দারোগা ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে একটা গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর একটা বোরাতে খোঁচা দিতেই আর সন্দেহ রইল না। বস্তা ভর্তি নুন।

তিন

সুসজ্জিত গো-শকটে শুয়ে শুয়ে, কখনো জেগে, কখনো ঘুমিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন— পণ্ডিত অলোপীদীন। গাড়োয়ানরা আতঙ্কিত হয়ে এসে তাঁকে জানাল। বলল— মহারাজ। দারোগা গাড়ি আটকে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে আর আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

পণ্ডিত অলোপীদীনের লক্ষ্মীদেবীর ওপর অবিচল বিশ্বাস। উনি বলেন, পৃথিবী তো ছার, স্বর্গও লক্ষ্মীর পদানত। তাঁর কথা অভ্রান্ত। ন্যায়নীতি ইত্যাদি লক্ষ্মীরই খেলার সামগ্রী, ও সব নিয়ে তিনি যেমন খুশি নাড়াচাড়া ফেলাছড়া করেন। পণ্ডিতজী শুয়ে শুয়েই বললেন— চলো, আমি আসছি। বলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পান সাজলেন, পান মুখে দিলেন, তারপরে বালাপোষ গায়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে দারোগার সামনে এসে বললেন— বাবুজীর কল্যাণ হোক। বলুন, কী অপরাধ করেছি যে গরিবের গাড়ি আটক পড়ল। আমি ব্রাহ্মণ, আপনাদের কৃপাদৃষ্টিই আমাদের সম্বল।

দারোগা রুক্ষ ভঙ্গীতে সংক্ষেপে বলেন— সরকারী হুকুম।

অলোপীদীন হেসে ওঠেন। বলেন— আমরা সরকারী হুকুমও বুঝি না আর সরকারকেও চিনি না। আমাদের সরকার আপনিই। আর এ হল আপনার-আমার ঘরের কথা, আমি তো আপনার হাতের মুঠোর লোক। আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন। এই পথে যাব আর এই ঘাটের দেবতাকে পুজো দেব না —এ কখনো হতে পারে? আমি তো আপনার দর্শনে নিজে থেকেই আসতুম। ঐশ্বর্যের মোহন বাঁশির সুর বংশীধরের কানের পাশে বাজছে। কিন্তু বংশীধর তার কুহকে ভুলল না। নীতিনিষ্ঠার এক নতুন নেশায় সে আবিষ্ট। উদ্ধত স্বরে বলল— যে-সব নেমকহারামদের পয়সা দিয়ে কেনা যায়, আমি তাদের দলে নই। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর নিয়ম মাফিক আপনাকে চালান দেব। ব্যস, আমার বেশি কথা বলার ফুরসত নেই। জমাদার বদলু সিং! এঁকে হাজতে নিয়ে

যাও, আমি হুকুম দিচ্ছি।

পণ্ডিত অলোপীদীন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গাড়োয়ানদের ভেতর সাড়া পড়ে গেল। পণ্ডিতজী জীবনে সম্ভবত এই প্রথমবার এরকম কড়া কথা শুনলেন। বদলু সিং এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু পণ্ডিতজীর প্রতাপের কথা স্মরণ করে তাঁর গায়ে হাত দিতে তার সাহসে কুলোল না। এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পণ্ডিতজী কখনো কাউকে দেখেন নি। অনুমান করলেন— ছেলেমানুষ, এখনো মায়ামোহের ফাঁদে পড়ে নি, নিতান্ত নাবালক, তাই সংকোচ করছে। তিনি অত্যন্ত দীন ভাবে বললেন, বাবুসাহেব এরকম করবেন না, তা হলে আমি একেবারে ধুলোয় মিশে যাব। ইজ্জত মাটিতে লুটোবে। আমায় অপমান করে আপনার তো কোনো লাভ হবে না। আমি আপনার বাইরের লোক নই।

বংশীধর কঠোর স্বরে বলল— আমি এ-সব কথা শুনতে চাই না।

পাথর ভেবে যে মাটিতে অলোপীদীন পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন তা ভিজে বালির মতন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। তাঁর ধন সম্মান আভিজাত্যের অহংকারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কিন্তু এখনো মুদ্রার সর্বব্যাপিতার শক্তিতে তাঁর পুরোপুরি আস্থা। নিজের খাজাঞ্চিকে ডেকে বলেন— লালাজী, এক হাজার টাকার নোট এনে বাবুসাহেবকে ভেট দাও। ওঁর এখন সিংহের ক্ষিদে— বংশীধর উত্তপ্ত হয়ে বললেন— হাজার কেন লাখ টাকা দিয়েও কেউ আমায় ন্যায়ের পথ থেকে নড়াতে পারবে না।

দার্ঢ্যের এ কী রকম নির্বুদ্ধিতা! এই দেবদুর্লভ ত্যাগের চেহারা ঐশ্বর্যকে ভাবিয়ে তোলে। এবার দুই শক্তির খোলাখুলি দ্বৈরথ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। অর্থের ঘন ঘন ছোবল— এক থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে দশ···পনের···বিশ হাজারে চড়ে গেল। তবুও ন্যায়ধর্ম একা ঐ অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে পর্বতের মতো অটল থেকে যুঝে চলল।

অলোপীদীন নৈরাশ্যের সুরে বললেন— আর এর বেশি বলার আমার সাহস নেই। আপনার যা বিচার হয় করুন।

দারোগা জমাদারকে ইশারা করলে, জমাদার মনে মনে তার মুণ্ড-

পাত করতে করতে সম্ভ্রান্ত আসামীর দিকে এগোল। পণ্ডিত এবার সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। দু-তিন পা পিছিয়ে গিয়ে কাতর মিনতি করলেন— বাবুসাহেব, আমায় দয়া করুন, ভগবানের দোহাই, আমি পঁচিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে রাজি আছি, মিটমাট করে নিন।

'অসম্ভব।'

'তিরিশ হাজার!'

'কোনো মতেই নয়।'

'তবে, চল্লিশ হাজার, তাতেও না?'

বংশীধর জমাদারকে বলে— বদলুসিং, এই লোকটিকে এখনই হাজতে পোরো। আর একটা কথা নয়।

ধর্ম অর্থকে দুপায়ে মাড়িয়ে গেল। অলোপীদীন দেখছেন— একটা সুপুষ্ট বলিষ্ঠ হাতে হাতকড়া ধরা, আর সে হাতটা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে···তাঁর দিকেই। ব্যাকুল নিরাশা নিয়ে চারদিকে তাকালেন পণ্ডিতজী। তারপর হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

চার

পৃথিবী ঘুমোয়, তার জিভ জেগে থাকে। তাই সকাল হতে না হতেই ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই জিভ নড়তে দেখা গেল। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। পণ্ডিত অলোপীদীনের কুকীর্তির ওপর হাজার রকম টিকা টিপ্পনী, রাশি রাশি নিন্দা বর্ষণ, যেন ইহসংসারে আর পাপতাপ অন্য কোথাও নেই। যেন যা ঘটেছে সেটা একটা বিরল ব্যতিক্রম। যে গয়লা দুধ ব'লে জল বেচে, যে আমলা মিথ্যে ডায়ারি লেখে, যে মহাপুরুষ বিনা টিকিটে তীর্থযাত্রা করেন, যে শ্রেষ্ঠীর অপর নাম সাধু অথচ দলিল জাল করাই যার পেশা, আজ সকালে তারা সবাই সমবেতভাবে দেব-মানবের ভঙ্গী ধরে ঘট্ ঘট্ করে ঘনঘন ঘাড় নাড়ছেন— 'তাই তো, তাই তো' করছেন। পরদিন যখন অভিযুক্ত পণ্ডিতজী থানার কনস্টেবলের পাহারায়, হাতে হাতকড়ি, হৃদয়ে গ্লানি আর ক্ষোভ

নিয়ে, উঁচু মাথা হেঁট করে গিয়ে আদালতে উঠলেন, তখন তার পেছনে সারা শহর ভেঙে পড়ল। বড়ো বড়ো মেলাতেও এরকম উৎসুক জনতার ভিড় দেখা যায় না। ছাতে আর দেয়ালে তফাত ধরা যায় না।

এজলাসে পণ্ডিতজীর উপস্থিতিটুকুর বিলম্ব ছিল। তারপরেই তিনি যথাপূর্বং ঐশ্বর্যের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে। রাজাপুরুষবর্গ তাঁর স্তাবক, আমলারা তাঁর সেবক, উকিল-মোক্তারেরা তাঁর আজ্ঞাবাহক, আর আরদালী-চাপরাসী-চৌকিদারের দল তো তাঁর বিনা মাইনেয় খাটা হুকুমের গোলাম। তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন চারদিক থেকে দৌড়ে এল। সবাই হতবাক্। বিস্ময়ের কারণ এ নয় যে পণ্ডিত কেন এমন দুষ্কর্ম করলেন। বিস্ময়ের হেতু হল— এ হেন কৃতী পুরুষ কেমন করে আইনের ফাঁদে পড়লেন। যার অফুরন্ত ধনাগার অসাধ্য সাধনে সক্ষম, যার বাক্চাতুর্য অনন্য ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, সে কিনা কাঠগড়ায় দাঁড়াতে আসে! প্রত্যেকে সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাঁকে এই আক্রান্ত অবস্থা থেকে ত্রাণ করার জন্য উকিলসেনা মুহূর্তে তৎপর হয়ে ওঠে। ন্যায়ের রণাঙ্গণে ধর্ম আর অর্থের দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ বেধে ওঠে।

বংশীধর একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সত্য ছাড়া আর কোনো বল নেই তার, স্পষ্ট ভাষণ ছাড়া নেই কোনো হাতিয়ার। সাক্ষী ছিল, কিন্তু লোভে টলটল করছে। এমন-কি, এখন ন্যায়ের রশিতেও টান পড়েছে, তারও ঝোঁক কিছুটা অন্যপক্ষের দিকে— বংশীধরের উপলব্ধি হয়। দরবার ন্যায়ের, কিন্তু কর্মীমণ্ডলীর ওপরে পক্ষপাতের নেশা তার ঘনছায়া বিস্তার করে আছে। কিন্তু পক্ষপাত আর ন্যায়ের জোড় বাঁধে কী ভাবে। এ তো অকল্পনীয় সহঅবস্থান!

মামলা শেষ হতে দেরি লাগল না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে লিখলেন, পণ্ডিত অলোপীদীনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অপ্রমাণিত। উনি একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। সামান্য লাভের জন্য উনি এমন দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হবেন এটা কল্পনাতীত। বিভাগীয় দারোগার দোষের মাত্রা যদিও বেশি নয়, তবু তাঁর হঠকারিতা ও অবিবেচকপ্রসূত কাজের ফলে একজন নির্দোষ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে

অযথা হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে। সে তার কর্তব্যে সজাগ ও সচেতন এটা যেমন আদালতকে সন্তুষ্ট করেছে, তেমনই তার বিচারবুদ্ধির দৈন্য ও হঠকারিতার জন্যে আমি তাকে ভর্ৎসনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

উকিলরা রায় শুনে উচ্ছল হল। পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। কুটুম্বস্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে টাকার হরির লুঠ হল। অগাধ ধনরাশির অকৃপণ বিতরণের বীচিভঙ্গে আদালতের ভিত সুদ্ধু নড়ে গেল। বংশীধর বাইরে পা রাখতেই চারধার থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধারাপাত হতে লাগল। চাপরাসীরা ঝুঁকে পড়ে সেলাম জানাল। কিন্তু প্রতিটি পরিহাস, প্রতিটি কটুভাষ, এক-একটি সাংকেতিক অপমান বংশীধরের আত্মপ্রসাদকে আরো স্ফীত, তার চিত্তের মহিমাকে আরো সংবর্ধিত করে তুলল। মামলায় ওর জিত হলেও সম্ভবত ও এমন দৃপ্ত গর্বে পথ চলতে পারত না। আজ ওর এক অপূর্ব জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে। ও আজ এইমাত্র উপলব্ধি করল যে, ন্যায় আর বিদ্যাবত্তা, বর্ণবহুল উপাধি, বড়ো দাড়ি আর ঢোলা আচকান— কিছুই আসলে শ্রদ্ধা-সম্মানের প্রকৃত পাত্র নয়।

বংশীধর বিত্তের সঙ্গে শত্রুতা সেধেছে, তার অনিবার্য মূল্যও তাকে ধরে দিতে হল। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা (সাসপেন্‌সনের নোটিশ) এল। কর্তব্য-পরায়ণতার শাস্তি। ক্ষোভে শোকে ভগ্নহৃদয় বংশীধর বাড়ি ফিরে এল। ছেলে বাড়ি ফেরার আগে থেকেই বাপ রাগে চিড়বিড় করছিলেন, এত করে বোঝালুম একটা কথা শুনল না। যা খুশি তাই করে বসল। এদিকে আমি শুঁড়ি আর কসাইয়ের তাগাদার জ্বালায় বুড়ো বয়সে ভক্ত সেজে নিরমিষ্যি মেরে বসে রয়েছি। আর ছেলে আমার সাধু। শুকনো কটা মাইনের টাকা ঠকঠক করছে। আরে বাপু আমিও তো চাকরি করেছি। আর এমন-কিছু পদস্থ উজীর-নাজীরও ছিলুম না। কিন্তু যতদিন কাজ করেছি চুটিয়ে রোজগার করেছি। আর বাবু আমার ইমানদার হতে চলেছেন। সাধুতার ভূতে পেয়েছে। ঘরে আঁধার মসজিদে দেয়ালী জ্বালবেন! কী

আক্কেল বিবেচনা, ঘেন্না ধরে যায়। দুর দুর, এদের লেখাপড়া শেখানো পশুশ্রম। আবার এর ওপর যখন কদিন বাদেই বংশীধর বাড়ি এল, আর বাপ সব খবর শুনলেন, তখন তো বুড়ো একেবারে মাথা মুড় খুড়তে লাগল। বলে, ইচ্ছে করছে এক নোড়ার বাড়িতে তোমার আর আমার দুটো মাথাই ফাটিয়ে ফেলি। তার আফসোস আর হাত-কামড়ানো বহুক্ষণ যাবৎ থামে না। যাচ্ছেতাই গালাগাল চলতে থাকে। শেষকালে বাপের আক্ষেপ সইতে না পেরে বংশীধর সেখান থেকে সরে আসে। বৃদ্ধা মার দুঃখও কম নয়। জগন্নাথধাম আর রামেশ্বর যাত্রার সাধ ধুলোয় মিশে গেল। বংশীধরের শ্রীমতী তো কদিন যাবৎ মুখ তুলে কথাই বলল না।

এইভাবে আরো এক সপ্তাহ কাটল। সেদিন সন্ধের সময় বুড়ো মুনসী বসে বসে রামনামের মালা জপছেন। এমন সময় সদর দোরে একটা সাজানো-গোছানো রথ এসে থামল। সবুজ আর গোলাপি পরদা ঝুলছে, পশ্চিমা বলদজুড়ি, তাদের গলায় নীল ফিতে, শিং পেতলে বাঁধানো। সঙ্গে লাঠি-কাঁধে চাকর বেহারা। মুনসীজী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন পণ্ডিত অলোপীদীন। নত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হলেন। তারপর পঞ্চমুখে তোষামোদ গুণকীর্তন শুরু করলেন: আমার কী ভাগ্যোদয় হল যে আজ এই কুঁড়েঘরে আপনার চরণধূলি পড়ল। আপনি আমাদের পূজ্য, আমাদের দেবতা, কিন্তু কোন্ লজ্জায় আপনাকে মুখ দেখাব। আমার অভাগা অকালকুষ্মাণ্ড কুপুত্র আমার মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে। নইলে আজ আমার কত আনন্দের দিন— যে আপনার আবির্ভাব হয়েছে। কী করব। তাই ভগবানকে বলি, সাতজন্ম নিঃসন্তান রাখুন, এমন দুর্মতি সন্তান দেবার চেয়ে—

বাধা দিয়ে অলোপীদীন বলেন—না না দাদা, অমন কথা বলবেন না।

মুনসী— এমন কুসন্তানকে আর কী বলব বলুন?

বাৎসল্যমাখা গলায় পণ্ডিতজী বললেন— কুসন্তান আপনি কাকে বলছেন? কুলতিলক বলুন। কীর্তিমান, বংশের মুখোজ্জ্বলকারী এমন

ধর্মপরায়ণ কটা মানুষ আজ এ সংসারে আছে, আমায় দেখান তো, যে ধর্মের জন্যে, ন্যায় নীতির জন্যে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে ?

তারপর বংশীধরের দিকে ফিরে বললেন— দারোগা সাহেব, একে খোসামোদ বলে ভাববেন না। খোসামোদ করার জন্যে আমার এত কষ্ট করে আসার দরকার ছিল না। সেদিন রাত্তিরে আপনি আপনার ক্ষমতাবলে আমায় কয়েদ করেছিলেন, আজ স্বেচ্ছায় আপনার কাছে কয়েদ হতে এসেছি। আমি জীবনে হাজার হাজার মান্য-গণ্য আমীর-ওমরা দেখেছি, কয়েক হাজার রাজপুরুষের সঙ্গ করেছি। তাদের সবাইকে আমি টাকা দিয়ে বশ করেছি, আমার কেনা গোলাম বানিয়ে ছেড়েছি। একমাত্র আপনি আমায় হারিয়ে দিয়েছেন। তাই আমায় অনুমতি দিন আজ আপনার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

অলোপীদীনকে আসতে দেখে বংশীধর উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করেছিল। কিন্তু নিজের আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখেই। মনে ভেবেছিল লোকটা তাকে লজ্জা দিয়ে অপদস্থ করতেই এসেছে। তাই ক্ষমা প্রার্থনার ধার দিয়েও যায় নি। বরং বাপের ঐ রকম পায়ে-তেলানো কথাবার্তা শুনে তার গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন পণ্ডিতজীর কথা শুনে ওর মনের গ্লানি কেটে গেল। পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল অকপট সৌজন্যের আভাস। বংশীধরের মন গলে গেল। এবার লজ্জা এসে তার গর্বকে ভাসিয়ে দিল। লজ্জিত কণ্ঠে বললে— এ আপনার উদারতা, আমায় লজ্জা দেবেন না। আমার সেদিনের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন। সেদিন যা করেছি কর্তব্যের দায়ে করেছি, নইলে এমনিতে আমি আপনার দাস। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

আলোপীদীন বিনীত স্বরে বললেন— নদীর ধারে সেদিন আপনি আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু আজ মঞ্জুর করতেই হবে।

বংশীধর বলল, আমার কিসের যোগ্যতা, তবু আমার সাধ্যমতো আপনার সেবায় ত্রুটি হবে না।

পণ্ডিতজী একটা স্ট্যাম্প লাগানো কাগজ তার সামনে রেখে বললেন— এই পদটি আপনি গ্রহণ করুন আর কাগজে স্বাক্ষর করে দিন। আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা না পেলে আপনার দরজা থেকে নড়ব না।

মুনসী বংশীধর কাগজটা পড়ল, কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল। পণ্ডিত অলোপীদীন তাকে তাঁর সমগ্র সম্পত্তির স্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করছেন। বার্ষিক বেতন ছ'হাজার টাকা, অতিরিক্ত দৈনিক খরচ আলাদা, যাতায়াতের জন্য ঘোড়া, বাস করার জন্যে বাংলো, চাকর-পেয়াদা। কম্পিত স্বরে বলে— আপনার উদারতার প্রশংসা ভাষায় ব্যক্ত করব, সে সাধ্য নেই আমার। কিন্তু এত উঁচু পদের যোগ্যতাও আমার নেই।

অলোপীদীন হেসে বললেন— আমার এখন একটি অযোগ্য লোকেরই নিতান্ত প্রয়োজন ভাই।

বংশীধর গম্ভীর হল। বললে— দেখুন, আমি এমনিতেই আপনার সেবক। আপনার মতো কীর্তিমান সজ্জন পুরুষের সেবা করা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে একজন প্রকৃত গুণবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দরকার। আমার সে বিদ্যে নেই, সে বুদ্ধিও নেই আবার এমন স্বভাবও নয় যে বিদ্যেবুদ্ধির অপূর্ণতা সামলে নেব।

কলমদান থেকে কলম বের করে অলোপীদীন বংশীধরের হাতে দিয়ে বললেন— বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা এ সব-কিছুরই আমার চাহিদা নেই। এ-সব গুণের মহত্ত্বের পরিচয় আমি ঢের পেয়েছি। আমার সৌভাগ্য এমন একটি রত্নের সন্ধান আমি পেয়েছি যার কাছে যোগ্যতা বা বিদ্যাবত্তার সব জলুস ম্লান হয়ে যায়। এই নিন কলম, বেশি ভাবনা চিন্তা করবেন না, নামটা সই করে দিন। পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আপনাকে সারা জীবন সেই নদীর ধারের অনমনীয় উদ্ধত, কঠোর অথচ ন্যায়নিষ্ঠ দারোগা করেই রাখেন।

বংশীধরের চোখ ছলছল করতে লাগল। এতটা মহানুভবতা তার

হৃদয়ের ছোটো পাত্রে ধরছিল না। সে আর-একবার পণ্ডিতজীর দিকে তাকাল— সে চোখে শ্রদ্ধার নম্র মৌন ভাষা। তারপর কম্পিত হাতে নিযুক্তির স্বীকৃতি পত্রে স্বাক্ষর করে দিল।

উৎফুল্ল অন্তরে অলোপীদীন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পিসনহারী*র কুয়ো

মৃত্যুশয্যায় গোমতী গ্রামের চৌধুরী বিনায়ক সিংহকে ডাকিয়ে এনে বললে— চৌধুরী, জীবনে আমার এই একটাই সাধ ছিল।

চৌধুরী গভীর সুরে বললেন— তুমি নিশ্চিন্ত থাকো কাকী। তোমার ইচ্ছা ভগবান ঠিকই পূর্ণ করবেন। আমি আজ থেকেই মজুর ডাকিয়ে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। ভগবান চান তো তুমি তোমার নিজের কুয়োর জল খেয়েই যেতে পারবে। তা কত টাকা আছে, তুমি গুণে রেখেছ তো?

গোমতী একটুক্ষণ চোখ বুজে বিক্ষিপ্তস্মৃতিকে একত্র গ্রথিত করার চেষ্টা করে বলে— কী জানি বাবা, কত টাকা আছে, গুণতে তো জানি না। যা-কিছু আছে ঐ হাঁড়িটাতেই আছে। এইটুকু তুমি দেখো, যেন যা আছে তাতেই কাজটা চলে যায়। নইলে আবার কার কাছে হাত পাততে যাবে।

মুখঢাকা হাঁড়িটা হাতে তুলে আন্দাজে ওজন নিতে নিতে চৌধুরী বলেন— তাই করব কাকী, দেনেঅলা আর কটা আছে বলো। এক-মুঠো ভিক্ষে কারুর ঘর থেকে বেরোয় না, কুয়ো খোঁড়ার টাকা কে দিচ্ছে? ধন্য তুমি কাকী, যে জীবনভর যা কামিয়েছ তা ধর্মকর্মে দিয়ে গেলে।

গোমতী গর্বভরে বলে— তোমরা তখন খুব ছোটো, জানো বাবা, তোমার কাকা যখন ম'ল, আমার হাতে একটা কানাকড়ি ছিল না। কতদিন না খেয়ে পড়ে থেকেছি। সেদিন থেকে আজ এই শেষদিন অব্দি কী ভাবে যে দিন কেটেছে তোমার তো অজানা নেই। এক-এক রাত্তিরে মণ মণ গম ভেঙেছি বাবা। লোকে দেখে অবাক হত। ভগবান জানেন, কোত্থেকে এত তাকত পেতুম। তা সারা জীবন

*পিসনহারী—পল্লী অঞ্চলে যে-সব স্ত্রীলোক জাঁতায় গম, ডাল ইত্যাদি ভেঙে জীবিকা অর্জন করে।

ঐ একটাই সাধ ছিল আমার, যে তেনার নামে একটা ছোটোখাটো কুয়ো গেরামে হোক। আহা লোকে নামটা তো করবে। লোকে ছেলেপুলের জন্যে কাঁদে। তা আমার আর কে আছে বলো।

চৌধুরীকে উইল করে দিয়ে, সেই রাত্তিরেই গোমতী এপারের মায়া কাটাল। শেষ সময় পর্যন্ত মুখে ঐ একই কথা : বাবা, দেখো কুয়োটা কাটাতে দেরি কোরো না।

গোমতীবুড়ির পয়সা আছে এটা অনেকে আন্দাজ করত। কিন্তু সে যে দু হাজার টাকা জমা করে গেছে, এটা কেউ অনুমান করতে পারে নি। লোকে যেমন পাপ লুকিয়ে রাখে, বুড়ি তেমনি করে তার টাকা লুকাত। চৌধুরী গাঁয়ের মোড়ল, আর কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, ধর্মভীরু মানুষ, তাই বুড়ি তার যক্ষির ধন তাকেই সঁপে দিয়ে গেল।

দুই

গোমতীর ক্রিয়াকর্মে চৌধুরী বেশি খরচখরচা করল না। কাজকর্ম চুকে যেতেই, ছেলে হরনাথকে ডেকে ইঁট, চুন, পাথর ইত্যাদির দর-দামের হিসেব কষতে বসলেন। হরনাথের আনাজের ব্যাবসা। সে খানিকক্ষণ বসে চুপ করে শুনল। তারপর বললে— এখন দু-চার মাস কুয়ো খোঁড়া না হলে কি খুব বেশি ক্ষতি হবে ?

চৌধুরী বললেন— হুঁঃ। পরে খানিক চুপ করে থেকে আবার বললেন— ক্ষতি আর কী। তবে দেরি করার দরকার কী। টাকাটা তো একজন রেখেই গেছে, আমাদের মাগ্‌নায় নাম কেনা বই তো নয়। বুড়ি মরতে মরতেও কুয়ো খোঁড়ার কথা বলে গেছে।

হরনাথ— হ্যাঁ তা তো বলে গেছে। কিন্তু আজকাল বাজারটা ভালো যাচ্ছে। দু-তিন হাজার টাকার মাল কিনে রাখলে অঘ্রাণ-পোষ মাস নাগাদ ভালো লাভ পাওয়া যায়। আমি বরং আপনাকে কিছু সুদ দোব'খন। চৌধুরী দ্বিধায় পড়ে গেলেন। দুহাজার আড়াই হাজার হয়ে গেলে আর ভাবনা কী। ইঁদারার জগমোহনে নকসা ক্ষোদাই করিয়ে দেওয়া যাবে। লোভ যে একটু না হচ্ছে এমন নয়। কিন্তু

আবার একটু ভয়ের কথাও আছে— ধর যদি মন্দা পড়ে, তখন? আশঙ্কাটা লুকোতে পারলেন না, বলেই ফেলেন— ধর যদি লোকসান যায়?

হরনাথ উষ্মা প্রকাশ করল— লোকসান হতে যাবে কেন, এটা একটা কথা হল?

'আহা ধরই-না, এমনও তো হতে পারে যে বাজার মন্দা গেল?'

হরনাথ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে— দিতে চাও না তাই বলো না কেন? তুমি সাধু মহাত্মা হয়ে বসে আছ।

আর পাঁচজন ধর্মভীরু মানুষের মতোই চৌধুরীও ছেলেকে ভয় করে চলেন। কাতর কণ্ঠে বললেন— আহা, টাকা না দেবার কথা কে বলছে। তবে পরের টাকা তো, একটু বুঝেসুঝে হাত দেওয়া উচিত। ব্যাবসা-বাণিজ্যের কথা তো, আগে থেকে কিছু কি জোর করে বলা যায়? ধর দর আরো পড়ে গেল, কি ফসল পোকায় খেল, বদলোক শত্রুতা করে ঘরে আগুনই যদি দিয়ে দেয়, কী করতে পারছ? ভালো-মন্দ সবটাই ভাবতে হয় তো।

হরনাথ ব্যঙ্গ করে বলে— তা এত কথা যদি ভাবতে হয়, তার চেয়ে ভাবো না কেন যদি চোরেই নিয়ে যায়, কী করছ? আবার হয়তো দেখলে রাতারাতি মাঠের ওপর পাঁচিলই খাড়া হয়ে গেছে। ভাবলে তো সবই ভাবা যায়।

চৌধুরীর আর কোনো যুক্তি তোলার শক্তি ছিল না। দুর্বল মানুষ, যাত্রার দলের সেপাই। তাল ঠুকে আখড়ায় নেমে পড়া এক কথা, সত্যিকারের তলোয়ার দেখলে তার হাত-পা তো কাঁপবেই। ইতস্ততঃ করে বললেন— তা কত চাই তোমার?

হরনাথ পাকা খেলোয়াড়। প্রতিপক্ষকে পেছু হটতে দেখেই মেজাজ দেখাল, বললে— দেবে তো সবটাই দাও, দু-চারশো টাকা নিয়ে কি ছেলেখেলা করব?

চৌধুরী রাজী হয়ে গেলেন। গোমতীকে তাঁর হাতে টাকা দিতে কেউ দেখে নি। লোকনিন্দার সম্ভাবনাও নেই। হরনাথ মাল গস্ত করল। বোরা বোরা আনাজে ঘর ভরে গেল। চৌধুরী একটু

আরাম করে ঘুমোতে ভালোবাসেন। এখন তাঁর ঘুম ঘুচে গেল। সারারাত জেগে চাল-গমের বস্তা পাহারা দেন। ইঁদুরের সাধ্য কি বোরায় মুখ দেয়। চৌধুরী এমন করে ইঁদুর তাড়াল যে বেড়াল হার মেনে যায়। এমনি করে ছমাস কাটল। পোষ মাসে ফসল বেচে পুরো পাঁচশো টাকা লাভ হল।

হরনাথ বলল— এর থেকে পঞ্চাশ টাকা আপনি নিন।

চৌধুরী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন— পঞ্চাশ টাকা নেব মানে? দান-খয়রাত করছ নাকি? কোনো মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিলে কমসে কম দুশো টাকা সুদ দিতে হত। আমাকে না-হয় দু-পাঁচ টাকা কম দিয়ো।

হরনাথ আর কথা না বাড়িয়ে দেড়শো টাকা বাপের হাতে তুলে দিল। চৌধুরী মনে মনে দস্তুরমতো খুশি হয়ে উঠলেন। রাত্তিরে নিজের কুঠরীতে শুতে গিয়ে তাঁর মনে হল যেন— বুড়ি গোমতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিক্‌ফিক করে হাসছে। চৌধুরীর কলজে ঠক্‌ঠক্ করে উঠল। ঘুমের ঘোরে নয়। নেশার ঘোরে নয়— পরিষ্কার জেগে জেগে দেখছেন— বুড়ি হেসে চলেছে। তার শুকনো মুখে বিচিত্র এক হাসির ঢেউ।

তিন

বছর কয়েক এই ভাবে গেল। চৌধুরীও যত ফন্দি ক'রে হরনাথের কাছ থেকে টাকাটা বের করে নেবার চেষ্টা করেন, হরনাথও তত কৌশল করে পিছলে বেরিয়ে যায়। সে এক কায়দা ধরেছে, বছরে অল্প কিছু সুদ দিয়ে দেয়, আর আসলের কথা তুললেই হাজার বায়নাক্কা করে। কখনো তার ফসলের বখরা নিয়ে কান্নাকাটি, কখনো তার বকেয়া কর্জ চুকোনোর দায়। তবে মোদ্দা কথা কারবার বেশ ফেঁপে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত চৌধুরী একদিন খোলসা করে বলেই দিলেন— তোমার কারবার চলুক আর ডুবুক আমার তাতে যায় আসে না, এই মাসের ভেতরেই আমার টাকা চুকিয়ে দিতে

হবে। হরনাথ নানান ওজর-আপত্তি করার চেষ্টা করল। কিন্তু এবার আর চৌধুরীকে তাঁর কোট থেকে নড়ানো গেল না।

হরনাথ ঝেঁকে উঠল— বলছি ত্বটো মাস আর সবুর করুন, তা হচ্ছে না। এবার মাথাটা বিক্কিরি হয়ে গেলেই টাকা দিয়ে দোব।

চৌধুরী শক্ত হয়ে বললেন— তোমার মাল জন্মেও বিক্কিরি হবে না, আর না তোমার ত্বমাস কোনোদিন পুরবে। আমার আজই টাকা চাই।

হরনাথ রাগে ঠক্‌ঠক করতে করতে ঘর থেকে ত্ব'হাজার টাকা এনে বাপের সামনে ফেলে দিলে।

চৌধুরী ঈষৎ অপ্রতিভ স্বরে বললেন— টাকা তো তোমার কাছেই ছিল। হরনাথ জবাব দিল— নয়তো কি মুখ দেখিয়ে রোজগার হয়?

'তা হলে এখন না-হয় শ পাঁচেক আমায় দাও, বাকিটা ত্ব'মাস পরেই দিও। সবই তো আর আজকেই খরচ হচ্ছে না?'

হরনাথ মেজাজ দেখিয়ে বলল— আপনার টাকা আপনি খুশি হয় খরচ করুন, খুশি হয় জমা করুন, আমার দরকার নেই ও টাকায়। ত্বনিয়ার মহাজনেরা তো আর মরে হেজে যায় নি, যে আপনার বাক্যিবাণ শুনতে হবে!

চৌধুরী টাকাটা তুলে নিয়ে গিয়ে একটা তাকে ফেলে রাখলেন। ইঁদারার মাপজোখ করার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল।

হরনাথ টাকাটা ফেরত দিয়ে দিল বটে, কিন্তু মনে মনে আর-এক ফন্দি আঁটল। মাঝরাতে সারা বাড়ি শান্ত হয়ে যাবার পর, হরনাথ বাপের ঘরের দোরের জোড় আলগা করে ভেতরে ঢুকল। চৌধুরী ঘুমে অচেতন। হরনাথ এসেছিল টাকার থলে ত্বটো তুলে নিয়ে যাবে ব'লে। কিন্তু যেই-না তাকের দিকে হাত বাড়ানো, দেখে গোমতী বুড়ি সামনে দাঁড়িয়ে— ত্বহাত দিয়ে থলে ত্বটোকে আগলে রেখেছে। হরনাথ আতঙ্কে পেছু হটে গেল।

তারপর আবার মনে হল হল হয়তো ভুল দেখেছে। আবার হাত বাড়াল, আবার সেই মূর্তি— এবার এমন ভয়ংকরী রূপ যে হরনাথ একছুটে ঘর থেকে বারান্দায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

হরনাথ চারদিক থেকে বাকি বকেয়া পাওনা গণ্ডা আদায় উসুল করে ব্যাপারীদের দেবার জন্যে হাতে জমা করেছিল। চৌধুরী চোখ রাঙাতে সেই টাকাই এনে ফেলে দিয়েছিল। মনে মনে তখন থেকেই এঁচে রেখেছিল যে রাত্তির বেলায় হাত সাফাই করবে। তারপর মিছিমিছি চোর-চোর বলে চেঁচামেচি করবে, ওর ওপর আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু ফন্দি খাটল না, এদিকে ব্যাপারীরা তাগাদা দিতে আরম্ভ করেছে। স্তোক দিয়ে দিয়ে আর কাঁহাতক ঠেকানো যায়। যতরকম ওজর-অছিলা দেখানো যায়, সব হয়েছে। শেষে সবাই নালিশ ঠুকে দেবে বলে ভয় দেখাতে লাগল। একজন বুঝি শ-তিনেক টাকার দাবিতে নালিশ করেই দিলে। বেচারা চৌধুরী পড়ে গেল মুশকিলে। হরনাথ দোকানে বসে, চৌধুরীর ও-সব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কারবার চলত কিন্তু চৌধুরীরই নাম-যশের গুণে। লোকে চৌধুরীকে খাঁটি মানুষ আর লেনদেনের ব্যাপারে ভরসা করার মতো লোক বলে জানত। তাই পাওনাদারেরা কেউ চৌধুরীর কাছে তাগাদায় না এলেও, তিনি নিজেই লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। তবে 'যত যাই আসুক, ইঁদারার টাকা আর ছোঁব না' বলে চৌধুরী একেবারে পণ করে ফেললেন।

রাত্তিরে এক আড়তদারের মুসলমান চাপরাসী এসে চৌধুরীর বাড়ি বয়ে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে গেল। ভেতরে বসে চৌধুরীর এমন রাগ হয়ে যাচ্ছিল যে এক-একবার মনে হচ্ছিল— বেরিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি উপড়ে নিই। কিন্তু মনকে বোঝালেন, 'আমার দরকার কী। ছেলের কর্জ বাপের শোধ করার কথা নয়।'

খেতে বসলে গৃহিণী বললেন— এ-সব কী উপদ্রব শুরু করেছ ?

চৌধুরী কঠোর স্বরে বললেন— আমি উপদ্রব করছি ?

'তা বই-কি। ছেলেটা বলছে তার সওদা করার মাল নেই, আর তুমি টাকাগুলো সব চেয়ে নিলে ?'

চৌধুরী— চেয়ে নেবে না তো কী করব ? পরের ধনে পোদ্দারী করা আমার ধাতে সয় না।

গৃহিণী— আর এই যে মুখে চুনকালি দিচ্ছে, খুব ভালো লাগছে ?

চৌধুরী— তা আমি কী করতে পারি, পাঁচ বছর হয়ে গেছে কুয়োটা কি এ-জন্মে হবে না ?

গৃহিণী – এবেলা ছেলে কিছু খায় নি। ওবেলাও নামমাত্র মুখে ছুঁইয়ে উঠে গেছে।

চৌধুরী বললেন— তা তুমি বুঝিয়েসুজিয়ে খাওয়ালে না কেন ? খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলে তো আর টাকা মিলবে না।

গৃহিণী— তুমি নিজেই গিয়ে বোঝাও না।

চৌধুরী— ও তো এখন আমাকে শত্তুর ঠাউরে বসে আছে।

গৃহিণী— আমি টাকা নিয়ে গিয়ে ছেলেকে দোব। হাতে যখন টাকা আসবে তখন কুয়ো খুঁড়িয়ো।

চৌধুরী— না না না, ও-সব হাঙ্গামা কোরো না। আমি অত বড়ো বেইমানির কাজ করতে পারব না। তাতে ঘর-সংসার চুলোয় যাক গে।

চৌধুরী-গিন্নি এ-সব কথায় কর্ণপাত করলেন না। এক লাফে ভেতরের ঘরে গিয়ে টাকার থলির দিকে হাত বাড়িয়েই এক চীৎকার করে সরে গেলেন। সর্বশরীর বেতপাতার মতন কাঁপছে।

চৌধুরী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন— কী হল, কী হল, মাথাটাথা ঘুরে গেল নাকি ?

তাকের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গিন্নি বললেন— ঐ…ঐ যে পেত্নীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চৌধুরী তাকের দিকে নজর করে বলেন— কোথায় পেত্নী, কী বলছ। কই আমার তো নজরে পড়ছে না ?

স্ত্রী বললেন— আমার বুক ধড়ফড় করছে এখনো। ঠিক মনে হল যেন বুড়িটা আমার হাত চেপে ধরল।

চৌধুরী— ও-সব মনের ভুল। বুড়ি মরেছে কবে, পাঁচ বছর হয়ে গেছে। সে কি এখন এখানে বসে আছে ?

স্ত্রী— আমি পরিষ্কার দেখলুম, সেই বুড়ি। ছেলেও বলছিল দেখেছে রাত্তির বেলায় থলেতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চৌধুরী— ও আবার রাত্তিরে আমার ঘরে কখন গেল ?

গিন্নি— টাকাপয়সার ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। পেত্নী বুড়িকে দেখে পালিয়ে এসেছে।

চৌধুরী— আচ্ছা, এবার আমার সঙ্গে এসো তো ভেতরে দেখি। গিন্নি কানে হাত দিয়ে বললেন— রক্ষে করো বাবা, আমি আবার ও ঘরে পা দিই?

চৌধুরী— আচ্ছা আমি নিজে গিয়ে দেখছি।

চৌধুরী কুঠরীতে ঢুকে তাকের ওপর থেকে টাকাভরা থলে তুলে নিলেন। কিছুই হল না। কোথাও গোমতীর ছায়াও পড়ল না। স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল। চৌধুরী এসে বেশ জাঁক করেই বললেন— কই আমি তো কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। ওখানে থাকলে থাকত, এর মধ্যে কোথায় যাবে?

গিন্নি বললেন— কী জানি, তোমায় দেখা দিচ্ছে না কেন। তোমায় স্নেহ করত তো তাই হয়তো তোমায় দেখে সরে গেছে।

চৌধুরী— দুর দুর ও কিচ্ছু নয়, তোমার চোখের ভুল।

গিন্নি— আচ্ছা ছেলেকে ডেকে পাঠাচ্ছি, জিজ্ঞেস করে দেখ।

চৌধুরী বললেন— আমি তো দাঁড়িয়ে আছি এখানে, এবার এসে দেখো-না আর-একবার।

এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে চৌধুরীগিন্নি ভেতরে এসে তাকের কাছাকাছি গিয়ে ভয়ে ভয়ে হাত বাড়ালেন— তারপরেই আর্তনাদ করে এক লাফে ঘরের বাইরে, একেবারে উঠোনে নেমে হাঁফাতে লাগলেন।

চৌধুরীও সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে নেমে এলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন— কী, ব্যাপারটা কী। খামোকা লাফ দিয়ে পালিয়ে এলে কেন? ভালো রে ভালো, আমার কিছুই চোখে পড়ছে না, অথচ—

স্ত্রী হাঁফাতে হাঁফাতেই ধমকাতে থাকেন— যাও যাও, আর একটু হলেই প্রাণটা বেরিয়ে যেত। চোখের মাথা খেয়েছ নাকি। জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাইনিটা।

ইতিমধ্যে হরনাথও এসে পড়ল। মা-বাপকে উঠোনে দেখে বলল— কী হয়েছে মা, শরীর ভালো আছে তো?

হরনাথের মা বললে— সেই পেত্নীটা আজ দু'দুবার দেখা দিয়েছে। আমি ভাবলুম তোকে টাকাটা এখন দিয়ে দিই পরে যখন হাতে আসবে কুয়ো খোঁড়ানো হবে। এই ভেবে যেই-না টাকার থলেতে হাত দেওয়া, অমনি শাঁকচুন্নি খপ্ করে আমার হাত পাকড়ে ধরেছে। প্রাণে বেঁচে গেছি বাবাঃ।

হরনাথ বলে— ভালো দেখে একজন ওঝা ডাকানো দরকার। ওটাকে মেরে তাড়াবে।

চৌধুরী— রাত্তিরে নাকি তুইও দেখেছিস?

হরনাথ — হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে গিয়েছিলুম। তা ভেতরে পা দিতেই দেখি, পেত্নীটা দাঁড়িয়ে। আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

চৌধুরী— আচ্ছা, আবার চল্ তো দেখি।

চৌধুরী গিন্নি বলে— কে? খবর্দার। লাখটাকা দিলেও ওকে আমি আর ওঘরে ঢুকতে দোব না।

হরনাথ— আমি যাব না।

চৌধুরী— কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি দেখতে পাচ্ছি না, ব্যাপারটা কী বলো তো!

হরনাথ — কী করে বলব, আপনাকে বোধ হয় ভয় করে। আজই ওঝা ডাকা দরকার।

চৌধুরী— রহস্যটা কী বোঝা যাচ্ছে না তো। যাক। বৈজু পাঁড়ের ডিক্রির কী হল?

হরনাথ— ইদানীং বাপের ওপর এমন মর্মান্তিক চটেছে যে, তার দোকানের ব্যাপারে কোনো কথাই তাঁর সঙ্গে বলে না। উঠোনের দিকে তাকিয়ে হাওয়ার সঙ্গে কথা বললে— যা হবার তাই হবে। আমার কী নেবে? প্রাণটা ছাড়া আর তো কিছু নেই, নিতে হয় নিক। যা একবার খেয়ে ফেলেছি, তা তো আর উগরে দিতে পারব না?

চৌধুরী— তা সে যদি ডিক্রি জারী করে দেয়, তখন কী হবে?

হরনাথ— কী আর হবে। দোকানে চার-পাঁচশো টাকার মতন

মাল পড়ে আছে, নীলেম হয়ে যাবে।

চৌধুরী — কারবার তো তা হলে লাটে উঠে যাবে।

হরনাথ— তা কারবার কারবার করে তো ডুবতে বসেছি, আর কী করতে পারি। আগে যদি জানতুম কুয়ো খোঁড়ানোর এত তাড়া, তা হলে কি আর এত জড়িয়ে পড়ি। নুন-ভাত দু মুঠো তো একরকম করে জুটেই যাচ্ছিল। কী আর করা যাবে? বড়ো জোর দু-চার মাস হাজতে পচতে হবে। তা ছাড়া আর কী হবে।

তার মা বললেন— আমি বেঁচে থাকতে তোকে ফাটকে নিয়ে যাবে কোন্ মুখপোড়া রে, তার মুখটা আমি আগেই পুড়িয়ে দেব না?

হরনাথ দার্শনিক হয়ে উঠল। বললে— মা-বাপ জন্মের জন্যেই দায়ী, কর্মের জন্যে নয়।

চৌধুরীর ছেলের ওপর অগাধ ভালোবাসা ছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল হরনাথ টাকাটা মেরে দেবার জন্যে নানান টালবাহানা করছে। এখন যখন দেখল হরনাথ প্রকৃত সংকটে পড়েছে, তখন ভাবল— যদি ছেলেকে জেলে যেতে হয়, কি দোকান ক্রোক করে তা হলে বংশের নামে চুনকালি পড়বে। তার চেয়ে গোমতীর টাকাটা দিয়ে দিলেই হয়, ক্ষতি কী। দোকান চালু থাকলে, আজ নয় কাল টাকা তো হাতে আসবেই।

এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকল— হরনাথ সিং। হরনাথের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন— কে ডাকছে?

হরনাথ বললে— আমীন এসেছে তলব করতে।

'কেন, দোকান ক্রোক করবে নাকি?'

'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কত টাকার ডিক্রি?'

'বারো শো টাকার।'

বাপ বললে — আমীনকে কিছু দিলেথুলে শুনবে না?

ছেলে বললে — তা হয়তো শুনত। কিন্তু মহাজন রয়েছে যে ওদিকে। যা খাওয়াবার সেই খাইয়েছে।

চৌধুরী বললেন— তা হলে না-হয় গোমতীর টাকা থেকেই বারো শো টাকা দিয়ে দাও।

হরনাথ বললে— ও টাকা কে ছোঁবে। ঘরে শেষে আপদ-বিপদ হবে?

চৌধুরী বললেন— তাতে কী হয়েছে। ওর টাকা তো কেউ খেয়ে ফেলছে না? আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই দিচ্ছি বার করে।

চৌধুরীর একবার ভয় হল, বুড়ি আবার ওকেও না দেখা দেয়। কিন্তু মিথ্যে আশঙ্কা, সেরকম কিছুই ঘটল না। চৌধুরী একটা থলে থেকে বারোশো টাকা বার করে এনে আর-একটা থলিতে পুরে ছেলের হাতে তুলে দিলেন। সন্ধে নাগাদ দু'হাজার টাকার এক পয়সাও রইল না।

পাঁচ

বারো বছর কেটে গেছে। চৌধুরী বিনায়ক সিংহ বা তাঁর ছেলে হরনাথ, দুজনের কেউই আর ইহলোকে নেই। চৌধুরী যতদিন বেঁচে-ছিলেন কুয়োর চিন্তায় তাঁর শান্তি ছিল না। এমন-কি, মরার আগেও কুয়ো-কয়ো করে গেছেন। কিন্তু দোকানে বরাবরই টাকার টানাটানি লেগে থাকত। চৌধুরী চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে কারবার লাটে উঠল। হরনাথ টাকাটা সিকেটা লাভে খুশি থাকতে না পেরে, রাতারাতি বড়োলোক হবার চেষ্টায় লেগেছিল। জুয়া খেলা শুরু করেছিল। বছর না ঘুরতেই দোকানে লালবাতি জ্বলল। গয়না-পাঁতি, বাসনকোসন, সংসারের যথাসর্বস্ব ঘুচে গেল। বাপ গেল যে বছর তার পরের বছর হরনাথও লাভ-লোকসানের পালা চুকিয়ে ভবপারে গেল। হরনাথের মা তাতা একেবারেই নিঃসম্বল হয়ে পড়ল। রোগে পড়ল, ওষুধবিষুধ আর জোটে কোত্থেকে। মাস তিন-চার দুর্ভোগে ভুগে একদিন সেও চোখ বুজল। পরিবারে মানুষ বলতে বেঁচে রইল কেবল হরনাথের অন্তঃস্বত্বা বউ— নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, নিঃস্ব। এ-অবস্থায়, কামিনের কাজ করবে তারও উপায়

নেই। পাড়াপড়শিকে ধরে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে কোনো-মতে পাঁচ-ছ'মাস চালাল। সবাই বলে, লক্ষণ দেখে মনে হয় তোর ছেলে হবে।

বেচারী সেই ভরসায় দিন গোনে। যখন মেয়ে হল, তখন শেষ ভরসাটুকুও ঘুচল। মা এমন পাষাণে বুক বাঁধল, যে মেয়েটাকে একবার বুকেও নেয় না। শেষকালে পড়শিদের অনেক বলাকওয়ায় বুকে যদি-বা নিল, কিন্তু সে-বুকে একবিন্দু দুধ ছিল না। তখন আবার অভাগী মায়ের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। আহা যদি কোনো উপায়ে বুকে এক ফোঁটা দুধ আসত। মায়ের জীবনটা ধন্য হত।

মেয়েটা বড়ো নিষ্পাপ, করুণ চোখে চেয়ে থাকে। তাই দেখে মায়ের বুক ফেটে যায়। কিছু দিতে পারে না, নিরুপায় মা কেবল দু'চোখ ভরে মেয়েকে দেখে। তার অন্তরের আকুতি আশীর্বাদের মতন সন্তানের মাথায় ঝরে পড়ে। জননীর অন্তহীন কল্যাণকামনা, সিক্ত চোখের দৃষ্টি বেয়ে নন্দনের পীযূষধারার মতো অবিরল বয়ে চলে। শিশু তাই পেয়েই খুশি— চাঁদের স্নিগ্ধ সুধাবর্ষণ যেমন পৃথিবীর ফুলকে রাঙিয়ে তোলে।

কিন্তু হতভাগীর কপালে তাও সইল না। মায়ের শরীরে আর-কিছু ছিল না। একদিন পাড়ার মেয়েরা এসে দেখে হরনাথের বউ মেঝেয় পড়ে আছে। আর অবুঝ মেয়েটা শুকনো স্তনে মুখ লাগিয়ে চুষছে। শোকেদৈন্যে জর্জর শরীরে এক ফোঁটা রক্তই ছিল না তো দুধ আসবে কোথা থেকে।

মেয়েটা তবু বেঁচে গেল। পাড়াপড়শির দয়ায়, দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে একদিন বড়োও হয়ে উঠল। এখন ঘাসবিচুলি কাটে। একদিন সেই মেয়ে ঘাস কাটতে কাটতে সেই জায়গায় চলে গেছে— ঠিক যেখানে অনেককাল আগে সেই পিসনহারী বুড়ি গোমতীর কুঁড়ে-ঘর ছিল। ঘরের চাল কবেই মাটিতে মিশে গেছে। কোথাও কোথাও খালি একটু দেয়ালের চিহ্ন রয়ে গেছে। মেয়েটা কী জানি কী খেয়ালে সেইখানে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। দুপুর থেকে সন্ধে অব্দি গর্ত খুঁড়ল। তার যেন ক্ষিদে-তেষ্টাও নেই। ভয়-ডরও নেই।

আঁধার হয়ে এসেছে। সে মেয়ে যেমনকার তেমনি গর্তই খুঁড়ে চলেছে। ভর সন্ধেবেলা। কিষানরাও এসময়ে ও-পথ মাড়ায় না। আর মেয়েটা নিঃশঙ্ক চিত্তে বসে বসে মাটি খুঁড়ছে। আর যখন নজর চলে না, তখন উঠল।

পরদিন খুব ভোরে উঠে মেয়েটা ঘাস কাটতে চলে গেল। সেদিন যত ঘাস কাটল অত ঘাস আর কোনোদিন কাটে নি। বেলা গড়াতেই নিজের কাস্তে খুরপী নিয়ে গোমতীর ভাঙা কুঁড়ের দিকে চলে গেল। আজ আর একা গেল না। যাবার সময় গাঁয়ের দুটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সন্ধে পর্যন্ত তিন জনে মিলে ওখানে 'কুয়ো-কুয়ো' খেলল। মেয়েটা গর্তের ভেতরে বসে মাটি খোঁড়ে আর ছেলেরা সেই মাটি বাইরে ফেলে আসে।

তৃতীয় দিনে ওদের আরো কজন খেলুড়ে সাথী জুটল। সন্ধে পর্যন্ত খেলা চলল। গর্তটা হাত-দুই গভীর হল। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, এই অদ্ভুত খেলায় অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। চতুর্থ দিন আরো কজন ছেলেমেয়ে জুটে গেল। পরামর্শ বসল, কে নীচে নামবে, কে মাটি তুলবে, সব ঠিক হয়ে গেল। গর্ত ইতিমধ্যে হাত চারেক গভীর হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা ছাড়া গাঁয়ের আর-কারুর কিছু জানা নেই।

একদিন রাত্তির বেলা, এক কিষাণের মোষ হারিয়েছে, সে মোষের খোঁজ করতে করতে সেই ভাঙা চালায় এসে পড়েছে। এসে, ভাঙা ঘরের সামনে মাটির পাহাড়, একটা ইয়া বড়ো গর্ত, আর একটা টিমটিমে আলো দেখেই ভয়ে চম্পট। ব্যাপারটা আরো কজনের চোখে পড়ল। একসঙ্গে জনাকয় লোক ছিল, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই। তারা পায়ে পায়ে জায়গাটার কাছে এসে দেখে— চৌধুরী বাড়ির অনাথ মেয়েটা বসে বসে কী করছে। একজন জিজ্ঞেস করলে— হ্যাঁ-রে, গর্তটা তুই খুঁড়েছিস ?

বালিকা জবাব দিল— হ্যাঁ।

'কেন রে, গর্ত খুঁড়ে কী করবি?'

'এখানে কুয়ো বানাব।'

'কুয়ো কী করে বানাবি ?'

বালিকা সহজ নিশ্চিন্ততায় জবাব দেয়— যেমন করে এতটা খুঁড়েছি, তেমনি করেই বাকিটাও খুঁড়ব। আমি আছি, আরো ছেলেরা খেলতে আসে।

'মরেছে। বুঝতে পারছি তুই নিজে তো মরবি, আরো ক'টাকে সঙ্গে নিয়ে মরবি। খবরদার কাল থেকে গর্ত খুঁড়বি না।'

পরের দিন আর সঙ্গীসাথীরা কেউ এল না। হরনাথের মেয়েও দিনভর মজুরী করল। কিন্তু সন্ধের সময় বুড়ির ঝোঁপড়িতে ঠিক বাতি জ্বলল। খুরপী হাতে মাটি খোঁড়াও শুরু হল।

পাড়ার লোকে মারধর করে, ঘরে বন্ধ করে রাখে, কিন্তু একটু চোখের আড়াল হলেই সে মেয়ে তার গর্ত খুঁড়তে ছুটে যায়। হাজার হোক গাঁয়ের মানুষ একটু বিশ্বাসী হয়। বালিকার এই অলৌকিক কুয়ো খোঁড়ার ঝোঁক দেখে তারা আর তাকে বাধা তো দিলই না, বরং ক্রমে নিজেরাও উৎসাহী হয়ে উঠল। কুয়ো খোঁড়ায় নিজেরাও হাত লাগাল।

এদিকে কুয়ো খোঁড়া চলেছে, ওদিকে সেই মাটি দিয়ে মেয়েটা ইঁট বানাতে লেগে গেল। এবার এই খেলায় সারা গ্রামের মানুষ শরীক হয়ে পড়ল। আর মেয়েটা। বেশি রাতে চাঁদ উঠেছে, আর সবাই গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই মেয়ে একলা একলা ইঁট সাজাচ্ছে। কোথা থেকে যে ওর এত অধ্যবসায় আসে, কে বলবে। সাত বছর বয়েস একটা বয়েসই নয়। কিন্তু সাত বছরের এই মেয়েটা বুদ্ধিতে আর কথাবার্তায় নিজের তিনগুণ বয়েসের লোককে ঘোল খাইয়ে দেয়।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই কুয়ো হল। বেশ বড়ো-সড়ো ইঁদারা। পাকা শান বাঁধানো চাতাল। জগমোহন। সেদিন মেয়েটা আর সেখান থেকে নড়ল না। আজ তার আনন্দ আর ধরে না। সে কী তার গান, কী উল্লাস। যেন ঝলমল করছে। রাত্তিরে সেই ইঁদারার পাড়েই শুয়ে রইল।

সকালবেলায় পাড়ার লোকে গিয়ে দেখে মেয়েটা মরে পড়ে আছে। লোকে বলাবলি করতে লাগল— ও মেয়ে আর কেউ নয়, সেই গোমতী বুড়ি। পণরক্ষা করতে এসেছিল। সেই থেকে ঐ কুয়ো-টার নাম— জাঁতাবুড়ির কুয়ো।

পৌষ-নিশীথে

হলকু এসে বউকে বললে— পেয়াদা এসেছে। দাও, যা টাকা আছে দাও, দিয়ে দিই ওকে, গলায় গামছা দিচ্ছে।

মুন্নী ঝাঁট দিচ্ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে বললে— টাকা তো মোটে তিনটে রয়েছে, দিয়ে দেবে তো কম্বল আসবে কী দিয়ে? পোষ-মাঘ মাসের রাত ক্ষেতের ভেতর কাটাবে কী করে? বলে দাও এখন হবে না, ফসল হলে শোধ দিয়ে দোব।

হলকু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও কী করবে বুঝতে পারছে না। পোষের শীত মাথার ওপর, কম্বল ছাড়া ক্ষেতের ভেতর কিছুতেই শোওয়া যায় না। কিন্তু বললে কে শুনছে, মানবে না, গালাগাল দেবে, তড়পাবে। তার চেয়ে বরং ঠাণ্ডায় মরবে, আপদ ঘাড় থেকে বিদেয় হবে তো। এই ভেবে ওর ভারীভুরী গতরটা নেড়ে (নাম হলকু হলে কী হয়) বউয়ের কাছে এসে খোসামোদের সুরে বললে —দে, দিয়ে দে। কী আর করবি। পাপ বিদেয় করি। কম্বলের কিছু একটা উপায় করতে হবে।

মুন্নী ঝটকা মেরে আর-একদিকে চলে গেল। চোখ রাঙিয়ে বললে— তুমি আর করেছ উপায়। কী উপায় করবে, একবার শুনি। কত টাকা ধার রে বাবা, এ যে দেখি শোধই হতে চায় না। তা আমিও বলি, ক্ষেতটেত ছেড়ে দাও-না কেন। মরতে মরতে চাষ কর, তার-পর ক্ষেতের ফসল হলে পাওনাদারের বকেয়া শোধ কর, বাঃ রে, এ তো বেশ মজা। যেন কর্জ শোধ করতেই জন্মেছি। পেটের জন্যে মজুর খাটো। এমন চাষবাসের কাজ আমার মাথায় থাক্। দেব না আমি টাকা, কিছুতেই দেব না।

হলকু করুণ সুরে বলে— তা হলে গালাগাল খাব?

মুন্নী গর্জে উঠল— কে গালাগাল দেবে? কেন? তার রাজত্বে বাস করি?

মুন্নী মুখে এ কথা বললেও ভেতরে ভেতরে তার আর জোর ছিল

না। হলকুর কথাই ঠিক। তার কথার সত্যতা উপলব্ধি করে মুন্নী। ওর কুঞ্চিত ভুরু আস্তে আস্তে সরল হয়ে আসে। হলকুর কথার পেছনে যে রূঢ় সত্য সেটা পোকার মতন ওর মনের ভেতরটায় কুরে কুরে খায়।

ঘরের আড়ায় টাকা রাখা ছিল। মুন্নী টাকা বার করে এনে হলকুর হাতে দিল। বললে— এবার জমি চাষবাস ছেড়ে দাও। মজুরী করে যা জোটে নুন ভাত খেয়ে শান্তিতে থাকব। কারুর চোখ রাঙানি সইতে হবে না তো। মজুরীর রোজগার দিয়ে চাষের কর্জ চোকাও, তার ওপর আবার মেজাজ। ভ্যালা চাষ রে?

হলকু টাকা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল। মনে হল কলজেটাই ছিঁড়ে আনতে গেল। মজুরীর আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে তিনটে টাকা জমা করেছিল এবার কম্বল কিনবে বলে। তা হয়ে গেল কম্বল কেনা। দৈন্যের গ্লানিতে মাথা হেঁট করে হাঁটছিল হলকু, ওর পা চলছে না।

দুই

পোষ মাসের অন্ধকার রাত। আকাশের তারাগুলোও যেন ঠাণ্ডায় শিউরে উঠছে। হলকু তার ক্ষেতের সীমানায় আখপাতার ছাউনির নীচে বাঁশের মাচার ওপর একটা পুরনো চটের চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে কাঁপছিল। মাচার নীচে তার পাহারার সঙ্গী কুকুর জবরা পেটের ভেতর মুখটা সেঁধিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড শীতে কুঁই কুঁই করছিল। দুজনের কারুরই ঘুম আসছে না।

থুতনিটা হাঁটুর সঙ্গে চেপে ধরে হলকু সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলে— কী রে জবরা, শীত করছে? অ্যাঁ। তখনই বলেছিলুম না, যে বাড়িতে খড়ের গাদায় শুয়ে ঘুমো। আমার সঙ্গে আসিস নি? তা নয়। এখন বোঝ, কেমন ঠাণ্ডার গুঁতো। আমি কী করব। কথা তো শুনলে না, ভাবলে আমি এখানে হালুয়া-পুরি খেতে আসছি। দৌড়ে দৌড়ে আগেভাগে চলে এলে। এখন নানীর

নাম ধরে কাঁদো।

জবাবে জবরা ঐখানে পড়ে পড়েই লেজ নাড়াল। তারপর বেশ একটা বিলম্বিত কোঁকানির সঙ্গে একবার বড়োসড়ো হাই তুলে চুপ করল। ওর বুদ্ধিতে ও বোধ হয় আন্দাজ করেছিল যে ওর কোঁকানি-তেই মনিবের ঘুম আসছে না।

হলকু চাদর থেকে হাত বের করে জবরার ঠাণ্ডা কনকনে পিঠের ওপর বুলিয়ে দিয়ে বললে— কাল থেকে আর আসিস নি আমার সঙ্গে। ঠাণ্ডায় জমে যাবি। শালার ভাগাড়ে পশ্চিমে হাওয়ায় যেন বরফ উগরে দিচ্ছে। নাঃ উঠে আর-এক ছিলিম তামাক খাই। কোনো গতিকে রাতটা কাটাতে হবে তো। আট ছিলিম হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ক্ষেতের কাজের এই মজা। আবার দেখোগে এক-এক ভাগ্যিমান এমনও আছে, যার কাছে শীত গেলে গরমের চোটে পালাতে পথ পাবে না। মোটা মোটা গদী, লেপ, কম্বল। শীতের বাপের সাধ্যি কী দাঁত ফোটায়। একেই বলে বরাত। মজুরী করবে একজন, মজা লুটবে আর-একজন।

হলকু উঠল। গর্ত খুঁড়ে আগুন করে রেখেছিল। খানিকটা আংরা নিয়ে কলকে সাজল। জবরাও উঠে বসল।

ছিলিম টানতে টানতে হলকু বলে, কী রে, এক ছিলিম টানবি নাকি? শীত মানায় না কচু হয়, তবে ওই একটু মনটা বুঝ মানে আর কি।

জবরা মনিবের দিকে তাকায়। তার চোখে নিবিড় অনুরাগ।

হলকু— আজকের মতো ঠাণ্ডায় কষ্ট কর। কাল থেকে এখানে খড় বিছিয়ে দোব। খড়ের ভেতর ঢুকে শুয়ে থাকবি, তা হলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না।

জবরা হলকুর হাঁটুর ওপর থাবা তুলে দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। হলকুর মুখে জবরার গরম নিশ্বেস লাগছে।

ছিলিম টেনে হলকু আবার শুয়ে পড়ে। এবার ও সংকল্প করে যত যাই হোক এবার ঘুমোবেই। কিন্তু মিনিট খানেক যেতে না যেতেই বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। একবার এ পাশ,

একবার ও-পাশ— বারবার পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু শীতের পিশাচ কিছুতেই ওর ছাতির ওপর থেকে নামে না।

কিছুতেই শীত বাগ মানছে না দেখে আর থাকতে না পেরে উঠে জবরাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথা চাপড়াতে লাগল। কুকুরের গায়ের তীব্র দুর্গন্ধ নাকে লাগছে, তবুও কোলের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছে, ওর আরাম বোধ হচ্ছে, এমন আরাম অনেকদিন পায় না। হলকুর পবিত্র চরিত্রে জবরার প্রতি ঘৃণার লেশমাত্র নেই; আর জবরার চিত্তে তো স্বর্গসুখ। হলকুর মনে হচ্ছিল নিজের ভাইকে কী কোনো অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে। এমন একটা স্বর্গীয় বোধে ও আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যে এখন আর ওর এত যন্ত্রণার মূল দারিদ্র্য দুর্দশার ওপরেও যেন ওর কোনো আক্রোশ নেই। এই অসম মৈত্রীর প্রেরণায় তার অন্তরে আলোর অজস্র কপাট খুলে গেছে। প্রতিটি অণুকণা আলোয় আলোয় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ জবরা কান খাড়া করল। বোধ হয় কোনো জন্তুর পায়ের আওয়াজ পেয়েছে। হলকুর অন্তরঙ্গ আদরে তার প্রাণে এখন এমন একটা স্ফূর্তির জোয়ার এসেছে যে তার কাছে হিমেল হাওয়ার প্রচণ্ড দাপটও তুচ্ছ। জবরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরে দাঁড়িয়েই ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। হলকু বেশ কয়েক বার মুখে চুমকুড়ি কেটে ডাকল। কিন্তু জবরা এল না। ক্ষেতের চারধারে ভীষণ ছোটাছুটি করে ডাকাডাকি করে বেড়াতে লাগল। একবার যদি বা তাঁবুতে আসে তো আবার পর-ক্ষণেই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। ছুটোছুটি আর ঘেউ ঘেউ বন্ধ হয় না কিছুতেই। ওর ভেতরে কর্তব্যের প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষার মতোই তীব্র, উচ্ছল।

তিন

আরো এক ঘণ্টা কাটল। শীত রাত্তিরের গায়ে হাওয়ার কোড়া মারছে। হলকু উঠে বসল, হাঁটু দুটো জোড় করে ছাতির সঙ্গে সেঁটে ধরল তারপর মাথা ঘাড় মুখ সবসুদ্ধ হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে দিল। তবুও শীত বাগ মানে না। আন্দাজে বুঝল ওর শরীরে আর রক্ত নেই, সব জমে বরফ হয়ে গেছে, আর ধমণীতে হিমের স্রোত বইছে। একবার ঝুঁকে পড়ে আকাশ দেখল আর কত রাত বাকি। সপ্তর্ষি এখনো মাঝ আকাশেও চড়ে নি। মাথার ওপর আসবে, তারপর ভোর হবে। এখনো প্রহর খানেকের বেশি রাত আছে।

হলকুর ক্ষেতের ধার থেকে রশিখানেক দূরেই একটা আম বাগান। এখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে ওখানে গিয়ে পড়ে। পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। বাগানে ঝরা পাতার রাশ জমে আছে। হলকু একবার ভাবল, যাই কিছু পাতা কুড়িয়ে এনে আগুন করি। আগুন না পোহালে ঠাণ্ডা মানবে না। আবার ভাবল এত রাত্তিরে বাগানে পাতা কুড়োতে যাব, কেউ দেখলে ভাববে ভূত। তাতেও কিছু না। কিন্তু ঝোপঝাড়ে কোনো জন্তু-জানোয়ার থাকলেই বিপদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বসে থাকা গেল না। উঠে পড়ল।

পাশের অড়র ক্ষেত থেকে গোটা কতক গাছ উপড়ে নিয়ে একটা ঝাড়ু বানিয়ে নিলে, তারপর তামাকের টিকে ধরিয়ে হাতে নিয়ে আমের বাগিচার দিকে চলল। ওকে আসতে দেখে জবরা কাছে এসে লেজ নাড়াতে লাগল।

হলকু বলল— আর তো থাকা যায় না রে জবরু। চল বাগানে গিয়ে পাতা কুড়িয়ে আনি। একটু গরম হয়ে নিয়ে তারপর আবার শোওয়া যাবে।

জবরা কুঁই কুঁই করে সম্মতি জানাল। দুজনেই বাগিচায় চলল। বাগানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। হিংস্র বাতাসে ঝরা পাতার রাশ দলে মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। গাছের ওপর থেকে শিশিরের ফোঁটা টপটপিয়ে মাটিতে পড়ছে।

বাতাসে কোথা থেকে মেহেদী ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। হলকু

বলে— আঃ ভারি মিষ্টি গন্ধ রে জবরু। তোর নাকে গন্ধ লাগছে?

মাটিতে একটা কিসের হাড় পড়েছিল। জবরা তাই নিয়ে চিবোতে ব্যস্ত ছিল। আগুন ভুঁয়ে রেখে হলকু পাতা জড়ো করতে লাগল। খানিকক্ষণের ভেতরেই বেশ অনেকগুলো পাতা জড়ো হল। ঠাণ্ডায় হাত কাঁপছিল। খালি পা দুটো অবশ হয়ে আসছিল। তবু হলকু পাতার পাহাড় জমা করছে। এবার আগুন জ্বলবে। এই আগুনের কুণ্ডে হলকু শীতকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

একটু পরেই আগুন জ্বলে উঠল। তার ওপরমুখো শিখা বাড়তে বাড়তে গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সেই চঞ্চল আগুনের আলোয় বাগানের বড়ো বড়ো গাছের ছায়াগুলো কাঁপছে। মনে হচ্ছে ঐ দৈত্যাকার গাছেরা যেন অন্ধকার মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। সেই অন্তহীন আঁধারের সমুদ্দুরে এই খণ্ড আলোর নৌকোখানা এদিক ওদিক দুলতে লাগল, কাঁপতে লাগল।

ঝরাপাতার কুণ্ডের সামনে বসে হলকু আগুন তাপাচ্ছে। একবার গা থেকে দোলাইটা খুলে বগলে চেপে রেখে পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়াল। যেন ঠাণ্ডাকে উস্কানি দিচ্ছে— 'এই নে কী করবি কর।' শৈত্যের বিপুল শক্তিমত্তাকে খর্ব করতে পেরে ওর মনে এখন একটা বিজয় উল্লাস। লুকোবে কী করে।

একবার জব্বরকে ডাকে— কীরে জবরা, আর শীত করছে না তো? জব্বর চাঁদ গাঁইগুঁই করে বলে— কিসের শীত বল দিকি?

'আচ্ছা আগে কেন খেয়াল হয় নি বল তো। তা হলে আর কষ্ট পেতে হত না।' জব্বর লেজ নাড়ায়।

'আচ্ছা আয় এই আগুনটা লাফিয়ে পার হই। দেখি কে পারে। তবে পুড়ে গেলে বল, আমি কিছু জানি না। ওষুধ আরাম করতে পারব না।'

জবরা অগ্নিকুণ্ডের দিকে কাতর নেত্রে তাকাল।

'দেখিস মুন্নীকে কাল বলে দিস নি যেন। তা হলে ঝগড়া হবে।' এই বলে হলকু এক লাফ মারল। জ্বলন্ত পাতার রাশ টপকে ওপারে গিয়ে পড়ল। পায়ে একটু আঁচ লাগল; কিন্তু তেমন কিছু নয়।

জবরা আগুনের চারপাশে ঘুরে ফিরে এসে একপাশে দাঁড়াল। হলকু বলে— দাঁড়িয়ে দেখছ কী, টপকাতে হবে, নাও লাগিয়ে দাও। লাফ দিয়ে পেরোও। জবরা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল।

চার

পাতার রাশ জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। বাগানে আবার যে কে সেই অন্ধকার। ছাইয়ের নীচে কিছু কিছু আগুন রয়ে গেছে, হাওয়ার ঝোঁকে এক-একবার জ্বলে উঠেই আবার নিবে আসছে। হলকু আবার চাদর মুড়ি দিয়েছে। গরম আংরার পাশে আরাম করে বসে গুনগুন করে গান ধরেছে। ওর গা গরম হয়ে গেছে, কিন্তু যেমন শীতে জাঁকিয়ে পড়ছে, তেমনি ওকে আলসেমিতে পেয়ে বসছে।

জবরা আবার জোরে চীৎকার করে উঠল। ঘেউ ঘেউ করতে করতে ক্ষেতের দিকে দৌড়ল। হলকুর মনে হল একপাল জানোয়ার বোধ হয় ওর ক্ষেতে পড়েছে। কে জানে হয়তো নীল গাইয়ের দল। ওর কানে পরিষ্কার ভেসে এল— লাফানি আর দৌড়নোর শব্দ। মনে হল ক্ষেতে চরছে। কী যেন চিবোচ্ছে। চিবোনোর চকচক আওয়াজ পর্যন্ত ওর কানে আসছে।

হলকু মনে মনে বললে – নাঃ জবরা থাকতে কোনো প্রাণী ক্ষেতে আসতে পারবে না। ও নখে ছিঁড়ে ফেলবে। ও আমার ভুল। কই আর তো কই শোনা যাচ্ছে না। কী শুনতে কী শুনেছি।

ও জোরে আওয়াজ দিল— জবরা, জবরা।

জবরা কিন্তু ডেকেই চলেছে ? হলকুর ডাকেও এল না।

আবার ক্ষেরের কিনারায় পায়ের শব্দ। এবার কিন্তু স্পষ্ট। ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ার চিন্তাও বিষের মতন লাগছে এখন। আহা কেমন আঁটোসাঁটো হয়ে বসেছি। এই ঠাণ্ডার মাঝখানে এখন ক্ষেতে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারের পেছনে ছোটা-ছুটি ওর অসহ্য মনে হল। ও জায়গা থেকে নড়ল না।

ও ওখানে বসে বসেই সজোরে চেঁচাল— হিলো। হিলো। হিলো।

জবরা আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল। জানোয়ার ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে। চষে বেড়াচ্ছে। তৈরি ফসল। বড়ো ভালো ফসল হয়েছিল এবার। হায় হায়, হতভাগা জানোয়ারগুলো সব শেষ করে দিচ্ছে। —যাঃ যাঃ, যাঃ।

এবার যাবেই বলে নিশ্চয় করে উঠে দাঁড়াল হলকু, কয়েক কদম এগোল। কিন্তু হঠাৎ এমনি সময়ে ছুঁচবেঁধানো ঠাণ্ডা হাওয়া এসে কাঁকরাবিছের মতো হুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ হলকু ফিরে এসে আগুনের পাশে বসে পড়ল। ছাই খুঁড়ে খুঁড়ে আঁচ বার করে শরীর গরম করতে লেগে গেল।

ওদিকে জবরা গলা ফাটিয়ে চলেছে। নীলগাইয়ের পাল গোটা ক্ষেত তছনছ করে দিচ্ছে। এদিকে হলকু গরম আংরার আঁচে আগুন পোহাচ্ছে। শান্ত হয়ে বসে আছে। ওর চারদিকে এখন আলস্য আর শৈথিল্যের এক অবিশ্বাস্য বেড়াজাল। যার কঠিন ফাঁস ছাড়িয়ে ওর নড়ার ক্ষমতা নেই। তারপর কখন এক সময়ে সেই গরম ছাইয়ের পাশে চাদর-ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিকে রোদে ঝলমল করছে। মুন্নী ওকে ডাকছে। বলছে— কী, আজ সারাদিন ঘুমোবে? তুমি এদিকে এখানে এসে আয়েসে শুয়ে আছ, ওদিকে ক্ষেতের সর্বনাশ হয়ে গেছে।

হলকু উঠে পড়ল। বলল— তুমি ক্ষেত হয়ে এলে নাকি?

মুন্নী— হ্যাঁ। পুরো ক্ষেত তছনছ হয়ে গেছে। হ্যাঁ গো, এমন করে কেউ ঘুমোয়? তোমার এখানে টং বানিয়ে শোবার কী দরকার ছিল? কী লাভ হল।

হলকু সাফাই গায়— তোমার তো ক্ষেতের চিন্তা। এদিকে আমি মরতে বসেছিলুম। পেটে এমন অসহ্য ব্যথা, যে সে আমিই জানি।

দুজনে ক্ষেতের সীমানায় এল। দেখে, সারা ক্ষেত ধামসে দিয়ে গেছে। আর জবরা মাচানের নীচে চিত হয়ে শুয়ে আছে। যেন

ধড়ে জ্ঞান নেই। দুজনেই ক্ষেতের দশা দেখছিল। মুন্নীর মুখে বিষাদের ছায়া। হলকু কিন্তু প্রসন্ন। মুন্নী বলে—এখন মজুর খেটে মালগুজারি ভরতে হবে। হলকু খুশি মুখেই বললে—তা হোক। রাত্তিরে ঠাণ্ডায় ক্ষেতে পাহারা দিতে আসতে হবে না তো।

বড়ো ঘরের মেয়ে

বেণীমাধব সিংহ গৌরীপুর গ্রামের জমিদার এবং নম্বরদার। তাঁর পিতামহ একসময়ে ঐ অঞ্চলে ধনধান্যসম্পদে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের শানবাঁধানো দীঘি এবং মন্দির, ইদানীং যা সংস্কারের বাইরে চলে গেছে সেগুলি তাঁরই কীর্তিস্তম্ভ। শোনা যায় সেকালে এই দেউড়িতে হাতি বাঁধা থাকত, এখন সেখানে একটা বুড়ো মোষ বাঁধা থাকে, যার কাঠামোর হাড়পাঁজরা ছাড়া আর-কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবে মোষটা দুধ নিশ্চয় এখনো খুব বেশি পরিমাণে দেয়। তা না হলে সব সময়েই একজন-না-একজনকে তার বাঁটের কাছে হাঁড়ি হাতে ঘুরতে দেখা যায় কেন। বেণীমাধব সিংহ তাঁর সমুদায় সম্পত্তির আদ্ধেক উকিল-মোক্তারদের ভেট দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় হাজার টাকার ঊর্ধ্বে নয়। ঠাকুর সাহেবের দুই পুত্র। বড়ো শ্রীকণ্ঠ সিংহ বহুদিনের পরিশ্রম ও বহু উদ্যমের পর সম্প্রতি বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এখন এক আপিসে চাকরবৃত্তি করেন। ছোটোছেলে লালবিহারী দোহারা গড়নের পেটানো শরীর, মজবুত জোয়ান। ভরাট মুখ, দরাজ ছাতি। সকালে উঠেই টাটকা মোষের দুধ সের দুয়েক ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে। শ্রীকণ্ঠ আকৃতি ও প্রকৃতিতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রীতিবর্ধক গুণরাজি তিনি বি. এ. এই অক্ষর দুটির বেদীতে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন। এই দুই অক্ষর তাঁর দেহকে দুর্বল তথা মুখকে কান্তিহীন করে ফেলেছে। তার দরুন চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থাদির প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। আয়ুর্বেদীয় ওষুধে তাঁর বেশি বিশ্বাস। প্রায়ই সাঁঝসকালে তাঁর ঘর থেকে খলনুড়ির সুশ্রাব্য সুরলহরী কানে আসে। লাহোর আর কলকাতার বিশিষ্ট বৈদ্য ভিষকদের সঙ্গে তাঁর ঘনঘন পত্রবিনিময় ঘটে থাকে।

ইংরেজী ডিগ্রির অধিকারী হয়েও শ্রীকণ্ঠ কিন্তু ইংরেজী আচারবিচারের পক্ষপাতী ছিল না। বরং ও-সবের বিরুদ্ধে কটু

সমালোচনা করত। তাতে করে গ্রামে তার সম্মান আরো বেড়ে গিয়েছিল। দশহরার উৎসবে উৎসাহের সঙ্গে গ্রামের রামলীলায় যোগ দিত আর যাত্রাগানে স্বয়ং কোনো-না-কোনো ভূমিকা গ্রহণ করত। বলতে কি, ওদের গ্রামে রামলীলার সে-ই ছিল উদ্যোক্তা। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার গুণগান করা ওর ধর্মপ্রবণতার প্রধান অঙ্গ ছিল। একান্নবর্তী পরিবারের প্রাচীন প্রথার প্রতি শ্রীকণ্ঠ ছিল একান্ত অনুরক্ত। আজকালকার মেয়েরা যে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে একত্র বসবাস করতে নারাজ হয়, তার মতে ঐ মনোভাব দেশ ও জাতির হিতের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। এই একটি কারণে গৌরীপুর গ্রামের ললনারা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কেউ কেউ তো তাকে নিজেদের শ্রেণীশত্রু বলে বিবেচনা করত। অন্যে পরে কা কথা, তার স্ত্রীর সঙ্গেই তার এ বিষয়ে ঘোরতর মতদ্বৈধ ছিল। তার কারণ— এ নয় যে তার বউ শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-জা নিয়ে ঘর করতে অপছন্দ করত; আসলে বউয়ের মতে সব কিছু সয়ে বয়ে নেবার পরেও যদি বনিবনাও না হয়, সে ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ করে এক জায়গায় বাস করার চেয়ে আলাদা থাকাই শ্রেয়, এবং অনেক বেশি ভদ্র-বিধান।

আনন্দী বড়ো বংশের মেয়ে। তার বাপ একটা ছোটো রাজ্যের তালুকদার। বিশাল বাড়ি, একটা হাতি, তিনটে কুকুর, ঘোড়া, শিকরে বাজ, ঝাড় লণ্ঠন আর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আর সর্বোপরি ঋণ— যা কিনা প্রতিষ্ঠিত তালুকদারের মর্যাদার দ্যোতক— সবই তাঁর বিদ্যমান। ভূপ সিংহ উদারচেতা প্রতিভাশালী পুরুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর একটিও ছেলে নেই। সাত-সাতটি মেয়ে, এবং দৈবের আনুকূল্যে সব ক'টিই বিলক্ষণ জীবিতা।

প্রথম তিন মেয়ের বিয়েতে বাপ একেবারে আহ্লাদে কল্পতরু হয়েছিলেন। কিন্তু পনেরো বিশ হাজার টাকার কর্জ মাথায় চেপে বসার পর চোখ খুলল, একটু হাত গুটোতে শিখলেন। আনন্দী চতুর্থী কন্যা। বোনেদের ভেতরে সেই রূপেগুণে সর্বোত্তমা। বাপের আদর-ভালোবাসাও এই মেয়ের ওপরই বেশি। সুন্দর সন্তান

বোধ হয় মা-বাপের বেশি প্রিয় হয়ে থাকে। এ মেয়ের বিয়ে কোথায় দেব— এই নিয়ে ঠাকুর ভূপ সিংয়ের খুব চিন্তা ছিল। এক দিকে যেমন ঋণের বোঝা না বেড়ে যায় সে চিন্তাও ছিল, আবার এও না হয় যে, মেয়ে ভাবল আমায় যেমন-তেমন করে পার করেছে। এই সংকটকালের মধ্যেই একদিন শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়— সে কিসের যেন চাঁদা চাইতে এসেছিল। সম্ভবত নাগরী-প্রচারের চাঁদা। ভূপসিংহ মশায় শ্রীকণ্ঠের আচার-ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ধুমধামের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংয়ের সঙ্গে আনন্দীর বিয়ে হয়ে গেল।

আনন্দী শ্বশুরবাড়ি এল। এখানকার চালচলন একেবারেই আলাদা। বাপের বাড়িতে যেরকম ছিমছাম কেতাদুরস্ত চলনে ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত, এ বাড়িতে তার লেশমাত্র নাই। হাতি-ঘোড়া তো দূরস্থান, একটা সাজানো-গোছানো সুন্দর গোরুর গাড়ি পর্যন্ত নাই। রেশমী স্লিপার এনেছিল, বাক্সয় তোলা রইল— বাগান কোথায় যে বেড়াবে! ঘরে নেই জানলা, মেঝেয় নেই ফরাস, দেয়ালে একখানা ছবি বলতে নেই। সাদামাঠা পাড়াগাঁর গেরস্ত বাড়ি। কিন্তু আনন্দী অল্পদিনেই এখানে এমন সুন্দর মানিয়ে নিল-- নতুন অবস্থায় এমন খাপ খাইয়ে নিল যে কে বলবে জীবনে কখনো বিলাসের জিনিস চোখে দেখেছে।

দুই

একদিন দুপুরবেলা লালবিহারী দুটো পাখি মেরে আনল। ভাজকে ডেকে বলল— তাড়াতাড়ি রান্না করো, বেজায় খিদে পেয়েছে। আনন্দী রান্নাবান্না সেরে বহুক্ষণ থেকে দেওরের পথ দেখছিল। এখন আবার নতুন করে মাংস রাঁধতে বসল। বোয়েম খুলে দেখল ঘি পোয়াটাকের বেশি নেই। বড়ো ঘরের মেয়ে, কিপটেমি করতে শেখে নি। সবটুকু ঘি মাংসে ঢেলে দিল। লালবিহারী খেতে বসে দেখে, ডালে ঘি দেওয়া হয় নি। বলল— ডালে ঘি দাও নি কেন?

আনন্দী বলল — ঘি সবটা মাংসয় পড়েছে। লালবিহারী গলার জোর বাড়ায়, বলে— এই পরশুদিন ঘি এল, এর মধ্যে উঠে গেল ?

আনন্দী জবাব দেয়— আজ তো পোয়াখানেক ঘি পড়ে ছিল, সেটুকু সব মাংসতেই লেগে গেছে।

শুকনো কাঠে তাড়াতাড়ি আগুন ধরে। খিদের মুখে মানুষ তেমনি সামান্য কথায় জ্বলে ওঠে। ভাজের টেঁটামি লালবিহারীর অসহ্য লাগল। চটেমটে বলল — অ, বাপের বাড়িতে বুঝি ঘিয়ের নদী-নালা বয়ে যায়।

মেয়েদের গাল দাও, মারো বকো সব সহ্য হবে, কিন্তু বাপের বাড়ি তুললে সহ্য হবে না। আনন্দী মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিলে— মরা হাতি লাখ টাকা। বুঝেছ ? এইটুকু ঘি সেখানে রোজ চাকর-বাকরেই খায়।

লালবিহারীর আর কাণ্ডজ্ঞান রইল না। ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে— কথা শুনলে জিভ টেনে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করে।

আনন্দীও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মুখ লাল করে বলল— ও আজ বাড়ি থাকলে তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিত।

এদিকে বাড়ির কর্তাবাবুর টনক নড়েছে। বউয়ের এত তেজ তাঁর সহ্য হল না। তাঁর গিন্নিটি সামান্য জোতদারের মেয়ে ছিলেন। ইচ্ছে মতন তাঁর গায়ে হাত তোলা যেত। রাগ না সামলাতে পেরে খড়ম তুলে আনন্দীকে তাগ করে সজোরে ছুঁড়ে দিলেন। মুখে বললেন — যার জন্যে এত গুমোর, তাকেও দেখাব আর তোমাকেও দেখাব। আনন্দী হাত দিয়ে খড়মটা ধরে ফেলল ব'লে মাথাটা বাঁচল। বাতাস লাগা পাতার মতন রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে এসে খিল দিল। মেয়েছেলের বলভরসা মান-ইজ্জত সবই স্বামীকে নিয়ে। স্বামীর ক্ষমতা আর পৌরুষ নিয়ে তার গর্বও কম নয়। দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে রইল।

তিন

শ্রীকণ্ঠ শনিবার শনিবার বাড়ি আসে। এটা এক বেস্পতিবারের ঘটনা। আনন্দী ঝাড়া দু-দুটো দিন গোসাঘরে খিল দিয়ে রইল। অন্নজল মুখে দিল না, স্বামীর আসার অপেক্ষায় রইল। শনিবার যথারীতি সন্ধের সময় শ্রীকণ্ঠ বাড়ি এল। এসে কিছুক্ষণ বাইরের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা বলল, দেশকালের খবরাখবর নিয়ে, নতুন মামলা-মকদ্দমা নিয়ে খানিক আলাপ-আলোচনা চলল। পাড়ার ভদ্রলোকদের এ-সব ব্যাপারে এমন প্রবল উৎসাহ যে নাওয়া-খাওয়ার ঠিক থাকে না। শ্রীকণ্ঠর ইচ্ছে থাকলেও উঠে আসা সম্ভব হয় না। এদিকে এই দু-তিন ঘণ্টা আনন্দীর প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে কাটে। শেষে রাত দশটা বাজতে খাবার ডাক পড়ল। আড্ডা ভাঙল। নিরিবিলি হ'লে, লালবিহারী দাদাকে বলল— দাদা, তুমি বউদিকে একটু বুঝিয়ে দিয়ো যেন মুখ সামলে কথাবার্তা বলে, নইলে একদিন অনর্থ ঘটে যাবে।

বেণীমাধববাবুও ছেলের পক্ষে সাক্ষী দিলেন— হ্যাঁ, বউ-ঝির এরকম স্বভাব তো ভালো নয়। বেটাছেলের মুখে মুখে তক্ক করা ভারি বদ অভ্যেস।

লালবিহারী— উনি বড়ো ঘরের মেয়ে আছেন থাকুন। তা বলে আমরাও কিছু কুর্মী কাহার নই।

শ্রীকণ্ঠ উদ্‌বিগ্ন স্বরে বলে— ব্যাপারটা কী হয়েছে শুনি না।

লালবিহারী— কিছুই না, নিজে থেকেই ফোঁস করে উঠল। বাপের বাড়ির দেমাকে আমাদের মানুষ বলেই মনে করেন না।

শ্রীকণ্ঠ খেয়ে উঠে আনন্দীর কাছে গেল। সে তো মেজাজ নিয়ে বসেই ছিল। ইনিও তিরিক্ষি মেজাজে ছিলেন। আনন্দী জিজ্ঞেস করে— কী মনমেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

শ্রীকণ্ঠ— ভীষণ ঠাণ্ডা আছে। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো। সংসারে অশান্তি করছ কেন?

আগুনে ঘি পড়ল। আনন্দী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল— কে

তোমাকে এ খবর দিলে, তাকে পেলে একবার তার মুখটা মেঝেয় রগড়ে দিই।

শ্রীকণ্ঠ — এত গরম হচ্ছ কেন। যা বলছি তার জবাব দাও-না।

আনন্দী — কী জবাব দেব। আমার কপাল, তা নইলে একটা গোঁয়ার ছোকরা, যার চাপরাসীগিরির মুরোদ নেই, সে কিনা খড়ম তুলে মারতে আসে, চোখ রাঙিয়ে কথা বলে।

শ্রীকণ্ঠ — সব কথা খুলে বলো। যাতে বুঝতে পারি। না শুনলে বুঝব কী করে।

আনন্দী — পরশুদিন তোমার পেয়ারের ভাইয়ের মাংস রাঁধবার হুকুম হল। হাঁড়িতে পোয়াটাকের বেশি ঘি ছিল না। সেটুকু মাংসয় লেগে গেছে। খেতে বসে বলছে— ডালে ঘি দাও নি কেন। আমি বললুম— ঘি আর নেই। ব্যস। এই কথাতেই আমার বাপের বাড়ি তুলে যাচ্ছেতাই করতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলুম না। বললুম এটুকু ঘি আমাদের বাড়ির ঝি-চাকরে খায়। আর যাবে কোথায়। আমার মাথায় খড়ম ছুঁড়ে মারে। হাত দিয়ে ধরেছিলুম বলে রক্ষে, নইলে মাথাটাই ফেটে যেত। জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি মিথ্যে বলেছি কি সত্যি বলেছি।

শ্রীকণ্ঠর চোখ লাল হয়ে উঠল। বললে— এত বড় আস্পদ্দা হয়েছে ছোঁড়ার।

মেয়েদের চোখের জল হাতধরা। আনন্দী কাঁদতে থাকে। শ্রীকণ্ঠ খুবই শান্ত আর ধৈর্যশীল মানুষ, সহজে তার রাগ হয় না। কিন্তু মেয়েদের কান্না পুরুষের রোষের আগুনে ইন্ধন জোগায়। রাতভর এপাশ ওপাশ করতে থাকে। বেশি উদ্‌বেগ থাকলে লোকে চোখ বুজতে পারে না। ভোর হতেই বাপকে গিয়ে বলে— বাবা, এ বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না।

ঠিক অনুরূপ দ্রোহভাবের উক্তির জন্যে এর আগে কতদিন কত বন্ধুকে এক হাত নিয়েছে। অথচ এমনি দুর্ভাগ্য, যে আজ নিজের মুখেই সেই কথা উচ্চারণ করতে হচ্ছে।

শ্রীকণ্ঠ ভাবে—অপরকে উপদেশ দেওয়া কত সহজ।

বেণীমাধববাবু সচকিত হয়ে ওঠেন। বলেন— কেন?

শ্রীকণ্ঠ— কারণ মানসম্মান সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আছে। এ বাড়িতে মানসম্মান বজায় রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়েছে। গোঁয়ার্তুমি— ইতরোমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বড়োদের সম্মান রাখা দূরের কথা, ছোটোরা তাদের অপমান করছে। আমি পরের চাকর, বাড়িতে থাকতে পারি না। এদিকে আমার অসাক্ষাতে মেয়েদের জুতো ছুঁড়ে খড়ম ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। কথা-কাটাকাটি হয়, এক-কথার জায়গায় দু-কথা হয়, সে অমন হয়েই থাকে সংসারে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু এরকম অভদ্র ব্যবহার মুখ বুজে সয়ে যাব, সেরকম শিক্ষা আমার নয়।

বৃদ্ধ বেণীমাধব খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এ পর্যন্ত শ্রীকণ্ঠ তাঁর মুখের সামনে কোনোদিন এ-ধরনের কথা বলে নি। সে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করে থাকে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর, শুধু বললেন বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে এমন কথা বলছ। মেয়ে-ছেলেরা এই ভাবেই ঘর ভাঙে। তাদের অমন মাথায় তোলা ভালো নয়।

শ্রীকণ্ঠ— সে আমি জানি বাবা। আপনার আশীর্বাদে অত মূর্খ আমি নই। আপনি জানেন, আমি নিজেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ-গ্রামের অনেক ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু স্ত্রীর মান-সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব আমার, সেটা পালন না করলে আমি ভগবানের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ব। তার প্রতি এরকম অমানুষিক আচরণ আমি কেমন করে সহ্য করব। আপনাকে সত্য বলছি, লালবিহারীকে যে আমি কিছু বলি নি, এই ঢের।

এবার বেণীবাবুও কিছুটা গরম হলেন। কাঁহাতক এ-সব কথা শোনা যায়। বলেন— লালবিহারী তোমার ভাই, তার কিছু দোষ-ঘাট দেখলে তুমি একশো বার শাসন করবে,তার কান ধরে ···

শ্রীকণ্ঠ — ওকে আর আমি ভাই বলে ধরি না।

বেণী - বউয়ের কথায়?

শ্রীকণ্ঠ— আজ্ঞে না, তার গোঁয়ার্তুমি আর অভদ্রতার জন্যে।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকেন। বেণীমাধব ছেলের রাগ জুড়িয়ে যাক সেটা চাইলেও, লালবিহারী যে কোনো অন্যায় করেছে এটা মানতে রাজি নন। ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েকজন পরদুঃখকাতর সজ্জন তামাক খাবার অছিলায় বৈঠকখানায় এসে জমে বসেন। মেয়েমহলে যেই কথাটা চাউর হয়ে গেল যে শ্রীকণ্ঠ বউয়ের হয়ে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবে বলে কোমর বাঁধছে, তাদের পুলক দেখে কে। তরজার লড়াই শোনবার জন্যে তারা ভেতরে ভেতরে আকুল হয়ে রইল। গ্রামে এমন লোকেরও অভাব ছিল না। যারা এ বাড়ির সম্প্রীতি দেখে মনে মনে হিংসায় পুড়ত। তারা বলত —শ্রীকণ্ঠ বাপকে মেনে চলে, এটা মেনিমুখো। লেখাপড়া করে, কাজেই বইয়ের পোকা। আবার বেণীমাধব যে বড়ো ছেলের পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজ করেন না, সেটা তাঁর আহাম্মকী। এই মহানুভবদের দীর্ঘকালের শুভেচ্ছা আজ সফল হতে চলেছে, আনন্দ হবারই কথা। তাঁদের কারোর হুঁকোর তেষ্টা পেল, কেউ খাজনার রসিদ হাতে নিয়ে দেখা করতে এলেন। বেণীমাধবও আজকের লোক নন। অতিথি-দের মনের কথা তিনি বুঝে ফেললেন। মনে ভাবলেন, আমার বাড়ির ভেতরে যাই ঘটুক এই নচ্ছারদের তা নিয়ে বগল বাজাতে দোব না। হেসে মোলায়েম গলায় ছেলেকে বললেন— ছেলেমানুষ দোষ করে ফেলেছে। তা আমি আর কী বলব। তুমি রয়েছ ওর মাথার ওপর। যা ভালো বুঝবে করবে। আমার কী আর আলাদা কোনো মত আছে।

এখন এ-সব কূটনীতির চাল— এলাহাবাদের অনভিজ্ঞ তপ্তমস্তিষ্ক গ্রাজুয়েট কী বুঝবে। তার অভ্যাস ডিবেটিং ক্লাবে বসে নিজের যুক্তি আঁকড়ে ধরে থাকা। এরকম ঘোরপ্যাঁচের কথা তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাপের কথার নিগূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে না পেরে বলে— লালবিহারীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বেণীমাধব— ওরে বাবা, বুদ্ধিমান লোকে কখনো মুখ্যুর কথা ধরে? ওটা গোঁয়ার, ওর কি আক্কেল আছে, না বিবেচনা আছে? তুমি বড়ো

ভাই, ওর দোষঘাট তো তোমাকে মাপ করে নিতেই হয়।

শ্রীকণ্ঠ— না, ওর এ-সব ইতরোমো আমি সহ্য করব না। হয় ও এ-বাড়ি ছাড়বে না-হয় আমি ছাড়ব। আপনার কাছে যদি ও বেশি আদরের হয় তো আমাকে বিদেয় দিন। আমি নিজের ভার নিজেই সামলাতে পারব। আর যদি আমাকে রাখতে চান, ওকে বলে দিন, যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। বাস এই আমার শেষ কথা।

লালবিহারী এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বড়ো ভায়ের কথা শুনছিল। দাদাকে সে খুবই সমীহ করে। এখনো সাহস করে তার সামনে খাটে বসে না, পানতামাক খাওয়া তো দূরের কথা। ও দাদাকে যত মান্য করে বাবাকেও তত করে না। শ্রীকণ্ঠেরও ভায়ের ওপর আন্তরিক স্নেহের টান ছিল। এলাহাবাদ থেকে বাড়ি আসার সময়, ভায়ের জন্যে কিছু-না-কিছু হাতে করে আসবেই। শখ করে ভাইকে মুগার চাদর কিনে দিয়েছে। গতবার নাগপঞ্চমীর দিন কুস্তির আখড়ায় লালবিহারী যখন নিজের দেড়া চেহারার এক পালোয়ানকে চিৎ করে দিল, তখন শ্রীকণ্ঠ দৌড়ে গিয়ে আখড়ার মধ্যেই ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পাঁচ টাকার হরির লুট দিল। সেই দেবতার মতন ভাইয়ের মুখে এরকম কটু কথা বেরোতে শুনে লালবিহারী আত্মগ্লানিতে কুঁকড়ে গেল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এ কথা ঠিক যে ওর এখন কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপের অন্ত নেই। আসলে ভাই আসবার আগে থেকেই ও ভয়ে ভয়ে ছিল, যে দাদা সব শুনে কী বলবে। লজ্জাও করছিল খুব। দাদা ডাকলে কোন্ মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়াব, চোখ তুলে কথা বলব কোন্ লজ্জায়। তবুও মনে ভরসা ছিল, দাদা ডেকে বকবে, কিংবা বুঝিয়ে বলে দেবে। কিন্তু তার বদলে দাদা এইরকম রুক্ষ আর গম্ভীর হয়ে উঠবে, এটা সে ধারণাও করতে পারে নি। লালবিহারী ছেলেটা মূর্খ হলে কী হবে তার মনটা বড়ো নরম। এর চেয়ে যদি দাদা আড়ালে ডেকে দুটো ধমক দিত, কী কান ধরে দুটো চড় লাগিয়ে দিত, তার এত দুঃখ হত না। কিন্তু দাদা এটা কী বললে। আমার মুখ দেখবে না, আমি ওর ভাই নই। এই নিদারুণ পরিণতি লালবিহারীর সহ্য হল

না। সে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল। তারপর চোখ মুছে ফেললে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে সে কাঁদছিল, তারপর জামাকাপড় পরে বেরিয়ে আনন্দীর দোরগোড়ায় এসে বললে— বউদি, দাদা স্থির করেছে এ-বাড়িতে আমার সঙ্গে আর থাকবে না। আমার মুখ দেখতে চায় না। তাই আমি চলে যাচ্ছি। আর দাদাকে আমার মুখ দেখতে হবে না। আমি তোমার কাছে যা অপরাধ করেছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা কোরো।

কথা বলতে গিয়ে লালবিহারীর গলা ধরে এল।

চার

আনন্দী মোক্ষম চটে গিয়ে লালবিহারীর নামে নালিশ ক'রে এখন মনে মনে পস্তাচ্ছিল। আসলে ওর দয়ামায়ার শরীর, ভারি কোমল স্বভাবের মেয়ে। ব্যাপারটা যে এতটা বেশি ঘোরালো হয়ে পড়বে, তা বুঝতে পারে নি। এখন আবার মনে মনে স্বামীর ওপরেই রাগ করছে— সামান্য কথা নিয়ে এত গরম হতে কে বলেছিল। ওর ভয়ের আরো বড়ো কারণ ছিল। এসে এখনই যদি বলে এলাহাবাদ চলো, তো কী করে যাব। ঠিক এমনি সময় দেওর এসে ক্ষমা চেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ও আর থাকতে পারল না। কেঁদেই ফেলল। আর চোখের জল ছাড়া মনের ময়লা ধোবার এমন বস্তু আর দ্বিতীয় নেই।

লালবিহারী যখন আনন্দীর দোরে দাঁড়িয়ে, সেই সময় শ্রীকণ্ঠ বাইরে থেকে এদিকে আসছিল। কিন্তু ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ঘেন্নার রাগে মুখ ফিরিয়ে আবার বাইরে চলে গেল। যেন ওর ছায়া মাড়ালেও পাপ।

আনন্দী দৌড়ে এসে স্বামীকে ধরল— ছোটো বাইরে দাঁড়িয়ে বড্ড কাঁদছে।

শ্রীকণ্ঠ— তা আমি কী করব?

আনন্দী— ভেতরে ডেকে আনো। আমার মুখে আগুন, ছিঃ এ

এ আমি কী আপদ করলুম।

শ্রীকণ্ঠ— আমি ডাকতে পারব না।

আনন্দী— অমন কোরো না গো, লক্ষ্মীটি, ডেকে আনো। বেচারার খুব কষ্ট হয়েছে, বাড়ি থেকে চলে যেতে চাইছে।

শ্রীকণ্ঠ গোঁ ধরে বসে রইল। লালবিহারী গৃহত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আর-একবার ভাজের দোরে এল, বললে— বউদি আমি চললুম দাদাকে এখান থেকেই প্রণাম করে গেলুম, বলে দিয়ো। দাদা তো আমার মুখ দেখতে চায় না, তাই আর মুখ দেখাব না। এই বলে লালবিহারী প্রায় দৌড়ে সদর দোরের দিকে যেতে থাকে। আনন্দী ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে। লালবিহারীর চোখে জল, মুখ ফিরিয়ে বলে— আমায় যেতে দাও।

আনন্দী— কোথায় যাচ্ছ ?

লালবিহারী— যেখানে কেউ আমার মুখ দেখতে পাবে না।

আনন্দী— না,আমি যেতে দেব না।

লালবিহারী— আমি তোমাদের সঙ্গে বাস করার উপযুক্ত নই।

আনন্দী— আমার দিব্যি যদি আর এক-পা বাড়াও।

লাল— তোমার আর দাদার মন থেকে আমার ওপর রাগ না গেলে এ-বাড়িতে আমি থাকবই না, কিছুতেই না।

আনন্দী— দিব্যি করে বলছি আমার তোমার ওপর আর এক ফোঁটাও রাগ নেই।

এবার শ্রীকণ্ঠও গলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে ভাইকে বুকের মধ্যে জাপটে নিল। দুই ভাই গলা জড়াজড়ি করে খুব খানিক কাঁদল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে লালু বললে— দাদা, তুমি গালমন্দ যা খুশি দাও, কিন্তু 'মুখ দেখব না' এ-কথা আর কখনো বোলো না।

আধ বোজা গলায় দাদা বললে— লালু, এ-সব কথা ভুলে যা। ভগবান করুন, এরকম কাণ্ড আর যেন আমাদের না হয়।

বার বাড়ি থেকে আসতে আসতে বেণীমাধব সব দেখেছিলেন। দুই ভাইকে গলাগলি করতে দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন,

—এই না হলে আর বড়ো ঘরের মেয়ে। ভাঙা হাট জোড়া দিতে ওস্তাদ।

গাঁসুদ্ধ লোকে যে শুনলে সেই শতমুখে আনন্দীর সুখ্যেত করলে—'দেখ, বড়ো বংশের মেয়ে কাকে বলে।'

দ্বিতীয় শৈশব

খুব বুড়ো বয়সে অনেকের যেন ছেলেবেলা ফিরে আসে। বুদ্ধিরামের বুড়ি কাকীর শেষ বয়সে এক জিভের আস্বাদ ছাড়া আর-কিছু চাহিদা ছিল না। আর কাঁদাকাটা ছাড়া নিজের দুঃখুকষ্টের কথা কাউকে জানাবারও আর কোনো উপায় হাতে ছিল না। চোখ কান হাত পা সমস্ত ইন্দ্রিয় জবাব দিয়ে দিয়েছে। বাড়ির লোকে তার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করলে, কিংবা খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও খেতে না পেলে, কি বাজার থেকে ভালোমন্দ এলো অথচ ওর পাতে না পড়লে— মাটিতে পড়ে পড়ে কেঁদে ভাসানো ছাড়া বুড়ি কাকীর আর গতি ছিল না। আর কান্নাকাটি মানে মামুলী ফোঁপানি কান্না নয়, সে কপাল চাপড়ে, গলা ফাটিয়ে পাড়া জাগিয়ে কান্না।

বিধবা হয়েছে, সেও অনেক কালের কথা। সোমত্ত ছেলেটা বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মরে গেল। নিজের বলতে এক ভাসুরপো, তার নামেই সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। সম্পত্তি লেখানোর সময় ভাসুরপো অনেক লম্বা চওড়া প্রতিজ্ঞা করেছিল। তা ওরকম আড়কাটির দালালরাও কুলিদের অনেক বারো হাত ছাতার কুঁড়ো দেখিয়ে থাকে। সম্পত্তি থেকে বছরে কোন্ না দেড়শো দুশো টাকা আয় হয়। অথচ বুড়ির ভরপেট খাওয়াও সময় মতন জোটে না। এই অবস্থার জন্যে বুড়ির ভাসুরপো পণ্ডিত বুদ্ধিরামই দায়ী, না তার অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী রূপা সুন্দরীই দায়ী, তা বলা শক্ত। বুদ্ধিরাম মানুষটা স্বভাব-সজ্জন যতক্ষণ না তার লেজে পা পড়ে। রূপা তীব্র-স্বভাবা কিন্তু ধর্মভীরু। অতএব বুড়ি কাকীর পক্ষে রূপার খরখরে মেজাজ যত না পীড়াদায়ক, ভাসুরপোর ভালোমানুষি-পনা তার চেয়ে অনেক বেশি তেতো।

বুদ্ধিরামের মনে মাঝে মাঝে কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা আসত। মনে হতে— আহা এই সম্পত্তির দৌলতেই আমি গণ্যমান্য হয়ে

বসেছি। দুটো মুখের কথা খরচ করা, স্তোক-দেওয়া কি মন-ভুলোনো এ-সবে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু পয়সা খরচ হবার ভয়ে তার সব শুভ সংকল্প দমে যেত। তাই ঘরে-বাইরের লোকজন কেউ এলে, কাকীবুড়ি হয়তো তার সামনেই সানাইয়ের পোঁ ধরে দিলো, তখন আর বুদ্ধিরামের মাথার ঠিক থাকে না। বুড়িকে আচ্ছা মতন দাবড়ে দেয়। ছেলেপুলেদের স্বভাবতই বুড়োবুড়িদের ওপর কেমন একটা জাত আক্রোশ থাকে। তায় মা-বাপের ঐ রীত দেখে আরো প্রশ্রয় পায়—বুড়িকে জ্বালিয়ে খায়। কেউ চিমটি কেটে পালায়, কেউ কুলকুচো করে গায়ে ছিটিয়ে দেয়। কাকী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে। কিন্তু সবাই জানে, বুড়ি খালি খাবার জন্যেই কাঁদে। কাজেই তার বিলাপে কেউ কান দেয় না। আবার কখনো যদি ক্ষেপে গিয়ে চ্যাংড়া-চেংড়িদের গালাগাল দেয়, তা হলে উলটো বিপত্তি। স্বয়ং গৃহকর্ত্রীই হয়তো ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। সেই ভয়ে বুড়ি তার জিভ বড়ো-একটা আলগা হতে দেয় না। যদিও উপদ্রব শান্তির সেটাই খানিকটা সার্থক উপায়।

গোটা পরিবারের মধ্যে কেবল একটি প্রাণীর বুড়ির ওপর আন্তরিক দরদ ছিল—সে বাড়ির ছোটো মেয়ে লাভলি। দুই মারকুটে ভায়ের ভয়ে সে তার ভাগের মোয়াটা নাড়ুটা নিয়ে বুড়ির ঘরে পালিয়ে আসত, সেখানে বসেই খেত। জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ। বুড়ি একটু হ্যাংলামি করে ভাগ বসালেও, ভাইগুলোর মতন ডাকাতি তো করবে না। তাই. আত্মরক্ষার জৈব তাগিদ থেকে দুজনের মধ্যে একটা খাঁটি সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল।

দুই

সেদিন রাত্তিরবেলা বুদ্ধিরামের বাড়িতে উৎসব। সানাই বাজছে। গ্রামের ছেলের দল অবাক হয়ে শুনছে। অতিথি-অভ্যাগতরা খাটিয়ায় বসে বিশ্রাম করছেন, নাপিতরা দলাইমলাই করে দিচ্ছে। কাছে দাঁড়িয়ে ভাট পদাবলী শোনাচ্ছে। রসজ্ঞ অতিথিরা 'বাঃ বাঃ'

করছেন, শুনে ভাট খুশিতে অযথা ডগমগ হয়ে উঠছে, যেন তাকেই তারিফ করা হচ্ছে। ইংরেজী পড়া দু-একজন যুবক রয়েছেন, তাঁরা উদাসীন। এ-সব গেঁয়ো কাণ্ডকারখানার মধ্যে থাকা, কি কোনো কথা বলা, তাঁদের প্রেস্‌টিজের পরিপন্থী বলে মনে করেন।

আজ বুদ্ধিরামের বড়ো ছেলের তিলকের উৎসব। ভেতর-বাড়িতে মেয়েরা গান গাইছে। রূপা অতিথিদের জন্যে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ভিয়েন বসেছে। কোথাও পুরি ভাজা হচ্ছে, কোথাও কচুরি। কোথাও কড়াইয়ে রসের জ্বাল হচ্ছে। একটা পেল্লায় হাঁড়িতে মসলাদার তরকারী চেপেছে। চারদিকে ঘি আর মশলার সুগন্ধ ম' ম' করছে। লোকের ক্ষিদে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

কাকী বুড়ি তার কুঠুরির এক কোণে পড়ে রয়েছে। শোক-তাপের জ্বালার মতন নিঃসঙ্গ। রান্নাঘরের সুরভি তাকে থেকে থেকে উতলা করে তুলছে। মনে মনেই বলছে, পুরি কচুরি কি আর আমায় দেবে, দেবে না হয়তো। এতখানি রাত হল কেউ খাবার নিয়ে এল না। মনে হচ্ছে, সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে। আর হয়তো কিছু বাঁচে নি। ভেবে ভেবেই বুড়ির কান্না পাচ্ছে। কিন্তু অকল্যাণের ভয়ে কাঁদতে পারছে না।

'আহা রে, কী মিষ্টি গন্ধ। আর আমার কথা কি কারুর খেয়াল আছে। দুটো শুকনো রুটি, তাই সময়ে পাতে পড়ে না, তা আবার লুচিপুরি জুটবে ; সেই ভাগ্যি কি আমার!' ভেবে ভেবে কান্নায় বুক ফুলে ওঠে, মনে হয় কলজেটা বুঝি ফেটেই যাবে। তবু রূপার ভয়ে মুখ বুজে চুপ করে বসে থাকে।

বুড়ি চুপ করে বসে বসে এই-সব দুঃখের কথা ভাবে। আর ওদিকে ভিয়েনের ঘিয়ের গন্ধ, রসের গন্ধ, মনকে স্থির থাকতে দেয় না। থেকে থেকে জিভে জল আসে। কতদিন লুচিপুরি খায় নি। তার আস্বাদ মনে করে ভেতরটায় কেমন সুড়সুড়ি লাগে। কাকে ডাকা যায়। ছোটো খুকিটা অন্যদিন ঘুরঘুর করে। আজ আর দেখা নেই। ছোঁড়া দুটো রোজ সারাক্ষণ জ্বালিয়ে মারে। আজ তাদেরও টিকি দেখতে পাচ্ছে না। সব গেল কোথায় কে জানে। মনে হয় আজ

বাড়িতে একটা কিছু হচ্ছে।

বুড়ির কল্পনায় পুরির ছবি ভাসতে থাকে। লাল লাল, গরম গরম ফুলকো। রূপা খুব ভালোই আয়োজন করেছে। কচুরির ময়দায় জোয়ান আর এলাচের ময়েন দেওয়া হয়েছে। আহা একখানা পেলেও একটু হাতে করে দেখে। একবার হেঁসেলে গিয়েই দেখবে নাকি। কড়াইয়ের সামনে বসে বসে দেখা— তার মজাই আলাদা। ছ্যাঁক ছোঁক কল্‌কল্ করে ভাজা হচ্ছে। কড়াই থেকে গরম গরম ছেঁকে তুলে পরাতে রাখা হচ্ছে। তার দৃশ্যই আলাদা। ফুলদানির ফুলও ফুল, আবার বাগানের সাজানো কেয়ারির ফুলও ফুল— তফাত কত! এই-সব সাতপাঁচ ভেবে, বুড়ি উবু হয়ে বসে, হাতে ভর দিয়ে থপ্‌থপ্ করে অতি কষ্টে চৌকাট পেরিয়ে, প্রায় হামা টানতে টানতে গিয়ে ভিয়েনের কড়ার পাশে চেপে বসে। ধৈর্য ধরে বসে থাকে— পেটুক কুকুর যেমন ভোজনরত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, তেমনি ক'রে।

রূপার কাজের অন্ত নেই। এঘর-ওঘর করছে, রান্না দেখছে, ভাঁড়ার সামলাচ্ছে। কেউ দৌড়ে এসে বলছে— 'মহারাজ ঠাণ্ডাই চাইছে', তাকে ঠাণ্ডাই বার করে দিচ্ছে। কেউ বলছে— 'ভাট এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে'— ভাটকে সিধে বার করে দিচ্ছে। আর-একজন এসে বলছে— 'রান্নার তো এখনো দেরি আছে, একটু ঢোল-দোতারা দাও, বাজাব'— বেচারা একলা হাতে সব তদারক করে বেড়াচ্ছে, হিসসিম খেয়ে যাচ্ছে। অস্থির হচ্ছে, উত্ত্যক্ত হচ্ছে, অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে - কিন্তু রাগ করবে কখন, মরবার ফুরসত পাচ্ছে না। তা ছাড়া রাগারাগি করাটা ভালো দেখায় না। পাড়ার মেয়েরা ভাববে, বাড়িতে একটা কাজ হচ্ছে তাতে একটু গায়ে আঁচ লেগেছে কি না লেগেছে রেগেই খুন হচ্ছে! তেষ্টায় গলা কাঠ, গরমে নাকাল— তা এমন একটু ফাঁক পাচ্ছে না, যে এক ঢোঁক জল গলায় ঢালবে, কি একটু পাখাটা টেনে বসবে। আবার ভাবনাও আছে, একটু চোখের আড়াল হয়েছে কী জিনিসপত্তর চক্ষুদান হয়ে যাবে। এই যখন অবস্থা, তখনই নজরে পড়ল— খুড়-শাশুড়ি বুড়ি এসে ভিয়েনের কড়ার

পাশে চেপে বসেছে। দেখেই গা জ্বলে গেল। যাবারই কথা। এমন বেয়াক্কেলে বুড়ি। আশপাশে পাড়ার লোক গিজগিজ করছে। কী বলবে, কী ভাববে, কোনো বিবেচনাই নেই। ব্যাঙ যেমন লাফ দিয়ে পড়ে কেঁচো ধরে, রূপা তেমনি করে কাকী বুড়ির ওপর পড়ল। দু হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দেয় আর বলে— ওমনি পেটে আগুন লেগেছে। উঃ পেট না রাবণের চিতা? বলে দিয়েছি হাজার বার, ঘরে বসে থাকবে, বেরোবে না। ঘরে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, না? দৌড়ে এসেছে উঠোনে। এখনো কুটুম-সাক্ষেত বাইরের লোকের পাত পড়ল না, ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হল না, এর মধ্যেই নোলা সকসকিয়ে উঠেছে। অমন নোলায় আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। সারাদিন না খেয়ে থাকতে হলে না জানি কার হাঁড়িতেই গিয়ে মুখ দেবে। পাড়ার লোক দেখলে বলবে কী যে বুড়িটা বোধ হয় খেতে পায় না, তাই ছোঁকছোঁক করে বেড়াছে। ডাইনী মরেও না, মাচাও ছাড়ে না। গুষ্টির নাম ডোবাবে, পাড়াসুদ্ধ লোকের সামনে নাক কান কাটাবে, তবে চিতায় উঠবে। এত যে গেলো দিবারাত্তির, যায় কোথায়। শীগ্‌গির ওঠা, ভালো চাও তো চুপ করে গিয়ে ঘরে বসে থাকো। যখন বাড়ির সবাই খেতে বসবে, তখন তুমিও পাবে। তুমি এমন কেউ পটের ঠাকরুণ নও, যে আর-কেউ মুখে জল দিক না-দিক, তোমার পুজো আগে সারতে হবে।

বুড়ি ঘাড় হেঁট করে রইল। কাঁদল না, একটা আওয়াজ বের করল না। তারপর আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে মেরে নিজের কুঠুরিতে গিয়ে ঢুকল। রূপার কর্কশ ভাষণ আর রুক্ষ ভঙ্গিতে এমন একটা চুম্বক ছিল যে বুড়ি স্নায়ুর সব প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে একে-বারে জবুথবু হয়ে গেল। নদীতে ধস নামলে, পাড়ের বড়ো পাথরের চাঙাড় যখন ঝপাং করে পড়ে, তখন সব জল সেই জায়গায় দৌড়য়। বুড়ির মগজ জুড়ে এখন কেবল বউয়ের বকুনির ঝনঝনা।

তিন

পরিবেশনের প্রস্তুতি হচ্ছে। উঠোন জুড়ে পাতা পড়েছে। অতিথি-কুটুমরা খেতে বসলেন। বউ-ঝিয়ের দল 'জেওনার-গীত'* গাইছে। নাপিতকাহার চাকরবাকর যারা সব মেহমানদের সাথেই এসেছে, তারাও বসেছে — একটু দূরে। একটু ব্যবধান কিন্তু একই পঙ্‌ক্তি। কাজেই সকলের খাওয়া না হলে কেউ আগে উঠতে পারবে না। এই শিষ্টাচার। অভ্যাগতদের ভেতর যাঁরা একটু লেখাপড়া জানা, তারা লোকজনদের বিলম্বিত ভোজন নিয়ে একটু ভ্রূকুটি করছেন, এবং 'এক সঙ্গে উঠব' বলে এই অহেতুক বসে থাকার সাবেক প্রথার কিছু মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছেন না।

ঘরে ঢোকার পর কাকীবুড়ির মনে খুব ঘেন্না এল— আমি কোথা থেকে কোথায় নেবেছি, ছিঃ। রূপার ওপর রাগ হল না। নিজের অধৈর্যের ওপর ক্ষোভ হল। সত্যিই তো, বাইরের লোকের এখনো খাওয়া হয় নি, বাড়ির লোক গিলতে বসবে কি। আমার এতটুকুও তর সইল না। লোক হাসালুম। ছিঃ ছিঃ! আর নড়ছি না। কেউ ডাকতে না এলে আর যাব না।

মনে মনে সংকল্প করে বুড়ি বসে রইল। কখন ওর ডাক পড়বে, ভেতরে ভেতরে তারই প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে রইল। মনকে বোঝায়, কিন্তু মন বাগ মানে না। বাতাসে ঘিয়ের সুবাস ভেসে আসে, মন আবার অধীর হয়ে ওঠে। এক এক পল, এক এক যুগের মতো দীর্ঘ মনে হয়। ততক্ষণে নিশ্চয় পাত বিছোনো হয়েছে। অতিথিস্বজন সব এসে গেছে। নাপিত সকলকে হাত-পা ধোবার জল দিচ্ছে। এবার মনে হয় লোকে আসনে বসেছে। 'জেওনার' গাওয়া শুরু হয়েছে। ভাবতে ভাবতে বুড়ি মনকে ভোলানোর জন্যে একটু শুয়ে পড়ে। গুনগুন করে গান করতে থাকে। আবার ভাবে, গাইতে

---

*ভোজনপর্বের সময় আঞ্চলিক রেওয়াজ অনুযায়ী সমবেত কণ্ঠে যে গান গাওয়া হয়।

গাইতে বুঝি দেরি হয়ে গেল। কই কারো কোনো সাড়া পাচ্ছি না তো। এতক্ষণে তা হলে সবাইকার খাওয়া হয়ে গেছে। খেতে কি আর মানুষের এত দেরি হয়। কই কেউ তো ডাকতে এল না। কে জানে, ডাকবে কি না। রূপা রেগে গেছে। হয়তো ভাবছে, ডাকতে হবে কেন, কুটুম নাকি, ঘরের লোক, খিদে পেলে নিজেই আসবে। বুড়ি যাবে বলে আবার উঠে বসে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে. ওই তো এক্ষুনি লুচি-তরকারি পাতে পড়বে -- ভাবতেই জিভে জল এসে যায়। মনে মনে নানান রকম করে চাখে— আগে তরকারি দিয়ে পুরি খাব, তারপর দই-মিষ্টি দিয়ে, কচুরি খেতে হয় রায়তার সঙ্গে— তবে তো জিভে স্বাদ লাগে। আমি বাপু চেয়ে চেয়ে খাব, তা তোমরা ভালোই বল আর মন্দই বল। লোকে বলবে বুড়ির আক্কেল নেই, নোলা সামলাতে পারে না— এই তো। তা বলুক গে। অ্যাদ্দিন পরে লুচি জুটছে, জিভে ঠেকিয়েই উঠে আসবে নাকি।

আবার উবু হয়ে বসে হাতের তেলোয় ভর করে ব্যাঙের মতন থপথপিয়ে উঠোনে চলে আসে। হা ভগবান। পোড়া লোভ আবার ভীমরতি ধরিয়েছে। কারুর খাওয়া হয় নি। লোকজনের এখনো খাওয়া শেষ হয় নি। সবে-এক আধ জনের হয়েছে। তারা কেউ আঙুল চাটছে, কেউ টেরছা চোখে তাকিয়ে দেখছে অন্যের পাত খালি হয়েছে কি না। কেউ চিন্তিত— পাতায় দুটো কচুরি পড়ে রইল— ভেতরে চালান করতে পারলে বড়ো ভালো হত। কেউ দই খেয়ে জিভ দিয়ে চক্‌চক্ টক্‌টক্ শব্দ করছে। আর-এক দোনা চাইবে কিনা ভাবছে। দ্বিধা সংকোচ করছে— ঠিক এমনি সময়ে কাকী বুড়ি উঠোনে গিয়ে হাজির— একেবারে কজনের মাঝখানে। তারা চমকে পাত ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। হৈ-চৈ করে ওঠে— আরে আরে, এ বুড়িটা কে রে! এ কোত্থেকে এল। দেখিস দেখিস, ছুঁয়ে না দেয় কাউকে।

কাকীকে দেখে বুদ্ধিরামের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। পুরির থালা হাতে নিয়ে পরিবেশন করতে যাচ্ছিল। থালাখানা সেইখানে

আছড়ে ফেলে দিয়ে, রক্তচোষা মহাজন গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ানো জোচ্চর খাতককে দেখলে যেমন ক্যাঁক্ করে টুঁটি টিপে ধরে, হুবহু তেমনি করে লাফ দিয়ে এসে কাকীর ওপর পড়ে। তার হাত দুখানা ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার কুঠুরির ভেতর আছাড় মেরে ফেলে দেয়। বুড়ির অনেক আশার সাজানো বাগান এক ঝড়ে তছনছ হয়ে যায়।

নিমন্ত্রিতগণ খেয়েদেয়ে বিদায় নিলেন। বাড়ির সবাইয়ের খাওয়াদাওয়া সারা হল। বাজনদারেরা খেল, ধোপা মুচি মায় মেথরদের পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু বুড়িকে কেউ ডাকতে এল না। বুদ্ধিরাম আর রূপা দুজনেই স্থির করেছিল যে বুড়ির বেহায়াপনার একটু শাস্তি হওয়া দরকার। তার বুড়ো বয়েস, অথর্বদশা, বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থার প্রতি তাদের কোনো অনুকম্পা জাগল না। একমাত্র লাভলির বুকের ভেতরটা বুড়ির জন্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। বেচারীর বুড়ির ওপর আন্তরিক টান ছিল। মেয়েটার মনটা ভারি নরম। ঐ বয়সে ছেলেমেয়েদের যেটুকু চপলতা থাকে ওর তাও ছিল না। আজ আনন্দের দিনে, দু-দুবার মা আর বাবা বুড়িকে অমন নির্দয় হয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ায় তার কচি মনে বড্ড লেগেছিল। মা-বাপের ওপর মনটা বিরূপ হয়ে ছিল। কী হয়েছে কাকীকে কটা পুরি দিলে? নেমন্তন্নর লোকেরা কি সবগুলো খাবে। তাদের আগেই যদি বুড়ো মানুষকে দুখানা দাও, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ভেবেছিল কাকীর কাছে গিয়ে একটু আদর করবে, কিন্তু মায়ের ভয়ে পারে নি। সে তার ভাগেরটা না খেয়ে লুকিয়ে পুতুলের বাক্সয় রেখে দিল কাকীকে দেবার জন্যে। লাভলি মনে মনে অধীর হয়ে উঠল। কাকীবুড়ি আমি ডাকলেই উঠে বসবে। তারপর পুরি দেখলে কী আনন্দই হবে বুড়ির। আমায় কত আদর করবে। খুব মজা হবে।

চার

রাত এগারোটা বেজে গেছে। রূপা উঠোনে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। লাভলির চোখে ঘুম নেই। কাকীকে পুরি খাওয়াবে, সেই আনন্দে। পুতুলের পেঁটরাটা হাতে নিয়ে শুয়ে আছে। মা ঘুমিয়ে পড়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠল তো। এবার ভাবনা, যায় কী করে। সারা বাড়ি অন্ধকার। সবাই ঘুমোচ্ছে। খালি উনুন-গুলোতে একটু একটু আংরা পড়ে আছে, তারই একটু মিটমিটে আলো। আর উনুনের পাশে একটা কুকুর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। উঠোনের ওপাশের দোরের সামনাসামনি একটা নিমগাছ। লাভলির সেই গাছের দিকে চোখ গেল। মনে হল নিমগাছের ডালের ওপর হনুমানজী বসে রয়েছেন। সেই লেজ, সেই গদা পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলে লাভলি। ইতিমধ্যে কুকুরটা জেগে উঠে ঘেউ ঘেউ করে। লাভলির এবার সাহস হয়। কটা ঘুমন্ত মানুষের বদলে একটা জাগা কুকুর ওকে অনেক ভরসা দেয়। পুতুলের বাক্সটা বগলে চেপে, লাভলি পা টিপে টিপে কাকী বুড়ির ঘরের দিকে এগোয়।

পাঁচ

বুড়ি অনেকক্ষণ ঘরের মেঝেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘোর কাটতে একটু একটু করে সব মনে পড়ল। কে একজন তার হাতদুটো খুব জোরে চেপে ধরেছিল। ব্যস। তারপরেই যে কী হল— কে যেন তাকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল— ওর হাত-পা বারবার পাথরে ঠুকে যাচ্ছিল— তার-পরেই কেউ ওকে পাহাড়ের ওপর থেকে তুলে আছড়ে দিল। আর কিছু মনে নেই। সব অন্ধকার। কিন্তু এখন কী হবে। বুঝতে পারছে, সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ভাগ্যও ঘুমোচ্ছে! এদিকে পেটে চিতা জ্বলছে। কী খাবে। রাতটা কী করে কাটবে।

ওদের একটু দয়াও হল না যে বুড়িটা কবে বলতে কবে মরে যাবে— তার মনে কষ্ট দিয়ে কী হবে। পেটে ছুটো দেওয়া, এ বই আর তো কিছু চাই না তোদের কাছে। তার জন্যে আমার এই দুর্দশা করলি। আমি অথর্ব হয়েছি, কানা-কালা বুড়ি, চোখে দেখি না কানে শুনি না। বুঝতে পারি নি, খাবার জায়গায় গিয়ে পড়েছি। তা বুদ্ধিরাম তো বলতে পারত যে কাকী এখন ঘরে যাও, পরে এসো। তা নয়, সকলের সামনে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল, আর এমন করে আছাড় মারল। দুখানা লুচির জন্যে বউ সবার সামনে গালাগাল দিল, ছেলে ধরে মারল। এত দুর্গতি করেও ওদের পাষাণ প্রাণ গলল না। বাড়ির সবাই খেল, কুকুর বেড়ালটাও খেল। শুধু আমায় সারারাত না খেতে দিয়ে ফেলে রেখে দিল। আর এত রাতে নিশ্চয় কিছু বাঁচে নি। বাঁচলেও কি আর এখন কেউ দিতে আসবে।

কাকী হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল। কান্নায় গলা বুজে এল। তবু কাঁদল না, বাড়িতে লোক এসেছে। হঠাৎ কানে এল— কাকী ওঠো, পুরি এনেছি তোমার জন্যে। লাভলির গলা। বুড়ি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে নাতনিকে কোলে বসায়। লাভলি পুতুলের কৌটো থেকে পুরি বার করে ঠাকুমার হাতে দেয়। বুড়ি জিজ্ঞেস করে— হ্যাঁরে, তোর মা দিলে বুঝি ?

লাভলি বলে— না, আমি আমার ভাগেরটা নিয়ে এসেছি। কাকী পুরির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটে পেঁটরা খালি। লাভলি জিজ্ঞেস করে— কাকী, পেট ভরেছে ?

দারুণ গ্রীষ্মে ছুফোঁটা ইলসেগুড়িতে গরম আরো বেড়ে যায়। বুড়ির ওটুকুতে কী হবে। খিদে আরো বেড়ে গেল। বলে না রে মা, তোর মার কাছ থেকে আর খানকয়েক চেয়ে আন।

লাভলি বলে— মা ঘুমোচ্ছে, ঘুম ভাঙালে মারবে।

কাকী পুরির মোড়কটা ঝেড়ে ঝেড়ে, টিপেটুপে দেখে, ঝুরো গুঁড়ো যা লেগে ছিল চেটে চেটে খায়। ঠোঁট দিয়ে জিভ চাটে, চুকচুক শব্দ ক'রে।

বুড়ির মন ক্রমেই অধীর হয়ে ওঠে। আরো কটা পুরি না পেলে

উতলা মন আর শান্ত হবার নয়। তার সংযমের বাঁধন ভেঙে পড়েছে। দুখানা লুচি যেন তপ্ত বালির কড়ায় দু-ফোঁটা জল। মদের ভাবনা যেমন মাতালকে আতুর করে তোলে, তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, বুড়ির সেই অবস্থা হল। লাভলির হাত দুটো দু-হাতে চেপে ধরে বলে— তুই আমায় একবার নিয়ে চল্ তো মা উঠোনে, যেখানে নেমন্তন্নর পাত পড়েছিল।

লাভলি বুড়ির মতলব অত বুঝতে পারে না। বুড়িকে ধরে ধরে উঠোন পার করে এঁটো পাতার রাশের পাশে বসিয়ে দেয়। কাণ্ড-জ্ঞানহীন ক্ষুধার্ত বৃদ্ধা আঁস্তাকুড়ের রাশীকৃত উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে পাত-কুড়োনো পুরির টুকরো তুলে অম্লান বদনে মুখে দেয়। আহা কী স্বাদ, কচুরিগুলো কী চমৎকার খেতে, কী খাস্তা, কী মোলায়েম। বুড়ির ভিমরতি হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও খেয়াল আছে যে, যা করছি, তা ঘোর অন্যায়। আমি অন্যের এঁটো পাতা চাটছি। কিন্তু বুড়ি নিরুপায়। বার্ধক্য— অন্তিম লালসার কাল। বাসনা একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয়। কাকীবুড়ির বাসনা তার জিভে এসে সংহত হয়েছে। তার উপায় নেই।

ঠিক এই সময়ে রূপা চোখ মেলে। ঠাহর করে বোঝে, যে লাভলি পাশে নেই। চমকে ওঠে, চারপাইয়ের নীচে উঁকি মারে— যদি পড়েটড়ে গিয়ে থাকে। কোথাও খুঁজে না পেয়ে উঠে বসে। হঠাৎ নজরে পড়ে লাভলি এঁটো পাতার রাশির পাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে —আর কাকীবুড়ি পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে চেটে চেটে খাবারের উচ্ছিষ্ট খুটে খাচ্ছে। রূপার হৃৎপিণ্ডে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। যেন দাঁড়িয়ে দেখছে, ওর চোখের ওপর কেউ গোরু জবাই করছে। অন্যের উচ্ছিষ্ট ফেলে দেওয়া পাতা আদাড় থেকে কুড়িয়ে খাচ্ছে—ওর শাশুড়ি, ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী, বিধবা। হা ঈশ্বর। রূপা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। মনে হয় ওর পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মাথার ওপরে আকাশ ভেঙে পড়ছে। এবার প্রলয় আসবে। সব ভেসে যাবে। এ সংসার ছারখার হয়ে যাবে। রাগ নয়, বিস্ময় নয়— অথৈ শোকে, বিস্তর অনুশোচনার আগুনে আর প্রচণ্ড ভয়ে রূপা যেন

পাথর হয়ে যায়। অনুতাপে, অনুকম্পায়, বেদনায় ওর দুচোখ ভরে ওঠে। তারায় ভরা অনন্ত অন্ধকার আকাশের দিকে হাত জোড় করে রূপা আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে— আমি মহাপাপ করেছি দয়াময়, আমাকে ক্ষমা করো। আমার সন্তানদের দয়া করো। এই অধর্মের শাস্তি আমাকে দিয়ো না, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নিজের স্বার্থপরতা আর নীচতার চেহারা দেখে রূপা আঁতকে উঠেছে। নিজেকে নিজে বলে— ছিঃ ছিঃ ছিঃ, যার সম্পত্তির আয় সংসারের সবাইয়ের ভোগে লাগছে, তার এই দুর্গতি। আর আমিই তার মূল। হে ভগবান, আমি অন্ধ, আমার পাপ তুমি নিয়ো না দয়াল। আমায় রক্ষা করো। আমি পাতকী। আজ আমার ছেলে তিলকের শুভকাজ। এত শ' শ' লোক খেয়ে গেল। আমি তাদের হুকুমের বাঁদীর মতো খাটলুম। নামযশের আকাঙ্ক্ষায় শ' শ' টাকা খোলামকুচির মতন খরচ করলুম। কিন্তু যার দৌলতে এ সংসারে আমদানী, উৎসবের অন্তে তাকে স্বেচ্ছায় অভুক্ত রাখলুম। তাকে, এক নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণের বিধবাকে আজ শেষ বয়সে আঁস্তাকুড়ের উচ্ছিষ্ট খুঁটে খেতে বাধ্য করলুম। আমার এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

রূপা উঠে প্রদীপ জ্বালে। ভাঁড়ার ঘরের দোর খুলে, যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী থালায় সাজিয়ে খুড়শাশুড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

মধ্যরাত্রির আকাশে তারার পিদিম সাজিয়ে দেবতারা হয়তো কোন্ উৎসবে মত্ত। কিন্তু তাঁদের হর্ষকে ম্লান করে দিল কাকীবুড়ির অজস্র অনাবিল আনন্দ— যখন দেখল রূপা তার সামনে খাবারের থালা হাতে দাঁড়িয়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রূপা বলল— কাকী ওঠো, খেয়ে নাও। আমার আজ বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে, তুমি রাগ দুঃখু কোরো না। ভগবানকে একটু ডাকো, যেন তিনি আমায় ক্ষমা করেন।

অপাপবিদ্ধ শিশুরা যেমন মেঠাইমোণ্ডা পেলে মার বকুনি সব ভুলে গিয়ে আনন্দ করে, বুড়িও তেমনি সব লাঞ্ছনা অনাদর মুহূর্তে ভুলে

গিয়ে খাবারের থালায় মশগুল হয়ে পড়ল। তার প্রতি রোমকূপ যেন হর্ষোচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠল। তার চোখেমুখে সর্বাঙ্গে অকৃত্রিম কল্যাণকামনার বিচ্ছুরণ ঘটতে লাগল। রূপা বসে বসে এই স্বর্গীয় আনন্দের দৃশ্য দু'চোখ ভরে পান করতে লাগল।

মর্যাদার বেদী

এ সেই সময়কার কথা, যখন চিতোরে মধুসংলাপী মীরাবাঈ তৃষিত আত্মার মুখে ভগবৎ প্রেমের সুধাপাত্র তুলে ধরত। ভক্তিবিহ্বলা রানী যখন রণছোড়জীর মন্দিরে তার মধুস্রাবী কণ্ঠে ভক্তিরসের পদাবলী গাইত, শ্রোতারা তখন তাই শুনে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে পড়ত। পিপাসায় ব্যাকুল গাভীদল যেমন সরোবর দেখে তার দিকে ধেয়ে যায়, সারা চিতোরের লোক তেমনই দিব্য আনন্দের খোঁজে প্রতিদিন মন্দির-পানে দৌড়ে যেত। এই প্রেমামৃত-সাগরে শুধু চিতোরবাসীরাই অবগাহন করত এমন নয়, সমগ্র রাজপুতানার মরু-ভূমিই সেদিন এই ভক্তিগীতের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল।

একবার এমন হল, যে একদিকে ঝালাবাড়ের রাওসাহেব, অন্যদিকে মন্দার রাজ্যের রাজকুমার দুজনেই একসঙ্গে লোকলস্কর সমেত চিতোরে এলেন। রাওসাহেবের সঙ্গে তাঁর মেয়ে প্রভাও এসেছে। প্রভার রূপলাবণ্য তখন একটা জনশ্রুতির ব্যাপার। একদিন এই রণ-ছোড়জীর মন্দিরেই দুজনের চোখাচোখি হল। অলক্ষ্য থেকে পঞ্চশর বর্ষিত হল।

মন্দার কুমার সারাদিন উদাস চোখে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। রাজকুমারী বিরহাতুরা, অন্দর-মহলের ঝরকা থেকে চোখ বাড়িয়ে থাকে। দিনমানের অস্থিরতা সন্ধ্যা এলে জুড়োয়। মন্দিরে সবার অলক্ষ্যে চাঁদের সঙ্গে কুমুদিনীর চোখে চোখে মিলন হয়।

পারস্পরিক এই সতৃষ্ণ নয়নপাত প্রেমপ্রবীণা মীরার দৃষ্টি এড়ায় না। সে ওদের মনের ভাব বুঝে ফেলে। একদিন কীর্তনের পরে ঝালাবাড়রাজ মন্দির ত্যাগ করে যাবেন, মীরা মন্দারের কুমারকে ডেকে তাঁর সুমুখে দাঁড় করালো। বললে— রাওসাহেব, আমি প্রভার জন্যে এই বর ঠিক করেছি, মত করুন।

প্রভা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে গেল। রাজকুমারের গুণ আর স্বভাব চরিত্রে রাওসাহেব আগেই মুগ্ধ ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে

বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

রাণা ভোজরাজ তখন মন্দিরে। প্রভার মুখচন্দ্র তাঁকে মোহিত করেছিল। তাঁর বুকে তখন সাপের খেলা চলেছে।

দুই

আজ রাজকুমারী প্রভার বিয়ে। ঝালাবাড়ে ধুমধাম হচ্ছে। মন্দার থেকে শোভাযাত্রা আসবে। বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নের বন্দোবস্ত হচ্ছে। বিপণিতে আলোকসজ্জা। সরণিতে সুরভিত জলনিষেক। নহবৎখানায় মধুবন্তীর গুঞ্জন। হর্ম্যে হর্ম্যে পুষ্পলতিকার প্রসাধন। কিন্তু যাকে ঘিরে আজকের এই বিপুল উৎসবের আয়োজন, সে তখন উদ্যানবাটীর নিভৃতে একাকী বিষণ্ন তরুমূলে চোখের জলে ভাসছে।

অন্তঃপুরে শূদ্রাণী পরিচারিকারা আনন্দ-উৎসবের গান গাইছে। কোথাও সুবেশা সালংকারা সুন্দরীদের ঠাট ঠমক, কোথাও কেয়ূর-কঙ্কণের জাঁকজমক, কোথাও কৌতুকপরিহাসের বিদ্যুৎচমক। নাপতেনি কথায় কথায় ঝাঁজ দেখাচ্ছে। মালিনী দেমাকে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ধোপানি চোখ রাঙাচ্ছে। কুমোর-বউ তার জালার মতোই ফুলছে। বিবাহমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বসে পুরোহিত প্রতি কথায় সুবর্ণ-মুদ্রার অভাব বোধ করছেন। এলোকেশী নির্জলা উপোসী রানী চারিদিকে ছুটোছুটি করছেন। সকলের ঝালঝাঁজ হাসিমুখে সইছেন। আজ তাঁর বড়ো সৌভাগ্যের দিন। বড়ো আনন্দের দিন। বড়ো ব্যথার দিন। ভাণ্ডার-দ্বার খুলে তিনি আজ দুহাতে মণিমাণিক্য ছিটোচ্ছেন। আজ তাঁর প্রভার বিয়ে। সবাই যে যার খেয়ালে মত্ত। প্রভার কথা ভাবার কারো অবকাশ নেই। প্রভা গাছতলায় বসেই আছে, এক মনে একা একা কেঁদেই চলেছে।

পুরস্ত্রীদের একজন একবার নাপিত-বউকে ডেকে বলল— খুব তো তখন থেকে বক্‌বক্ করছিস, রাজকুমারীর চুলটা বেঁধে দিয়েছিস?

নাপিত-বউ জিভ কাটে। তারা দুজন প্রভাকে খুঁজতে খুঁজতে

বাগানে এসে পড়ে। তাদের দেখে প্রভা চোখ মুছে ফেলে। নাপিত-বউ তাঁর সিঁথিতে মুক্তোর সিঁথিমৌর বেঁধে দিচ্ছে, এদিকে প্রভার চোখ থেকে মুক্তো গড়াচ্ছে।

প্রভার সখীর চোখেও জল এসে পড়ে। বলে— এই সুখের দিনে এত মন খারাপ করছিস কেন বোন? মনের মতো বর পাওয়া তো ভাগ্যির কথা ভাই।

প্রভা সহেলীর দিকে চোখ তোলে। বলে— জানি না বোন কিসের দুঃখ আমার। কেন যে মনটা ভেঙে পড়ছে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

সহেলী ঠাট্টা করে— পিয়া-মিলনের ব্যাকুলতা বুঝি!

প্রভা বিষাদমাখা সুরে বলে— কী জানি কে যেন মনের ভেতরে বসে বলছে 'তার সঙ্গে তোর আর দেখা হবে না।'

সখি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়— ভোরের আগেই অন্ধকার গাঢ় হয় জানিস তো, মিলনের আগে প্রেমিকদের মন ওরকম ভয়ে দুঃখে অস্থির হয়।

প্রভা বলে— না রে, এ তেমন নয়। আমার যেন কেমন উদ্বেগ হচ্ছে। সব অলক্ষণ দেখছি। সারাদিন ডান চোখ নেচেছে। কাল রাত্তিরে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মন কেবলই কেঁপে উঠছে তরাসে, মনে হচ্ছে আজ ঠিক কোনো বিঘ্ন ঘটবে। রাণা ভোজরাজের নাম শুনেছিস?

সন্ধের আকাশে তারার বাতি জ্বলজ্বল করছে। ঝালাবাড়ের বালকবৃদ্ধযুবক সবাই অতিথি-সংবর্ধনার জন্যে পথে এগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরুষদের শিরে উষ্ণীষ, কটিতে অসি। যুবতীরা শৃঙ্গার সাজে সেজেছে, গান গাইতে গাইতে অন্তঃপুরে চলেছে। মেয়েরা ছাতে ভিড় করে বরের মিছিলের পথ দেখছে।

হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল— বরযাত্রী এসে গেছে। সবাই সামলেসুমলে বসল, নাকাড়ায় গুমগুম শব্দ উঠল, তোপ দাগা হতে লাগল। সেপাইরা ঘোড়াকে সজাগ করে তুলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল ঘোড়াসওয়ার রাজভবনের সামনে এসে পড়ল।

লোকে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, মন্দার রাজ্যের বরযাত্রী নয়, এরা রাণা ভোজরাজের সৈন্য।

ঝালাবাড়ীরা অবাক হয়ে আছে, বুঝতেই পারছে না কী করবে। ইত্যবসরে চিতোরবাসীরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। তখন ঝালাবাড়ীরা সচেতন হল। হতবুদ্ধির ভাব সামলে নিয়ে তারা খোলা তলোয়ার হাতে হামলাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা মহলে ঢুকে গেলেন। অন্দরমহলে দৌড়োদৌড়ি পড়ে গেল।

প্রভা শৃঙ্গার-প্রসাধন করে সখীদের সঙ্গে বসেছিল। হৈ-চৈ দেখে-শুনে ঘাবড়ে গেল। এমন সময় হাঁফতে হাঁফাতে রাওসাহেব অন্তঃপুরে এলেন। বললেন— প্রভা মা, রাণা ভোজ প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছেন। তুমি তাড়াতাড়ি ওপরে চলে যাও, আর ঘরের দোর বন্ধ করে রাখো। আমরা যদি ক্ষত্রিয় হই, তবে চিতোরের একজনকেও প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেব না।

রাওসাহেবের কথা শেষ হবার আগেই রাণা ভেতরে এসে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বীর সৈনিক। বললেন— চিতোরীরা তো মাথা দিতেই এসেছে। তবে যদি রাজপুত হই তো রাজকুমারীকে নিয়েই যাব। শুনে বৃদ্ধ রাওসাহেবের চোখ অগ্নিবর্ষণ করে। তিনি তলোয়ার টেনে নিয়ে রাণার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েলেন। রাণা আঘাত বাঁচিয়ে নিয়ে প্রভাকে বললেন— রাজকুমারী, আমাদের সঙ্গে যাবে?

প্রভা মাথা নিচু করে রাণার সামনে এল, বললে— হ্যাঁ যাব। রাওসাহেবকে কয়েকজনে ধরে রেখেছিল। উনি সরোষে বললেন— প্রভা, তুই রাজপুতের মেয়ে?

প্রভার চোখ সজল হয়ে উঠল। বললে— রাণাও তো রাজপুত কুলতিলক। রাওসাহেব ফেটে পড়লেন— লজ্জাহীনা!

বলির পশু যেমন হাড়িকাঠ থেকে মানুষকে দেখে, তেমনই দীন দৃষ্টিতে প্রভা বাপের দিকে তাকিয়ে বলে—যে ঝালাবাড়ের কোলে জন্ম নিয়েছি, আমার জন্যেই তাকে রক্তে স্নান করাব?

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে রাওসাহেব বলেন— ক্ষত্রিয়ের রক্ত তার ইজ্জতের চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। মর্যাদার জন্যে প্রাণ দেওয়াই

তার ধর্ম।

প্রভার চোখ লাল হল। মুখ থমথম করে উঠল। বললে—রাজপুত কন্যা তার সতীত্ব নিজেই রক্ষা করতে পারে। তার জন্যে রক্ত ঢালার দরকার নেই।

পরক্ষণেই রাণা প্রভাকে কোলে তুলে নেন। তড়িৎ গতিতে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নিয়ে সজোরে ঘোড়াকে চালনা করেন। ঘোড়া বাতাস কেটে উড়ে চলে। রাণার সহযাত্রীরাও ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। তাদের একশো সৈনিক তখন ভূমিশয্যায় ধড়ফড় করছে, তাদের একজনেরও তলোয়ার তোলার সুযোগ হয় নি।

রাত দশটায় মন্দারের লোকজন এল। কিন্তু শোকসংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। মন্দারকুমার নিরাশায় ভেঙে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর সারা রাত নদীতীরের শ্মশান-ভূমির মতো ঝালাবাড় নিস্তব্ধ অন্ধকারে ডুবে রইল।

তিন

চিতোরের রংমহলে বসে বসে বিষাদিনী প্রভা বাগানের সুন্দর সুন্দর গাছের পাতা গুনছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। রঙবেরঙের পাখি গাছের ডালে বসে কলরব করছে। রাণা এলেন। প্রভা উঠে দাঁড়াল।

রাণা— প্রভা, তোমার কাছে আমি অপরাধী। আমি জোর করে তোমার মা-বাবার কোল থেকে তোমায় ছিনিয়ে এনেছি। যদি বলি তোমার প্রতি এক অন্ধ প্রেম সেদিন আমাকে এমন করে অন্যায় করতে প্রলুব্ধ করেছিল, তুমি মনে মনে হাসবে, বলবে এমন অদ্ভুত, অনৈতিক প্রেম কেউ কখনো করে না। কিন্তু কথাটা সত্যি। যেদিন প্রথম রণছোড়জীর মন্দিরে তোমাকে দেখি, সেদিন থেকে এমন দিন যায় নি যেদিন আমি তোমার কথা ধ্যান করি নি। তোমাকে আপন করে পাবার যদি অন্য কোনো উপায় থাকত, আমি এমন জঘন্য

পথ নিতাম না। আমি বারবার রাওসাহেবের কাছে দূত পাঠিয়েছি, তিনি বারবার অগ্রাহ্য করেছেন। শেষকালে যখন তোমার বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল, আমি দেখলাম এবার তুমি অন্যের ঘরণী হতে চলেছ, এরপর থেকে আর তোমার কথা চিন্তা করারও অধিকার থাকবে না আমার, তখন নিরুপায় হয়ে আমায় এই গর্হিত উপায় অবলম্বন করতে হল। আমি মানি, এ আমার একান্ত স্বার্থান্ধতা। আমি আমার প্রেমকেই বড়ো করে দেখেছি, তোমার মনোভাব বোঝবার কোনো চেষ্টা করি নি। কিন্তু এ তো জানো, যে প্রেম মাত্রেই স্বার্থপর, সে নিজের মনের মানুষ ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই দেখে না। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আমার প্রেম দিয়ে, আমার আত্মনিবেদন দিয়ে আমি তোমাকে আপন করে পাব। প্রভা, তৃষ্ণায় কাতর মানুষ যদি প্রাণের দায়ে কোনো জলাধারে মুখ দেয়, তবে সে দণ্ডনীয় হয় না। আমি প্রেম-পিয়াসী। মীরা আমার সহধর্মিণী। তার অন্তর প্রেমের পারাবার। তার এক অঞ্জলিতেই আমার তৃষ্ণা মিটে যেতে পারত। কিন্তু তার হৃদয়ে দেবতার বাস, আমার ঠাঁই নেই। তুমি বলতে পারো, যদি মাথায় অতই প্রেমের ভূত চেপেছিল তো গোটা রাজপুতানায় আর কি মেয়ে ছিল না? আমি জানি, রাজ-পুতানায় সুন্দরীর অভাব নেই। এও জানি মেবার রাজার সম্বন্ধ এলে কেউ প্রস্তাব উপেক্ষাও করবে না। কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব তোমার কাছে। দোষ যদি দিতে হয় তো নিজেকে দোষ দাও। রাজস্থানে একটিই চিতোর, একজনই রাণা, আর প্রভাও অনন্যা। হয়তো প্রভাকে পাবার ভাগ্য আমার হবে না। হয়তো আমার নিয়তি আমাকে বৃথাই দৌড় করিয়ে মারছে। তবু পুরুষ মানুষ অদৃষ্টের ওপর সব ভার সঁপে দিতে পারে না। আমার প্রয়াস সফল হবে কি ব্যর্থ হবে তার সিদ্ধান্ত তোমারই হাতে।

প্রভার চোখ মাটিতে আর মন চঞ্চল বিহঙ্গের মতো অস্থির। ঝালা-বাড়কে রক্তপাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে রাণার সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু রাণার প্রতি তার ঘৃণা ও রোষের অন্ত ছিল না। ভেবেছিল যেদিন আবার সামনা-সামনি দেখা হবে সেদিন— রাজপুত কুলাঙ্গার,

দুরাচারী, কাপুরুষ বলে সম্বোধন করবে, তার দর্প চূর্ণ করে দেবে। এবং সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে রাণা নিশ্চয়ই বল-প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। সেই চরম মুহূর্তের জন্যে প্রভা তার মনকে মজবুত আর ছোরাকে ধারালো করে রেখেছিল। সে সংকল্প করে রেখেছিল — দুবার তার খঞ্জর ব্যবহার করবে : একটি চরম আঘাত রাণার কলজেয়, দ্বিতীয়টি তার নিজের বুকে ; আর এই ভাবে এই পাপের পালা চুকে যাবে। কিন্তু রাণার ঐকান্তিক অনুতাপ, তার করুণ নম্র বাচনভঙ্গি, তার বিষাদ, তার বিনয় সব-কিছু মিলিয়ে প্রভার অশান্ত মনকে নিরুত্তেজ করে দেয়। আগুনে জল পড়ে। সে চুপ করে বসে থাকে। রাণা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে থাকে, তারপর নিঃশব্দে উঠে যায়।

চার

দুমাস হয়ে গেল প্রভা চিতোরে এসেছে। রাণা আর একবারও তার কাছে আসেন নি। ইতিমধ্যে তাঁর মনোভাবেও পরিবর্তন এসেছে। ঝালাবাড় আক্রান্ত হবার কথা মীরাবাঈয়ের জানা ছিল না। সেটা ছিল রাণার গোপন পরিকল্পনা। এখন মীরা রাণার এই হঠকারিতার জন্যে প্রায়ই তাঁকে তিরস্কার করেন। ধীরে ধীরে রাণার মনেও এই ধারণা জন্মাচ্ছে যে প্রভা কিছুতেই পোষ মানবে না। তিনি প্রভার চারপাশে বিলাস-বৈভবের সামগ্রী স্তূপীকৃত করেছেন। প্রভা ফিরেও তাকায় না। পরিচারিকারা রাণাকে রোজই এক খবর শুনিয়ে যায় : বিষাদ প্রতিমার মুখে আলো নেই। এখন রাণা তাঁর হঠকারিতায় অনুতপ্ত। মাঝে মাঝে ভাবেন, বৃথাই এই দুষ্কৃতি করেছি। আবার প্রভার অনন্য রূপমাধুরী মনে ভেসে ওঠে। আবার ভাবেন : এই গরবিনী রূপসীর মন পাওয়া কি এতই সহজ। অনেক সাধনা করতে হবে। আমার শিষ্টস্নিগ্ধ আচরণ নিশ্চয়ই একদিন জয়ী হবে। দিনে দিনে প্রভার বিমুখতা বিরূপতা নিশ্চয়ই ক্ষীণ হবে। তুষার একদিন গলবেই।

প্রভা সারাদিন একা বসে থাকে। বসে বসে চিন্তা করে। চিন্তা করতে করতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে। তার চিত্তবিনোদনের জন্যে গায়িকার দল নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু প্রভার রাগরঙ্গে রুচি নেই। সে শুধু বসে বসে চিন্তা করে, চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে।

রাণার আপাতনম্রতার ক্ষণস্থায়ী প্রভাব কেটে গেছে। প্রভা এখন আবার আগের মতোই কুপিত চিত্তে রাণার ক্লিন্ন আচরণের কথা ভাবে। বাক্‌চাতুর্য শাস্তি দিতে পারে না, কেবল নিরুত্তর করে দেয়। প্রভা মাঝে মাঝে তার নির্বাক্ থাকার শক্তিতেই আশ্চর্য হয়ে যায়। রাণার প্রতিটি কথার উত্তর এখন তার মনে শানিয়ে রাখে। আবার যদি দেখা হয়, তখন···। একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে প্রভা অস্থির হয়ে ওঠে।

কিন্তু আবার ভাবে বাদ-প্রতিবাদ করেই বা এখন কী লাভ? আমি ঝালাবাড়পতির কন্যা, কিন্তু লোকচক্ষে এখন তো মেবার রাণার রানী। যদি কোনোদিন এই বন্দীশালা থেকে মুক্তিও পাই, যাব কোথায়? কাকে মুখ দেখাব? চলে গেলেও কলঙ্ক। কলঙ্ক কেবল আমার কুলেরই নয়, সমগ্র রাজপুতজাতির। মন্দার কুমার আমার প্রকৃত প্রেমিক। কিন্তু সে কি আমায় গ্রহণ করবে? আর যদিই বা লোকনিন্দাকে উপেক্ষা করে সে আমায় গ্রহণ করেও, তবু তার উঁচু মাথা চিরদিনের মতো হেঁট হয়ে যাবে। তারপর কোনোদিন-না-কোনোদিন আমার ওপর থেকে তার মন সরে যাবে। তখন সে আমাকে তার কুলের কলঙ্ক বলে ভাববে। তবে কি এখান থেকে কোথাও পালিয়ে যাব? কিন্তু কোথায় যাব? বাপের বাড়ি? সেখানে আমার ঠাঁই হবে না। মন্দার কুমারের কাছে? তাতে তারও অপমান, আমারও অপমান। তবে কি ভিখারিণী হয়ে যাব? কিন্তু তাতে দুনিয়া হাসবে, তা ছাড়া অদৃষ্টে আরো কত কি দুর্ভোগ আছে কে বলবে। একা অবলা নারী, তার ওপর এই রূপলাবণ্য যা মারণাস্ত্রের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। ক্ষত্রিয় জাতি আত্মসম্মানের জন্যে জলের মতো রক্তস্রোত বওয়াতে পারে। শতসহস্র ক্ষত্রিয়া রমণী

কেবল পরপুরুষের দৃষ্টিকলুষের স্পর্শ বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিমগ্ন হয়েছে। হে ভগবান, এই বন্দীশালাতে তিলে তিলে মরণই শ্রেয়। রাণার সমস্ত পাপের ভার সইব, জ্বলে জ্বলে মরব— কিন্তু এই বাড়িতেই। বিয়ে যার সঙ্গে হবার কথা ছিল, হয়ে গেছে। অন্তরে তারই আরাধনা করব, কিন্তু কণ্ঠে তার নাম অনুচ্চারিত থাকবে।

অতিষ্ঠ হয়ে একদিন রাণাকে ডেকে পাঠায় প্রভা। রাণা আসেন। তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখায়। প্রভা ভেবেছিল কিছু বলবে, কিন্তু রাণার মুখ দেখে তাঁর ওপর ওর দয়া হল। রাণা তাকে কথা বলার অবসর দিলেন না। নিজেই শুরু করলেন— প্রভা, আজ তুমি আমায় ডেকেছ। এ আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার জন্যে আমার চিত্তে সুখ নেই, তা বলে আজ তোমার কাছে মিষ্টি কথা শোনার আশা নিয়েও আসি নি। আমি জানি কী জন্যে তুমি আমায় ডেকেছ। আমি অপরাধী, তুমি আমায় যা খুশি শাস্তি দাও। এতদিন এখানে আসার সাহস হয় নি আমার। শাস্তির ভয় ছিল আমার। ক্ষত্রিয়া নারী ক্ষমা করতে জানে না, তা আমি জানি। ঝালাবাড়ে যখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে রাজি হলে, তখনই তোমার তেজস্বিতা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। বুঝেছিলাম, তোমার অন্তরে অজস্র শক্তি, অফুরন্ত বিশ্বাস। এও জানতাম যে তুমি সহজে ধরা দেবে না। তুমি জান না গত একটা মাস আমার কী ভাবে কেটেছে। ছটফট করেছি, কিন্তু ভয়ে আসতে পারি নি। শিকারী যেমন তার আহত সিংহীর কাছে আসতে ভয় পায়, তেমনই আমি তোমার সামনে আসতে ভয় পেয়েছিলাম। আমি চুপি চুপি অনেকবার এসেছি, দূর থেকে তোমার চিন্তামগ্ন বিমর্ষ মুখ দেখে আড়াল থেকেই সরে গেছি। ভেতরে পা রাখতে ভরসা পাই নি। কিন্তু আজ আমি অনাহূত আসি নি। তুমি আমায় ডেকেছ, আমি তোমার অতিথি। অতিথি সে যেমনই হোক, শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, তার সৎকার করা কর্তব্য। তোমার মনে আগুন জ্বলছে, তাই মন থেকে অভ্যর্থনা করতে আমায় পারবে না। তাই বলছি, মনের ভাব চেপে রেখেই তুমি অস্তুত মুখে আমায় অভ্যর্থনা জানাতে পারো।

প্রভা, রাগ সরিয়ে রেখে একবার আমার অপরাধের বিচার করো। আমাকে তুমি একটা দোষেই দোষী করতে পারো, যে তোমাকে তোমার মা-বাপের কাছ থেকে কেড়ে এনেছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। রাজপুতদের কাছে এ তো প্রথাবিরুদ্ধ নয়। এতে যে ঝালাবাড়ের অপমান হয়েছে, তাও বলা যাবে না। ঝালাবাড়বাসীরা তাই করেছে যা পুরুষের কাজ। তাদের পৌরুষ দেখে আমি মুগ্ধ। তারা কৃতকার্য হয় নি, তাতে যায় আসে না। বীর মাত্রেই জয়ী হবে এমন কোনো কথা নেই। তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাই সফল হয় নি। আমরা সংখ্যায় বেশি ছিলাম, তাই জিতেছি। আমরা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং অপ্রস্তুত ছিল, তাই তারা পরাস্ত হয়েছিল। আমরা সত্বর পালিয়ে না এলে তাদের হাতে প্রাণ দিয়ে আসতে হত, চিতোরের একজনকেও ফিরতে হত না। ভগবানের দোহাই, ভেব না আমি আমার দোষ ক্ষালনের জন্যে এত কথা বলছি। তা নয়। আমি অপরাধ করেছি। আমি অন্তর থেকে লজ্জিত। কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন এই নষ্টভ্রষ্ট অধ্যায়ের ভার আমি তোমাকেই দিচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে। যদি তোমার হৃদয়ে একটুও স্থান পাই, তবে তাই আমার স্বর্গ। জলমগ্ন মানুষের কাছে তৃণখণ্ডই পরম আশ্রয়। কিন্তু, তা কি সম্ভব ?

প্রভা এতক্ষণে মুখ খোলে। স্পষ্ট কণ্ঠে বলে— না।

রাণা এবারে প্রশ্ন করেন— ঝালাবাড়ে ফিরে যেতে চাও ?

প্রভা— না।

রাণা— তবে কি মন্দারের রাজকুমারের কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্রভা— কখনোই না।

রাণা— কিন্তু তোমার এই পলে পলে শুকিয়ে মরা আর দেখতে পারছি না।

প্রভা— এ কষ্ট থেকে শীগ্‌গিরই মুক্তি পাবেন।

রাণা কিছু বুঝলেন না। ভয়ে ভয়ে বললেন— তোমার যেমন ইচ্ছে। তারপর উঠে চলে গেলেন।

পাঁচ

রাত দশটা। রণছোড়জীর মন্দিরে কীর্তন শেষ হয়েছে। বৈষ্ণব সাধুরা প্রসাদ পাচ্ছেন। মীরা নিজের হাতে পরিবেশন করছে। ভক্তবৃন্দ আর অভ্যাগতদের সেবা আপ্যায়ণে তার তৃপ্তি হয়, আত্মপ্রসাদ পায়। সাধুরা যে-রকম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করছেন, যে দেখে সন্দেহ জাগে ভজন-কীর্তন না এই ভোজনপর্ব কোন্‌টি তাঁদের বড়ো আকর্ষণ। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে বিধিদত্ত বস্তুসমূহের সদ্‌ব্যবহারই হচ্ছে বিধাতাকে প্রসন্ন করার শ্রেষ্ঠ উপচার। আবার এও অত্যন্ত অবিসংবাদিত সত্য যে জীবগণ যেরূপ আহার্য সেবন করে, তদনুরূপই আত্মা গঠিত হয়। এবং যেহেতু সন্ন্যাসব্রত-ধারিগণকে মুখে 'হাঁ' বই 'না' বললে পাপের সমতুল্য অপরাধ সংঘটিত হয়, অতএব উপস্থিত মহাত্মাবৃন্দ অজস্র কষ্ট সহ্য করেও, উপাসনার এই ব্যাবহারিক ক্রিয়ায় কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না, ঘৃত-ক্ষীর ইত্যাদি উপকরণগুলির প্রতি সমদৃষ্টি প্রয়োগ করছেন, অবিরাম সেবন করে চলেছেন, অনবরত আসন পরিবর্তন করে চলেছেন।

তবে এঁদের মধ্যে উপবিষ্ট একজন মহাপুরুষকে এঁদের ব্যতিক্রম দেখা গেল। তিনি এখনো মুদ্রিত নেত্র এবং ধ্যানমগ্ন। থালির প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই। এঁর নাম প্রভানন্দ। মুখে লাবণ্যের প্রভা। অন্যান্য সাধুরা খেয়ে উঠে গেলেন, কিন্তু ইনি থালা স্পর্শও করলেন না।

তখন মীরা এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। বললে— মহারাজ আপনি প্রসাদে হাতও দেন নি। দাসী কি কোনো অপরাধ করেছে ?

সাধু— না, ইচ্ছে নেই।

মীরা— আমি মিনতি করছি, কিছু মুখে দিন।

সাধু— আমি তোমার আজ্ঞা পালন করব, কিন্তু তোমাকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে।

মীরা—বলুন কী আদেশ।

সাধু— রাখতে হবে।

মীরা— রাখব।

সাধু— কথা দিচ্ছ ?

মীরা— কথা দিচ্ছি, আপনি প্রসাদ খান।

মীরাবাঈ ভেবেছিল সাধু বোধ হয় কোনো মন্দির-নির্মাণ কি যজ্ঞের আয়োজনের ব্যাপারে কিছু চাইবে। এমন ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে, আর মীরার ও সর্বস্ব সাধুসেবায় অর্পিত। কিন্তু সাধুর তেমন কোনো প্রার্থনা ছিল না। সে মীরার কানের কাছে মুখ এনে বলে— আজ রাত্রে আরো তু'ঘণ্টা পরে রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার খুলে দেবে।

মীরা বিস্মিত হয়ে বলে— আপনি কে ?

সাধু— মন্দারের রাজকুমার।

মীরা রাজকুমারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে। তার দৃষ্টিতে প্রীতির বদলে ঘৃণা। বলে— রাজপুত এমন ছলনা করে না।

রাজকুমার— সে নীতি তখনই প্রযোজ্য, যখন উভয়পক্ষই সমশক্তির অধিকারী।

মীরা— এ হতে পারে না।

রাজকুমার— আপনি কথা দিয়েছেন, রাখতে হবে।

মীরা— আমার কথার চেয়ে মহারাজের নির্দেশ ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রাজকুমার— তা আমি জানি না। যদি আপনার কথার মর্যাদা রাখতে চান, তবে আমার অনুরোধ রাখতেই হবে।

মীরা কী চিন্তা করে। তারপর বলে— মহলে কী করতে যাবে ?

রাজকুমার— নতুন রানীর সঙ্গে তুটো কথা বলব।

মীরা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। একদিকে রাণার কঠোর নির্দেশ আর-একদিকে নিজের প্রতিশ্রুতি। প্রথমটি লঙ্ঘন ও দ্বিতীয়টি পালনের সুস্পষ্ট পরিণাম। পৌরাণিক ঘটনাগুলি একে একে মীরার মনে ভেসে ওঠে। দশরথ প্রতিশ্রুতি পালনের দায়ে প্রিয় পুত্রকে বনবাসে পাঠালেন। আমি কথা দিয়েছি, সত্য পালন করা আমার পরম ধর্ম। কিন্তু পতির আজ্ঞাই বা কেমন করে লঙ্ঘন করি।

তাতেও আমার ইহলোক-পরলোকের ক্ষতি। তার চেয়ে তাঁকেই সব কথা খুলে বলি না কেন ?

আমি আজ পর্যন্ত তাঁর কাছে কিছু চাই নি। আজ যদি এই দান ভিক্ষা করি, তিনি কি অস্বীকার করবেন ? আমার কথার মর্যাদা রাখবেন না ? না তা হবে না। তিনি বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার অপরাধ থেকে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচাবেন।

মনে মনে সংকল্প স্থির করে মীরা বলে— রাত্রে কখন ?

রাজকুমার হৃষ্ট কণ্ঠে বলে— মাঝ রাত্তিরে।

মীরা— আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাব।

রাজকুমার— কেন ?

মীরা— তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করেছ। তাই তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

রাজকুমার ঈষৎ লজ্জিত স্বরে বলে— বেশ আপনি দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

মীরা— যদি আর কোনো কপটতার চেষ্টা কর, তবে প্রাণ হারাতে হবে।

রাজকুমার— আমি সব-কিছুর জন্যে প্রস্তুত।

মীরা রাণার কক্ষে প্রবেশ করে। রাণা মীরাকে খুবই সম্মান করেন। মীরাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় মীরার আসাটা অপ্রত্যাশিত। প্রশ্ন করেন— কী আদেশ, দেবি ?

মীরা— তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, নিরাশ কোরো না। আমি আজ পর্যন্ত কোনো প্রার্থনা করি নি। এই প্রথম বার। আমি পাশবদ্ধ, আমাকে পাশমুক্ত করতে হবে। মন্দারের রাজকুমারকে মনে আছে ?

রাণা— খুব ভালো করে।

মীরা— আজ সে বৈষ্ণব সাধুর ছদ্মবেশে মন্দিরে বসে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে ছলনা ক'রে। তার প্রার্থনা—

রাণা—প্রভার সঙ্গে দেখা করা ?

মীরা— হ্যাঁ তাই। সে চায় আমি মধ্যরাত্রে আজ প্রাসাদের গুপ্তদ্বার খুলে দিই। আমি তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে মানবে না। কথা না দিলে সে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করে না, অভুক্ত থাকে। তাই নিরুপায় হয়ে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন তুমি আমার মান রাখবে কি না সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েছি। আমাকে তুমিই মুক্ত করতে পারো।

রাণা কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর বলেন— তুমি যখন কথা দিয়েছ, তার মর্যাদা রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তুমি দেবী, তোমার প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ থাকতে পারে না। দরজা খুলে দিয়ো। কিন্তু সে একা প্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সেটা উচিত হবে না। আমার মুখ চেয়ে তুমি একটু কষ্ট কোরো। তুমি নিজে তার সঙ্গে থেকো। আমার ভয় হচ্ছে, ও হয়তো প্রভাকে হত্যা করার মতলব নিয়ে এসেছে। ঈর্ষা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। মীরা, আমি তোমাকে আমার অন্তরের কথা বলছি। প্রভাকে হরণ করার জন্যে আমি তীব্র অনুশোচনা ভোগ করছি। ভেবেছিলাম থাকতে থাকতে ওর সয়ে যাবে, কিন্তু আমার অনুমান ভুল। ভয় হয়, আর কিছুদিন এভাবে থাকলে হয়তো প্রাণে বাঁচবে না। আমি নারীহত্যার পাপে লিপ্ত হব! আমি তাকে ঝালাবাড় ফিরে যাবার কথা বলেছিলাম, সে রাজি নয়। যদি সে মন্দার কুমারের সঙ্গে যেতে রাজি থাকে আমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দেব। কিন্তু এই দিনের পর দিন শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকা, এ আমি দেখতে পারি না। যদি তার মন আমার ওপর প্রসন্ন হত, আমি সার্থক হয়ে উঠতাম। কিন্তু তা যখন হবার নয়, কী করা যাবে। আমি তোমাকে এ-সব কথা বললাম বলে আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার পবিত্র হৃদয়ে এ-সব তুচ্ছ বিষয়ের জায়গা কোথায়?

মীরা আকাশের দিকে সংকোচ ভরে তাকাল। বললে— তা হলে তুমি অনুমতি দিচ্ছ? গুপ্তদ্বার খুলে দিতে পারি?

রাণা— তুমি এই মহলের অধীশ্বরী। আমার অনুমতির প্রয়োজন

নেই।

মীরা বিদায় নিয়ে চলে গেল

ছয়

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রভা নিঃশব্দে প্রদীপের দিকে চেয়ে ভাবছে— এই যে প্রদীপ, এর দহনে দীপ্তি, সে দীপ্তিতে অনেকের কল্যাণ। কিন্তু আমি? আমি কেন দগ্ধ হচ্ছি, তাতে কার কী লাভ? কার কী কল্যাণ! তবে আমার জ্বলে জ্বলে বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন।

প্রভা জানালা দিয়ে মাথা বার করে মাঝরাত্রের আকাশ দেখে। কালো আঁচলে সলমা চুমকির মতো হীরের তারা জ্বলছে। প্রভা ভাবে, আমার জীবনের কৃষ্ণপটে এমন দীপ্তিমান তারা কোথায়? তবে কি সারা জীবন কেবল কাঁদবার জন্যেই বাঁচব? লাভ কী? আর আমার বেঁচে থাকাটা তো বিড়ম্বনা। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। সবাই আমায় ব্যঙ্গ করে, নিন্দা করে। আমার মনের কথা কে জানে। ঝালাবাড়ের মেয়েরা প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুনছে— কবে আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনবে। আমার মা লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। আমার মরণের খবর পেলেই সে মাথা আবার গর্বে উন্নত হয়ে উঠবে। এ জীবন বিড়ম্বনা। মৃত্যুই শ্রেয়, মৃত্যুই বরণীয়।

বালিশের তলা থেকে একটা ঝকঝকে ধারালো ছোরা বার করে প্রভা। ওর হাত কাঁপে। মনকে বাধ্য করে খঞ্জরকে প্রণতি জানাতে। হাত তোলে, তবু হাত ওঠে না। এখনো মন শক্ত হয় নি। চোখ বুজিয়ে ফেলে প্রভা। মাথা ঘুরতে থাকে। ছোরা হাত থেকে ফসকে গিয়ে মেঝেয় পড়ে।

প্রভা নিজের ওপর রেগে ওঠে। ভাবে— তবে কি সত্যিই নির্লজ্জ? রাজপুতের মেয়ে মরতে এত ভয়! মান-ইজ্জত খুইয়ে বেহায়ারাই বেঁচে থাকতে চায়। কিসের আকাঙ্ক্ষা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। রাণার মিষ্টি মিষ্টি কথা! রাণা আমার শত্রু। সে

আমায় খাঁচায় পোরা পশু ভাবে। আমায় কথার ফাঁদে ফেলে চুপ করিয়ে রাখে। পাষণ্ড! আমার সারাটা জীবন নষ্ট করে দিয়ে, এখন আমায় নিয়ে খেলা করতে চায়। আর আমি সেই নীচ, কপট পাষণ্ডের খেলনা হবার জন্যে বেঁচে থাকব?

তবে? তবে কিসের আশায় আমার বাঁচার ইচ্ছে? রাজকুমার! তার প্রেম! না। আমি সেই দেবতার যোগ্য নই। এখন তার কথা কল্পনা করাও আমার পাপ। প্রিয়তম। বহুদিন আগেই আমি আমার অন্তর থেকে তোমার ছবি মুছে ফেলেছি। তুমিও মন থেকে আমায় মুছে ফেলো। মরণ ছাড়া আজ আর আমার কোনো জায়গা নেই। হে শংকর, আমায় শক্তি দাও। আমায় কর্তব্য পালন করার শক্তি দাও।

প্রভা আবার ছোরা হাতে তুলে নেয়। এখন তার মন অনেক শান্ত, সংকল্প দৃঢ়। হাত আর কাঁপল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের খুব কাছাকাছি খঞ্জর এখন নিবিড় চুম্বনের জন্যে অপেক্ষমান···হঠাৎ দ্বারপানে পদশব্দ। প্রভা চকিত দৃষ্টিপাত করে। মন্দার কুমার সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের দ্বারপথে দাঁড়ায়।

তাকে দেখে প্রভা চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি ছোরাটা লুকিয়ে ফেলে। রাজকুমারকে দেখে আনন্দের বদলে ভয় হয় তার। যদি কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে, প্রাণ বাঁচানো যাবে না। ওর এক্ষুনি চলে যাওয়া দরকার। ওকে যদি কথা বলার সুযোগ দিই তা হলে দেরি করবে। তা হলে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়লে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রাণা ওকে ছাড়বে না। তড়িতের মতো চিন্তা-প্রবাহ প্রভার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। তীব্র স্বরে বলে উঠল— ভেতরে ঢুকো না।

রাজকুমার বলল-— আমায় চিনতে পারছ না?

প্রভা— খুব চিনতে পারছি, কিন্তু এটা কথা বলার সময় নয়। রাণা তোমায় পেলে আস্ত রাখবে না। এখনই চলে যাও এখান থেকে।

রাজকুমার আরো এক-পা এগিয়ে আসে। বলে— প্রভা, আমার

সঙ্গে নিষ্ঠুরতা কোরো না।

প্রভা ধমক দিয়ে বলে— তুমি এখানে দাঁড়ালে আমি চীৎকার করব।

রাজকুমার উদ্ধত স্বরে বললে— সে ভয় আমার নেই। আমি প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি। আজ দুজনের মধ্যে একজনের শেষ দিন। হয় রাণা থাকবে, নয় আমি থাকব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো?

প্রভা— না।

রাজকুমার ব্যঙ্গে ফেটে পড়ল— কেন, চিতোরের জলহাওয়া পছন্দ হয়ে গেছে?

প্রভা তীব্র দৃষ্টিতে রাজকুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে— পৃথিবীতে মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না। এখানে যেভাবে আমার জীবন কাটছে তা আমিই জানি। কিন্তু লোকনিন্দার কথা ভাবতে হয়। সমাজের দৃষ্টিতে আমি এখন চিতোরের রানী। রাণা যেভাবে আমায় রাখবে সে ভাবেই থাকতে হবে। আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করব, জ্বলে পুড়ে মরব। যেদিন আর সহ্য হবে না সেদিন বিষ খাব কিংবা বুকে ছোরা বিঁধে মরব। কিন্তু এই প্রাসাদভবনের ভেতরেই মরব। এ ঘরের বাইরে পা রাখব না।

রাজকুমারের সন্দেহ হল প্রভা রাণার বশীভূত হয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে ছল করছে। প্রেম ঈর্ষার রূপ নেয়। বলে— যদি তোমায় ধরে নিয়ে যাই?

এ কথায় প্রভার ভঙ্গী বদলে যায়। বলে— তা হলে এরকম অবস্থায় ক্ষত্রিয়া মেয়ে যা করে আমি তাই করব। নিজের গলায় কিংবা তোমার গলায় ছুরি বসিয়ে দেব।

রাজকুমার আরো এক-পা এগিয়ে এসে কটুকণ্ঠে বলে— রাণার সঙ্গে তো স্বেচ্ছায় চলে এসেছিলে। সেদিন তোমার ছুরি কোথায় ছিল?

কথাটা প্রভার বুকে তীরের মতো বিঁধল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে— তখন এই ছুরির একটি ঘায়ে নদীর বানের মতো রক্ত বইত। আমার

জন্যে আমার ভাইয়েরা, আমার আত্মীয়স্বজন ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা আমি চাই নি। তা ছাড়া আমি তখন কুমারী। সতী-সম্মান নষ্ট হবার প্রশ্ন ছিল না আমার। তখনো সমাজ আমার কাছে পাতিব্রত্য দাবি করত না। আমার নিজের দিক থেকে এখনো আমি কুমারী। কিন্তু পৃথিবীর চোখে এখন আমি পতিব্রতা, রাণার অন্তঃপুরচারিণী। তাই লোকলজ্জার খাতিরে আমাকে বাধ্য হয়ে গায়ে পতিব্রতার বেড়ি পরতে হয়েছে। একে রক্ষা করাই আমার ধর্ম। এর বিপরীত কিছু করলে ক্ষত্রিয়ানীর কলঙ্ক হয়। তুমি আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছ কেন? এ কেমনতর মনুষ্যত্ব? আমার ভাগ্যে যা আছে আমি ভোগ করছি। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। আমি মিনতি করছি, দয়া করে এখনই এখান থেকে চলে যাও।

রাজকুমার এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে। রুক্ষ কণ্ঠে বলে —বাঃ প্রভা, বাঃ। এখানে এসে স্ত্রীচরিত্রে বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছ। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসে এখন ধর্মের দোহাই দিচ্ছ। আমার প্রেমকে দু-পায়ে মাড়িয়ে এসে এখন মর্যাদার গান গাইছ। রাণা ভ্রমর হয়ে তোমার মধুপান করবে, আমি এ-চোখে তা দেখতে পারব না। আমার সাধস্বপ্ন সব যদি ধুলোয় গুঁড়িয়ে যায়, তবে একা কেন যাব, তোমায় নিয়েই যাই। আমার জীবন যখন নষ্ট হবেই, তার আগে তোমার জীবনটাও নিজের হাতে নষ্ট করে যাব। তোমার হৃদয়হীনতার এই শাস্তি। খুব তাড়াতাড়ি ভেবে নাও, কী করবে। স্থির করো আমার সঙ্গে যাবে কিনা। কেল্লার বাইরে আমার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রভা— আমি যাব না।

রাজকুমার— ভেবে দেখো, পরে আফসোস করবে।

প্রভা— খুব ভেবে দেখেছি।

রাজকুমার তলোয়ার টেনে নিয়ে প্রভার দিকে লাফ দিয়ে এগোয়। প্রভা ভয়ে চোখ বুজে ফেলে এক-পা পিছু হটে যায়। মনে হল এখনই মূর্ছা যাবে।

অকস্মাৎ খোলা তলোয়ার হাতে রাণা ঘরে ঢোকে। রাজকুমার

সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

রাণা সিংহনাদ করে ওঠে— সরে দাঁড়া। ক্ষত্রিয় সন্তান নারীর গায়ে হাত তোলে না।

রাজকুমার তিক্ত স্বরে বলে— লজ্জাহীনা নারীর এই সাজা।

রাণা— তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো আমি। আমার সামনে আসতে লজ্জা কিসের। না-হয় আমিও একটু তোমার তলোয়ারের চোট দেখতুম।

রাজকুমার প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাণার ওপর। রাণা অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ। মার বাঁচিয়ে পালটা আঘাত হানে। প্রভা এতক্ষণ মূর্ছিত হয়ে দেয়ালের গায়ে পড়ে ছিল। এবারে বিদ্যুতের মতো ছুটে এসে রাজকুমারকে আড়াল করে দাঁড়ায়। রাণার তলোয়ারের পুরো কোপ প্রভার কাঁধে পড়ে। রক্তের ফোয়ারা ছুটতে থাকে। রাণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, পতনোন্মুখ প্রভাকে ধরে ফেলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভার মুখ বর্ণহীন হয়ে পড়ল। চোখ বুজে এল। এবার দীপ নির্বাণোন্মুখ। মন্দার কুমারও ততক্ষণে হাতের তলোয়ার ফেলে দিয়ে প্রভার সামনে নতজানু হয়ে বসেছে। দুই প্রেমপিপাসুর চোখ সজল। নিবে আসা প্রদীপের ওপর পতঙ্গের সমর্পণের পালা।

প্রেমের রহস্য অপার। বোধের অগম্য। এই কিছুক্ষণ আগে রাজকুমার প্রভার ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। প্রভা কোনোমতেই তার সঙ্গে ঘর ছাড়তে রাজি হয় নি। লোকলজ্জার ভয়, সতীধর্মের বেড়ি, কর্তব্যের পাঁচিল— সব-কিছু তার পথ বেঁধে রেখেছিল। অথচ তাকে বিপন্ন দেখে খোলা অস্ত্রের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তাকে বাঁচাতে গিয়ে এই তো কেমন অবলীলায় প্রাণ সঁপে দিলে। প্রেমের পরিপূর্ণ দাবি মিটিয়ে প্রভা মরল— কিন্তু তার নিজের ব্রত অক্ষুণ্ণ রেখে— ঐ ঘরের ভেতরেই।

তাই বলছি, প্রেমের রীতিই আলাদা। এই তো রাজকুমার প্রভার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তার রক্ত দেখবে বলে। তার মনে তখন

ঈর্ষার দহন। রক্তধারায় সে দাহ নিবে গেছে। রাজকুমার নিশ্চল হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে ছিল। তার পর উঠে দাঁড়াল। মুক্ত-তলোয়ারটাকে নিজের বুকের গভীরে গেঁথে রাখল। রক্তের আরো একটা ফোয়ারা ছুটল। দুটি ধারা এক সাথে মিশে গেল। মিলনে এখন আর কোনো বাধা নেই।

প্রভা প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছাড়তে রাজি হয় নি। কিন্তু তবু প্রেমের বন্ধন ছেঁড়ার শক্তি ছিল না তার। সেই একসঙ্গেই যেতে হল। শুধু এ ঘর থেকেই নয়, এ পৃথিবী থেকেও।

স্বর্গাদপি

পুরো ষাট বছর পরে আজ আমি আবার আমার মাতৃভূমির-- আমার বড়ো আদরের, বড়ো আকাঙ্ক্ষার মাতৃভূমির দর্শন পেলাম। যেদিন আমার স্বদেশ মায়ের কোল থেকে আমি বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন আমি পরিপূর্ণ যুবক। সেদিন আমার ধমনীতে নতুন রক্ত, হৃদয়ে আশা আর উচ্ছ্বাস। সেদিন আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে গিয়েছিল পশ্চিমের দিকে। কোনো অত্যাচারীর অবিবেকী খেয়াল, কোনো শক্তিমানের মত্ততার হাত কিংবা ন্যায়-বিচারের নির্দেশ— সেদিন আমাকে দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নি। সে সাধ্য ছিল না কারো। কোনো অত্যাচার বা কোনো বিচারবিধির কঠোর হস্তক্ষেপ আমায় শাস্তি দিতে পারত, কষ্ট দিতে পারত, কিন্তু আমার মায়ের কোলছাড়া করার কোনো ক্ষমতা তার ছিল না। আমি স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গিয়েছিলাম। আমার আকাশ-ছোঁয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর পর্বতপ্রমাণ বিষয়-বুদ্ধিই আমাকে দেশান্তরী করেছিল।

আমি আমেরিকায় গিয়ে খুব বড়ো ব্যাবসা ফেঁদে বসলাম, ব্যাবসায় বিত্তবৈভবও খুব হল, আবার ধনৈশ্বর্য-সঞ্জাত আনন্দও খুব উপভোগ করলাম। আমার সৌভাগ্য, সহধর্মিণীও মনের মতো পেয়েছি, সে রূপে অতুলনীয়া। তার অঙ্গলাবণ্য আর তনুশ্রীর খ্যাতি সারা আমেরিকা জোড়া। তার হৃদয়ে আমি ছাড়া, আমার চিন্তা ছাড়া আর কোনো-কিছুর স্থান ছিল না। আর আমি তো কায়েনমনসাবাচা তার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম, আর সে আমার জীবনসর্বস্ব ছিল। আমার পাঁচটি পুত্রসন্তান, তারা সুদর্শন, সুঠাম এবং সৎ। তাদের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ে আমার ব্যাবসা আরো স্ফীত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার নয়ন-ভুলোনো শিশুভোলানাথ নাতিরা আজ আমার কোলে। ঠিক এই সময়ে আমি আমার অতি প্রিয়, পরম রমণীয় জন্মভূমির দর্শনের জন্যে— পুরো ষাট বছরের পর প্রস্তুত

হলাম। জীবনে মানুষ যা-কিছু আকাঙ্ক্ষা করে— অপরিমেয় ঐশ্বর্য, প্রিয়তমা রমণী, সুপুত্র আর হৃদয়নন্দন পৌত্রসন্তানাদি— সব-কিছু ভাসিয়ে দিয়ে আজ যে আমি চলে আসছি তার কারণ আমি জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে আমার ভারতজননীর পায়ে একবার শেষ প্রণাম রেখে যাব। আমি অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, আর দশ বছরের মধ্যে আমার বয়স হবে শতবর্ষ। অন্তরে আজ আমার কেবল একটি আশা আমার দেশজননীর চরণধুলায় লুটিয়ে রব।

এ আমার আজকের কামনা নয়, আজ হঠাৎ করে আমার এ খেয়াল ওঠে নি। আমার রূপসী দয়িতা যখন আমায় প্রেমসুধায় অভিষিক্ত করে রাখত— তখনো, যখন আমার তরুণ পুত্র প্রতিদিন সকালে আমাকে ভক্তিনত প্রণামের উপহার দিয়ে যেত, তখনো, সুখ আর গৌরবের প্রতিটি মুহূর্তে আমার অন্তরের গোপনতম কন্দরে একটি নিভৃত চিন্তা কাঁটার মতো বিঁধে থাকত : 'আমি অভাগা, মাতৃভুমি থেকে আজ আমি অনেক দূরে··· এদেশ আমার স্বদেশ নয়, এখানে আমি প্রবাসী।

অর্থ, বিত্ত, স্ত্রীপুত্র, ভূসম্পদ— কিছুরই আর অভাব ছিল না। কিন্তু জানি না কেন থেকে থেকেই জন্মভূমির সেই জরাজীর্ণ পর্ণকুটির, চার-ছ বিঘে মৌরসী জমির ক্ষেত আর ছেলেবেলার কয়েকজন সঙ্গীর স্মৃতি মনে পড়ে যেত। আনন্দঘন পরিবেশে বসেও আমি নেপথ্য-বিষাদে ভুগতাম— 'আমার দেশজননীর কোল থেকে আমি অনেক দূরে···'

দুই

বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নেমেই যারা আমার নজরে পড়ল তারা ময়লা ময়লা কোটপাতলুন পরা, ভাঙাচোরা ইংরিজি বলা জাহাজী মাল্লার দল। তারপর বিল্‌তিতি দোকান, ট্রামগাড়ি, মোটর গাড়ি আস্তে আস্তে সবই চোখে পড়তে লাগল। তারপর রবার-টায়ার-শোভিত গাড়ি আর দাঁতে চুরুট-শোভিত মানুষদের মুখোমুখি

পড়ে গেলাম। এর পরে এল রেলওয়ে স্টেশন: ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্। এখান থেকেই ট্রেনে চেপে হরিৎশ্যাম পাহাড়ের সারি পার হয়ে আমি যাব আমার গ্রামে। ট্রেনে উঠে হঠাৎ আমার চোখের জল বাঁধ মানল না— এ কোন্ দেশ? এ তো আমার দেশ নয়। যে দেশের দর্শনের ভিখারী আমি, জীবনের অন্তিম বেলায় সব নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ভাসিয়ে দিয়ে, সব স্নেহ প্রেম মোহ শান্তির উৎসকে দূরে সরিয়ে আমি ছুটে এসেছি— সে দেশ কোথায়? এ-দেশ সে-দেশ নয়। এ বুঝি আর-কোনো দেশ। একি ইংলণ্ড, একি আমেরিকা! হয়তো তাই, কিংবা নয়। কিন্তু এ আমার নিয়ত ধ্যানের স্বপ্নময় সোনার ভারত নয়, কোনোমতেই নয়।

জঙ্গল, পাহাড়, নদী ময়দান পার হয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলে এল আমার প্রিয় গ্রামের কাছে। আমার গ্রাম, ফুল-পাতা-ফল-ভারে নদী-নালা-জল-ভারে যে গ্রাম একদিন স্বর্গকেও হার মানাত, সেই গ্রাম। গাড়ি থেকে নেমে, আমার মনটা আবেগে উদ্‌বেল হয়ে উঠল, এবার আমার সেই অতীতের প্রিয় বাড়িটা দেখব, আমার বাল্যসঙ্গীদের দেখতে পাব। আমি একেবারে ভুলে গেলাম— আমার বয়স নব্বই বছর— আমি একটা বুড়ো। গ্রামের যত কাছাকাছি আসি, পা তত দ্রুত লঘু ছন্দে ওঠা-নামা করে, অব্যক্ত আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের ওপরেই আমি মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করছি। আহা এই আমার নালা, যেখানে আমি রোজ ঘোড়াকে নাওয়াতাম, নিজেও ডুবতাম— কিন্তু আজ সেই নালার দুধারে কাঁটাতারের বেড়। তার সামনেই একটি বাংলো বাড়ি, তাতে দুজন ইংরেজ, হাতে বন্দুক নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে; নালায় স্নান করার কঠোর নিষেধ।

আমি গ্রামে এলাম। আমার চোখ বাল্যসঙ্গীদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু, পেলাম কেবল শোকের সংবাদ। আমার শৈশব-সঙ্গীরা সবাই পরলোকে। আমার বাড়ি আমার ভাঙাচোরা মাটির কুঁড়ে— যার কোলে আমি বড়ো হয়ে উঠেছি, যেখানে বসে শৈশবের নিশ্চিন্ত আনন্দ দু-হাত ভরে কুড়িয়েছি, যে ছবি আমি জীবনভর ভুলতে পারি নি, আমার সেই পরম প্রেমের আগার, আমার সেই বাড়ি

এখন শুধু একরাশ মাটির স্তূপ।

জনবিরল জায়গা নয়। কয়েক শো লোক চলাফেরা করছে। তারা কোর্টকাছারি আর থানা-পুলিশের কথা বলছে। তাদের মুখে উদ্‌বেগ, অবসাদ, স্থির বিষাদের চিহ্ন— এরা সবাই বৈষয়িক চিন্তায় ম্লান। আমার শৈশবসাথীদের মতো জীবন-সমৃদ্ধ, রক্তিম কান্তি তরুণ একজনেরও দেখা পেলাম না। নিজের হাতে একটা ব্যায়ামের আখড়া গড়েছিলাম। সেই জায়গায় এখন একটা ভাঙাচোরা স্কুলঘর। স্কুলের পড়ুয়ারা সবাই ক্ষীণ, দুর্বল, রুগীর মতো দেখতে, তাদের পরনে ছেঁড়া কাপড়। ওদের দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল— না, না, এ আমার সেই প্রিয় দেশ নয়। এত দূর থেকে এই দেশ দেখতে আমি আসি নি— এ দেশ আমার সোনার ভারত নয়।

বটগাছের ছায়া লক্ষ্য করে আমি ছুটে গেলাম। এখানে আমার ছেলেবেলার সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় এখানে কত খেলেছি। যুবক হয়ে কতদিন এখানের স্নিগ্ধ ছায়ায় শুয়েছি। দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা শোকস্মৃতি আমার মনকে কাঁদিয়ে গেল। এই গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়িয়েছি, এর ঝুরি ধরে দুলেছি, এর অমৃতস্বাদ ফল খেয়েছি, আমার সেদিনকার সঙ্গীরা সাথীরা আজ কোথায় চলে গেছে— যারা কখনো আদর করে ভোলাত, কখনো রাগ করে থাকত, কখনো গলায় হাত রেখে কত কথা বলত— তারা সব আজ কোথায় গেল? কেবল আমি একা, গৃহহীন এক পথচারী কেন রয়ে গেলাম? কী দেখতে এসেছি। এখন এখানে পুলিশের থানা হয়েছে। লাল পাগড়ি মাথায় দিয়ে একজন বটের ছায়ায় বসে আছে। তার আশপাশে আরো দশ-বিশ জন লাল পাগড়ি জোড় হাতে দাঁড়িয়ে। পুরনো ছেঁড়া কাপড় পরা অনশন-ক্লিষ্ট একটি পুরুষ মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, কিছুক্ষণ আগেই তার ওপর চাবুকের বর্ষণ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বুঝেছি, এ আমার প্রিয় দেশমাতৃকা নয়, এ আর-কোনো দেশ। য়ুরোপ হতে পারে, আমেরিকা হতে পারে, কিন্তু আমার রক্তের প্রিয় মাতৃভূমি এ নয়। কিছুতেই হতে পারে না।

তিন

আমি ভয়নেক দমে গেলাম। এবার বরং এ-জায়গাটা ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই সেই চারচালা মণ্ডপের দিকে, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার বাবা আর গ্রামের অন্য বয়োবৃদ্ধেরা একসঙ্গে বসে তামাক খেতেন আর হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করতেন। কাঁথার বিছানায় আমরাও গড়াগড়ি দিতাম, ডিগবাজি খেতাম। মাঝে মাঝে মণ্ডপে পঞ্চায়েতও বসত, বাবাই হতেন মণ্ডলীর মাথা। মণ্ডপের কাছেই একটা গোশালা ছিল, সারা গ্রামের গোরুবাছুর সেইখানে থাকত, আমরা সেখানে বাছুরদের নিয়ে হৈ-চৈ করতাম। আমি আবার একটা ধাক্কা খেলাম। সেই জায়গায় সেই মণ্ডপের চিহ্ন মাত্র নেই। ওখানে এখন গ্রামের টিকে দেবার ঘাঁটি হয়েছে, আর হয়েছে ডাকঘর।

চারচালার একটা লাগোয়া ঘানিঘর ছিল। শীতের দিনে সেখানে আখমাড়াই হত আর গুড়ের গন্ধে সারা গাঁ মউ মউ করত। মজুরেরা আখ কেটে টুকরো করত, আমরা খণ্ডপ্রসাদ পাবার আশায় বসে থাকতাম আর আশ্চর্য হয়ে মজুরদের কুশল হাতের কাজ দেখতাম। পাড়ার মেয়েরা আর ছোটোরা ঘড়া কলসী নিয়ে হাজির হত, ঘড়া ঘড়া আখের রস নিয়ে যেত। কাঁচা রস জ্বাল দেওয়া দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে যে কী ভালো লাগত, কত খেয়েছি। ঐ যে সেই ঘানিগাছটা এখনো রয়েছে ওখানে। আর ঘরটা? নাঃ নেই। সেখানে এখন একটা দড়ি পাকাবার মেশিন বসেছে। আর তার সামনে পান-বিড়ির দোকান। আমি মরমে মরে গেলাম। বসেই আছি। একবার এক সম্ভ্রান্ত দর্শন ভদ্রলোককে দেখে বললাম—"মশায়, আমি এক বিদেশী যাত্রী। রাতটুকু কোথাও শুয়ে থাকব, যদি অনুমতি দেন।" লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক জরীপ করল। তারপর বলল— 'আগে যাও, এখানে জায়গা নেই।' আমি আগে গেলাম, সেখানেও সেই একই উত্তর— 'আগে যাও।' যতই আগে যাই, সেই একই শব্দের প্রতিধ্বনি— 'এগিয়ে যাও' জায়গা নেই।

পাঁচবারের বার যে ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম তিনি আমার হাতে একমুঠো ছোলা দিলেন। আমার শিথিল হাতের মুঠো থেকে ছোলাগুলো পথের ওপর পড়তে লাগল, আমার চোখ থেকে তখন অবিরল জলধারা বইছে। আমার ঠোঁট নড়ছে— "হায় এ আমি কোথায় এলাম। এ তো আমার দেশ নয়। অতিথিবৎসল প্রিয় ভারতভূমি এ তো নয়। কক্ষনো নয়।"

এক কৌটো সিগরেট কিনে নিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আমি সিগারেট টানি আর ভাবি পুরনো দিনের সব কথা। আমি যেবার বিদেশে যাই, এখানে তখন একটা ধর্মশালা হচ্ছিল, হঠাৎ সে-কথা মনে পড়তে আমি লাফ দিয়ে উঠলাম, যাক রাত কাটাবার একটা জায়গা পেলাম। কিন্তু হায়, আশা শুধু মিছে ছলনা। ধর্মশালা ছিল, কিন্তু সেখানে ঠাঁই ছিল না। গরিবের, গরিব যাত্রীর ঠাঁই ছিল না। ধর্মশালায় ইদানীং কেবল সুরা, ব্যভিচার আর জুয়োখেলার আশ্রম। আমি আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। না, না, না— এ আমার এ জন্মভূমি ভারত নয়। কখনো না। এ আর-কোনো দেশ। হয়তো য়ুরোপ, হয়তো আমেরিকা। কিন্তু এ-দেশকে কেউ ভারত বোলো না।

চার

অন্ধকার রাত। চারদিক থেকে শেয়াল কুকুরের চীৎকার কানে আসছে। আমি ভারী মনে গিয়ে নালার পাশে বসলাম। ভাবছি এখন কী করব। তবে কি আবার ছেলেদের কাছেই ফিরে যাব। আমেরিকার মাটিতেই দেহ রাখব? এতদিন আমার মাতৃভূমি ছিল। যদিও আমি বিদেশে বাস করতাম। তবু এতকাল ধরে আমি দেশকে আমার স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলাম। আজ আর আমার দেশ নেই। আমি আজ চিরপ্রবাসী। হাঁটুতে মাথা রেখে আমি মৌন চিন্তায় মগ্ন। রাতটা চোখের ওপর দিয়ে কেটে গেল। পেটা ঘড়িতে তিনটের ঘণ্টা বাজল। কে যেন গান গাইছে, গানের সুর আমার কানে

আসছে। আবার মনটা ভরপুর হয়ে উঠল— এই তো আমার দেশের মাটির সুর। উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম— ১৫।২০ জন বৃদ্ধা. তাদের পরনে সাদা থানধুতি, হাতে ঘটি নিয়ে স্নানে চলেছেন। গুন গুন করে গান গাইছেন—

'প্রভু হমারে, অবগুণ চিত ন ধরো'

গানের সুরে আমি তন্ময় হয়ে পড়েছি। খেয়াল ফিরে এল অনেক লোকের কলরবে। পেতলের কমণ্ডলু হাতে কয়েকটি লোক 'শিব শিব' 'হরহর', 'গঙ্গে গঙ্গে' 'নারায়ণ-নারায়ণ' নাম জপ করতে করতে পথে চলেছে। এক অবর্ণনীয় অনুভূতি আমার মনকে ভরিয়ে তুলল।

আমি আমেরিকায় হাস্যলাস্য চাপল্য লাবণ্যের দ্যুতিময়ী মেয়েদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন আলাপ করেছি, অসংখ্য বার তাদের উচ্চারিত প্রেম নিবেদন শুনেছি, আনন্দ পেয়েছি, আমি নাইটিংগেল পাখির গান শুনেছি— কিন্তু যে সুর শুনে আজ প্রভাতে আমার পীড়িত মূর্ছিত মনের ঘুম ভাঙল, সেই পরম রমণীয় সুর আর কোথাও আমি শুনি নি। আমার সারা চিত্ত জুড়ে আজ শুধু বেজে চলেছে এক আনন্দরাগিণী।

'প্রভু মেরে, অবগুণ চিত ন ধরো।'

তখন আমি আবার সুখনিমজ্জিত। আমি সেই পথচারীদের সঙ্গ নিলাম। ছ'মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে পুণ্যতোয়া নদীর পাড়ে পৌঁছে গেলাম। নদীর নাম— 'পতিত পাবনী'। এ নদীর লহরীর বুকে অবগাহন, এর সৈকতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ— হিন্দু মাত্রেরই পরম সৌভাগ্য। আমার গ্রাম থেকে ছ-সাত মাইলের পথ — এই 'পতিত পাবনী' গঙ্গা, এই ভাগীরথীর তীর। সে একদিন ছিল যখন আমি প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে এখানে আসতাম। গঙ্গার স্নিগ্ধ ধারায় হাজার হাজার মানুষ অবগাহন করছে, আমি দুচোখ ভরে দেখলাম। দেখলাম— কেউ কেউ বালুচরে বসে গায়ত্রী জপ করছে। কেউ হোমের মন্ত্রোচ্চারণ করছে। কেউ বেদপাঠ করছে, কেউ ফোঁটা তিলক কাটছে। এখন আমার অন্তর প্রত্যাবর্তনের উৎসাহে ভরাট। "হ্যাঁ, এই তো আমার সেই দেশ, এই তো আমার অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী মাতৃভূমি। সকল দেশের সেরা, এই মাটির পবিত্র ধূলিকণা অঙ্গে ধারণ

করবার বাসনা নিয়েই আমি আবার ফিরে এসেছি —আমি আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি কানে শুনছি।

পাঁচ

আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম আমি। কোট-পাঁতলুন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা-গঙ্গার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। আঃ জুড়িয়ে গেল। মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল যে শিশু, সারাদিন নির্মম লোকের ভিড়ে হতক্লান্ত হয়ে সে যেমন সন্ধেয় ঘরে ফিরে তার সর্বসন্তাপহারিণী জননীর কোলে মুখ লুকোয়, আমার মনের ঠিক সেই অবস্থা। হ্যাঁ, আমি মাকে ফিরে পেয়েছি। আমার হারানো দেশ। আমার বড়ো সাধের, বড়ো আদরের মাতৃভূমি।

ঠিক গঙ্গার ধারেই একটা ছোটো কুটির বানিয়ে নিলাম। এখন রামনাম জপ করা ছাড়া আমার দিনে রাতে আর কোনো কাজ নেই। নিত্য দু-সন্ধ্যা গঙ্গায় স্নান করি। এখন আমার অন্তিম সাধ মা-গঙ্গার কোলেই যেন শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি। যেন পার্থিব স্মৃতির অবশেষ আমার অস্থিগুলি গঙ্গার পূতগর্ভে বিসর্জন দিতে পারি।

স্ত্রীপুত্র বারবার লিখছে, ফিরে এসো। কিন্তু আর কি আমার যাওয়া হয়? মা-গঙ্গার পুণ্য তটভূমি, আমার দেশের মাটি আর যে আমায় ছাড়তে চায় না। এই গঙ্গামৃত্তিকার অঙ্গে আমার দেহও যে এখন মিশে যেতে চাইছে। এখন আর সংসারের কোনো আকাঙ্ক্ষা আমাকে টানে না। আর কোথাও আমি যেতে পারি না, যেতে চাই না। আমি আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির কোলে শেষ-বারের মতো ফিরে এসেছি।

রানী সারন্ধা

অন্ধকার রাতের নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে ধসান নদীর কল্লোল, পাড়ের পাথরের গায়ে তার মৃত্যুমন্দ আঘাতের শব্দ এমনই সুখশ্রাব্য যে মনে হয় যেন কেউ ঘুরর-ঘুরর করে জাঁতা ঘোরাচ্ছে। নদীর দক্ষিণ তটে একটা টিলা। টিলার ওপর অনেক কালের পুরনো একটা দুর্গ। জংলা গাছপালায় ঘেরা। টিলার পুবদিকে ছোটো একটা গ্রাম। এই গড় আর ঐ গাঁ দুই-ই এক বুন্দেলা সরদারের কীর্তির শেষ চিহ্ন। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে। বুন্দেলখণ্ডে কত রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। মুসলমানেরা এসেছে, চলে গেছে। বুন্দেলা রাজা উঠেছে পড়েছে। এমন-কোনো গ্রাম এমন-কোনো এলাকা ছিল না যা এই রাষ্ট্রসংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। কিন্তু এই দুর্গশীর্ষে কোনোদিন শত্রুর বিজয়পতাকা ওড়ে নি। এই গ্রামে কখনো শত্রুর পদার্পণ হয় নি, এমন-কি, কখনো কোনো বিদ্রোহ হয় নি। এটা এই দুর্গের, এই গ্রামের সৌভাগ্য।

অনিরুদ্ধ সিংহ একজন রাজপুত বীর ছিলেন। তখনকার যুগটাই এমন ছিল, যে সকলকেই নিজের বাহুবল আর পরাক্রমের ওপর ভরসা রাখতে হত। একদিকে মুসলমান সৈন্য সব সময়েই পা তুলে বসে আছে। অন্যদিকে রাজাদের মধ্যে যে সবল সে দুর্বলের গলা টেপার জন্যে তৎপর হয়ে আছে। অনিরুদ্ধেরও নিজস্ব একদল ঘোড়সওয়ার আর একদল পদাতিক ছিল। তারা সংখ্যায় কম, শক্তিতে নয়। এই ছোট্ট দলের সাহায্যে সে বংশের ঐতিহ্য আর মর্যাদা রক্ষা করত। শান্তিতে ঘরে বসে থাকা তার বরাতে ছিল না। যে সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি, তার বছর তিনেক আগে অনিরুদ্ধ সিংহের বিবাহ হয়েছে, স্ত্রীর নাম শীতলা। কিন্তু বিহারের দিন আর বিলাসের রাত অনিরুদ্ধের পাহাড়ে পাহাড়ে কেটে যেত, শীতলা তখন একা দুর্গের অলিন্দে বসে স্বামীর মঙ্গল কামনায় কাটাত। শীতলা বহুবার স্বামীকে অনুরোধ করেছে, কতবার পায়ে ধরে বলেছে যে

সোহাগ করে বলেছে, জেদ করে বলেছে, অনুনয়, অভিমান সব করে দেখেছে। কিন্তু অনিরুদ্ধ জাতে বুন্দেলা। শীতলা তার সব হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে, তবু হারাতে পারে নি।

আঁধার রাত। সারা দুনিয়া ঘুমোচ্ছে। আকাশে শুধু তারারা জেগে। আর দুর্গের ভেতরে শীতলা। পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে, চোখে ঘুম নেই, ননদ সারন্ধা মেঝেয় বসে মধুর কণ্ঠে গান গাইছে—

'বিনু রঘুবীর কাটত নহীঁ রৈন'—

শীতলা বললে— জ্বালাস নি আর। তোরও কি ঘুম আসছে না?

সারন্ধা বললে— তোমায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাচ্ছি।

শীতলা— আমার চোখে ঘুম লোপ পেয়ে গেছে।

সারন্ধা— লোপ পায় নি, কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখো গে।

এমন সময় দরজা খুলে গেল। সুগঠিত রূপবান এক পুরুষ ভেতরে এল। অনিরুদ্ধ। তার কাপড়চোপড় ভিজে। শরীরে কোনো অস্ত্র নেই। শীতলা পালঙ্ক থেকে মেঝেয় নেমে বসল।

সারন্ধা জিজ্ঞেস করল— কাপড় ভিজল কী করে দাদা।

অনিরুদ্ধ— নদী সাঁতরে এসেছি।

সারন্ধা— হাতিয়ার কী হল।

অনিরুদ্ধ— কেড়ে নিয়েছে।

সারন্ধা— সঙ্গের লোকজন?

শীতলা প্রায় অশ্রুত স্বরে বলে— ভগবান রক্ষে করেছেন। কিন্তু সারন্ধার কপালে ভাঁজ পড়ল। দুঃখে-গর্বে মিশিয়েব লল— দাদা, তুমি আজ যা করলে তাতে বংশের মান-মর্যাদা নষ্ট হল। এরকম কখনো হয় নি।

সারন্ধা ভাই অন্ত প্রাণ। তার মুখেই এরকম ধিক্কার শুনে লজ্জায় খেদে সে যেন কেমন হয়ে গেল। বীরত্বের আগুন ক্ষণিকের জন্যে অনুরাগের জলে নিবুনিবু হয়েছিল, আত্মগ্লানির বাতাসে আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। যেমন এসেছিল ঠিক তেমনি করেই ফিরে গেল। যাবার সময় বোনকে বলে গেল— তুই আমার বড়ো

উপকার করলি। আমায় বরাবরের মতন সচেতন করে দিলি। এ কথা আমি জীবনে ভুলব না রে।

আঁধার রাত। আকাশে তারার আলো আবছা অস্পষ্ট। অনিরুদ্ধ কেল্লার বাইরে চলে গেল। তারপর নদীর ওপারে। তারপর নিকষ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। শীতলা স্বামীর পেছনে প্রাকার পর্যন্ত এল। তারপর যখন অনিরুদ্ধ লাফ দিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন বিরহক্ষুব্ধা নারী হতাশ কান্নায় বিবশ হয়ে একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে পড়ল।

সারন্ধাও এসেছিল এদের পেছনে। শীতলা নাগিনীর মতন ফণা তুলে বলল— বংশমর্যাদা এতই প্রিয়?

সারন্ধা সংক্ষেপে বলল— হ্যাঁ।

শীতলা— নিজের স্বামী হলে বুকে বেঁধে রাখতিস না?

সারন্ধা— না, বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিতাম।

শীতলা তীব্রস্বরে বলে— নে, নে, জানা আছে। আঁচলে বেঁধে রাখবি, তুই লিখে রেখে দে।

সারন্ধা— যদি তেমন দিন কখনো হয়, তা হলে আমার কথাও তুমি দেখে নিয়ো।

এই ঘটনার তিন মাস পরে অনিরুদ্ধ মেহরৌনী জয় করে ফিরল। তার একবছর পরে ওরছার রাজা চম্পত রায়ের সঙ্গে সারন্ধার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সেদিনের কথা দুই নারীর বুকে কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল।

দুই

দুরন্ত প্রতিভার অধিকারী পুরুষসিংহ চম্পত রায়ের নামে গোটা বুন্দেলা জাত প্রাণ দিতে পারে। সবাই তাঁকে মানে। সিংহাসনে বসেই চম্পত মোগল বাদশাকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন আর ওদিকে নিজের বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করতে থাকলেন। মোগল সেনা বারবার হানা দিতে আসে, আর বারবার হেরে ফিরে যায়।

সারন্ধার গর্ব মনের মতো বর পেয়েছে। তার মনে যে আশা ছিল যে, স্বামী যেন তার বুন্দেলা জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়— তা পূর্ণ হয়েছে। রাজার অন্তঃপুরে আরও পাঁচ রানী ছিল। কিন্তু একমাত্র সারন্ধাই যে তাকে তার মহিমার জন্যে পুজো করে এ কথা বুঝতে রাজার দেরি হয় নি।

এই সময় ঘটনাক্রমে চম্পত রায়কে মোগল বাদশার আশ্রয়ে থাকতে হয়। তাই পাহাড়সিংয়ের হাতে রাজ্যের ভার সঁপে চম্পত দিল্লী চলে গেলেন। তখন শাহজাহানের শাসনকালের শেষ ভাগ। যুবরাজ দারা শিকোহ রাজকার্য পরিচালনা করছেন। তিনি নৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন, উদারচিত্ত, গুণগ্রাহী পুরুষ। চম্পত রায়ের বীরত্বের কথা শুনে তিনি তাঁকে প্রভূত সম্মানে আপ্যায়িত করলেন, এবং কালপীর বহুমূল্য জায়গীর তাঁকে উপঢৌকন দিলেন: কালপীর বার্ষিক আয় ন'লক্ষ। চম্পত রায়ের জীবনে এই প্রথম বার, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থেকে নিশ্চিন্ত আরাম ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্যে দিন যাপনের সুযোগ এল। তিনি নিশিদিন 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' বলে বিলাস-বৈভবে মগ্ন হয়ে রইলেন। অন্য রানীরা জড়োয়া গয়নার অরণ্যে মৃগয়া করতে লাগলেন। শুধু অব্যক্ত গ্লানিতে ভারাক্রান্ত, বিষণ্ন চিত্তে একা ঘুরে বেড়ায় সারন্ধা— তার প্রমোদে রুচি নেই, বিলাসে নেই আকর্ষণ, নৃত্যগীতের জমজমাট সভা তার কাছে নিষ্প্রাণ মনে হয়।

চম্পত রায় বলে— সারণ, তোমার মুখে হাসি নেই কেন? আমার ওপর কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছ?

সারন্ধা ছলছল চোখে বলে— এমন কথা ভাবছ কেন। তুমি যেখানে পরিতৃপ্ত, আমিও সেখানে খুশি।

চম্পত— যেদিন থেকে এখানে এসেছি, একদিনের জন্যে তোমার মুখে হাসি দেখি নি। তুমি আজকাল একখানি পানও দাও না হাতে করে। কোনোদিন আর পাগড়ি বেঁধে দাও না, তলোয়ার বেঁধে দাও না। কী হল, আগের মতো আর ভালোবাস না।

সারন্ধা— প্রিয়তম, তোমার প্রশ্নের কী উত্তর দেব বলো। এ কথা

ঠিকই যে আজকাল আমার মন ভালো যাচ্ছে না। কী করব, কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু ভালো লাগাতে পারি না। সব সময় বুকে একটা ভার চেপে থাকে।

চম্পত রায় নিজে তখন সুখী, উচ্ছল, পরিতৃপ্ত। কাজেই সারন্ধার অতৃপ্ত বিষণ্ণ থাকার কোনো সংগত হেতু খুঁজে পান না। ভুরু কুঁচকে বলেন— কী জানি, তোমার অসুখী হবার কোনো কারণ তো আমার নজরে পড়ে না। ওরছায় এমন কী সুখ ছিল, যার এখানে অভাব ঘটেছে।

সারন্ধার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। বলে— আমি যদি কিছু বলি, বিরক্ত হবে না তো?

চম্পত রায়— না, নিঃসংকোচে বলো।

সারন্ধা— ওরছায় আমি ছিলুম এক রাজার রানী। আর এখানে আমি এক জায়গীরদারের সহচরী। অযোধ্যায় কৌশল্যার যে স্থান ওরছায় আমার ছিল সেই স্থান। এখানে আমি বাদশার এক পারিষদের বউ। যে বাদশা কাল পর্যন্ত তোমার নাম শুনলে কাঁপত, আজ তুমি হাসিমুখে তার সামনে দুবেলা মাথা নিচু করছ। ছিলুম রানী, হয়েছি চেড়ী— এতেও যে খুশি হয়ে ওঠার মতো জোর নেই আমার মনে। এই উঁচু পদ আর এই বিলাস-বৈভবের সামগ্রীর জন্যে তুমি বড়ো বেশি মূল্য দিয়েছ।

চম্পত রায়ের চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে যায়। এতদিন সারন্ধার মনের খবর তিনি রাখতেন না। তার স্বাধীনচিত্ততা বা তেজস্বিতার সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। মায়ের কথা শুনলে অনাথ ছেলে যেমন কেঁদে ফেলে, ওরছার কথায় চম্পত রায়ের তেমনি চোখে জল এল। সশ্রদ্ধ অনুরাগে চম্পত সারন্ধাকে বুকে টেনে নিলেন।

ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা যেখান থেকে তাঁকে টেনে এনেছিল— আজ আবার সেই শূন্যপুরীর ভাবনায় চম্পত রায়ের মন ভারী, চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠল।

চার

হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা কৃতার্থা হয়ে ওঠে। চম্পত রায় ফিরে এলে বুন্দেলখণ্ড কৃতার্থ হয়ে উঠল। ওরছার ভাগ্য হেসে উঠল। নহবতের সুর আবার ঝরনা ঝরাল। সারন্ধার আঁখিপদ্মে জাতীয় গৌরবের আলো আবার লালিমা জাগাল।

কয়েক মাস কেটে গেল। শাজাহান রোগশয্যায়। ঈর্ষার আগুন আগে থেকেই জ্বলছিল। এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দিকে দিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। দাক্ষিণাত্য থেকে মুরাদ আর মহীউদ্দিন দুই শাহজাদা রণসাজে সজ্জিত দলবল নিয়ে রওনা হলেন। বর্ষার দিন। ওরছার উর্বরাভূমি রূপেরঙে ভরপুর। দুনিয়াকে ডেকে নিজের লাবণ্য দেখাচ্ছে।

মুরাদ আর মহীউদ্দিন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে আসছে। আসতে আসতে তারা চম্বলের তীরে ধোলপুরের কাছাকাছি এসে ছাউনি গাড়ল। আর এগোনো গেল না। সামনেই বাদশার ফৌজ তাদের আপ্যায়নের জন্যে তৈরি।

বিদ্রোহী রাজপুত্রদ্বয় বিপন্ন চিন্তায় ক্লান্ত। সামনেই দুস্তর নদী, অলঙ্ঘ্য তার ঢেউ। নিরুপায় হয়ে চম্পত রায়কে খবর পাঠায়— দোহাই ভগবান, আসুন, আমাদের ডুবন্ত ডিঙিটা বাঁচান। পার করে দিন।

রাজা প্রাসাদে এসে সারন্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন— এর কী জবাব দেব ?

সারন্ধা— সাহায্য চেয়েছে, করতে হবে।

চম্পত— ওদের সাহায্য করা মানে দারাশিকোর সঙ্গে যেচে বৈরিতা সাধা।

সারন্ধা— তা সত্যি। কিন্তু প্রার্থীকে ফেরাবে কী বলে, তা কি পারো ?

চম্পত— প্রেয়সী, তুমি বিবেচনা করে কথা বলছ না।

সারন্ধা— প্রাণনাথ, এ রাস্তা যে কত কঠিন, আমি ভালো করেই

জানি। আমি এও জানি যে এই যুদ্ধে আমাদের যোদ্ধাদের রক্তে চম্বলের জল লাল হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস করো যতদিন চম্বল নদী বইবে, আমাদের বীর বুন্দেলাদের কীর্তিগাথা তার কল্লোলে মিশে থাকবে। বুন্দেলাদের শেষ জীবিত বংশধরটিরও কপালে এই রক্ত-দানের গৌরবচিহ্ন গৈরিক তিলক হয়ে থাকবে।

বাতাসে তখন মেঘের সৈন্যসমাবেশ পর্ব চলেছে। ওরছার কেল্লা থেকে বর্ষার সঘন মেঘপুঞ্জের মতো বুন্দেলাদের এক শৌর্যবীর্য-অলংকৃত সৈন্যদল প্রমত্ত বাতাসের মতো বেগে চম্বলের দিকে রওনা হল। দুই রাজকুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরে, রাজার হাতে পানের খিলি তুলে দিয়ে সারন্ধা বলে— বুন্দেলার সম্মান এখন তোমার হাতে।

ফুল্লচিত্ত, প্রতিটি অবয়বে উজ্জ্বল উল্লাসের ছটা— বুন্দেলার বীর সেনারা এগিয়ে আসছে। তাদের দেখে শাহজাদাদের অন্তরে আশা-আনন্দের আলো জ্বলে উঠল। সে জায়গার প্রতিটি অঙ্গুলি-পরিমেয় জমিও রাজার নখদর্পণে। তিনি বুন্দেলা সৈনিকদের আড়ালে লুকিয়ে রেখে শাহজাদাদের ফৌজ সাজিয়ে নিয়ে নদীর কিনারে কিনারে পশ্চিম দিকে এগোলেন। দারাশিকোহর ভ্রম হল, শত্রু হয়তো অন্য কোনো ঘাট দিয়ে নদী পার হতে চায়। তিনি ঘাট থেকে তাঁর ঘাঁটি সরিয়ে নিলেন। এদিকে ঘাটে অপেক্ষমান লুকোনো বুন্দেলা সৈন্যও এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তারা ঘোড়াসুদ্ধ নদীতে নেমে পড়ল। এবার চম্পত রায়ের পরিচালনায় মুরাদ মহীউদ্দীনের ফৌজ, বুন্দেলা-বাহিনীর পেছুপেছু নদী পার হয়ে গেল। এই সুকঠিন চালে নদী পার হ'তে সাত ঘণ্টা দেরি হয়েছিল, দারা চম্পতের কৌশলে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিলেন— কিন্তু নদীর অপর পারে রণাঙ্গনে তখন সাতশো বীর বুন্দেলার আহত দেহ মৃত্যুর ক্ষণ গুণছিল।

রাজাকে দেখে অর্ধমৃত বুন্দেলাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল। শাহজাদার সৈন্যও 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি দিয়ে বাদশা-ফৌজের দিকে ধেয়ে চলল। দিল্লীর ফৌজের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। তাদের

পঙ্‌ক্তিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, হাতাহাতি লড়াই শুরু হল, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নামল। রক্ত-রঞ্জিত রণাঙ্গনে আর বুন্দেলার আকাশ জুড়ে আঁধার ঘোর হয়ে এল। ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে। বাদশাহী সেনা শাহজাদাদলকে পিষে ফেলছে। এমন সময় পশ্চিম থেকে বুন্দেলাদের আর-একটি ঢেউ দেখা গেল। সেই প্রবাহ বাদশাহী ফৌজকে কুটোর মতন ভাসিয়ে দিল, তাদের আর নড়ার মতো উপায় রইল না। বিজিত রণাঙ্গন আবার তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। এই নতুন সৈন্যদল কোথা থেকে এমন করে এল, সবাই অবাক হয়ে তাই ভাবছিল। কিন্তু ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না। ভাবছিল হয়তো আকাশ থেকে দেবদূতের দল রাজপুত্রদের সাহায্যে নেমে এসেছেন। কিন্তু চম্পত রায় যখন কাছাকাছি গেলেন, তখন সেই সেনাদলের নেত্রী ঘোড়া থেকে নেমে রাজার পায়ে প্রণাম করল। সে সারন্ধা।

এখন যুদ্ধভূমি বিষাদের সাগরবেলা। কিছুক্ষণ আগে এখানে অগ্নিযোদ্ধারা মৃত্যুর উৎসবে মত্ত হয়েছিল। এখন এখানে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে বিগতপ্রাণ মানুষের শব। এখন এখানে মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম আর্তনাদের শব্দ। অনাদি অতীত থেকে মানুষের ইতিহাসে স্বার্থের খাতিরে ভ্রাতৃহত্যা চলে আসছে। আজও চলছে। বিজয়ী সৈন্য এবার লুণ্ঠনে মেতে উঠল। সেকালে পুরুষে-পুরুষে লড়াই হত। সে ছিল বীর্যের পরাক্রমের ছবি। আর এ হল নীচ প্রতিহিংসার মসীলেপন। তখন মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে সীমিত ছিল। এখন সে সীমা লঙ্ঘন করে গেছে।

গোলমালের মধ্যে এক জায়গায় বাদশাহী ফৌজের সেনাপতি বলী বাহাদুর খাঁর মৃতপ্রায় মূর্ছিত দেহ দেখা গেল। তাঁর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। ঘোড়াটা রাজার খুব পছন্দ হয়ে গেল। তাঁর ঘোড়ার খুব শখ ছিল। ঘোড়াটা দেখতে ভারি সুন্দর। সুগঠিত অবয়ব ইরাকী জাতের ঘোড়া। সিংহের মতো দরাজ বুক, চিতাবাঘের কোমর। প্রভুর ওপর তার ভক্তি ভালোবাসা দেখে লোকে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। রাজা হুকুম দিলেন— খবরদার। এর ওপর কেউ হাতিয়ার চালাবে না। একে জ্যান্ত ধরবে, গায়ে

কোনো আঘাত লাগাবে না— এ আমার ঘোড়াশালার শোভা বাড়াবে। একে যে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তাকে আমি পুরস্কৃত করব।

সৈনিকেরা চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কাছে ভিড়বে এমন সাহস হচ্ছিল না কারুর। কেউ মুখে চুমকুড়ি দিয়ে কাছে ডাকছে. কেউ ফাঁদ পেতে ধরবে ভাবছে— কিন্তু কোনো ফন্দিই কাজে আসছে না। সেপাইদের মেলা বসে গেল।

এবার সারন্ধা তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে নির্ভিক ভাবে ঘোড়াটার কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখে স্নেহের আলো, ছলনার নয়। ঘোড়া মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল। রানী এবার তার গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। ঘোড়া রানীর আঁচলে মুখ ঢাকল। রানী এবার তার রাশ ধরে তাঁবুর দিকে রওনা হলেন। ঘোড়ার চাল দেখে মনে হল— চিরদিনের প্রভুর সঙ্গে চলছে, নতুন কেউ নয়।

কিন্তু সেদিন যদি তা না হয়ে ঘোড়াটা বজ্জাতি করত, বেয়াড়াপনা করত সারন্ধার হাতে ধরা না দিত, তা হলে ওরছার এই রাজপরিবারের কাহিনী অন্যরকম হত। ইতিহাস বলে, ঘোড়া নয়, রানী সারন্ধা সেদিন সন্ধ্যায় স্বর্ণমৃগ ধরে এনেছিল।

পাঁচ

সংসার রণাঙ্গনে সেই যোদ্ধারই জয় হয়, যে সময়কে কাজে লাগাতে জানে, যে তাকে চেনে। সুযোগ এলে সে যেমন উৎসাহ নিয়ে এগোয়, দুর্যোগে তেমনই উৎসাহের সঙ্গে সে পিছিয়ে আসতে জানে। এরাই রাষ্ট্র গড়ে তোলে, বীরপুরুষ বলে ইতিহাস এদেরই বেদীতে যশের পুষ্পস্তবক রাখে।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এমনও বীর দেখা যায়, যিনি এগোতে জানেন, কিন্তু পেছোতে জানেন না— সংকটের মুহূর্তেও না। তিনি বীর সংগ্রামী, কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে জয়লাভ প্রায়শঃ ঘটে না। তিনি তাঁর শেষ সৈনিকটিকেও হারাতে রাজি আছেন, তাঁর বাহিনী নির্মূল হয়ে যাক,

কিন্তু তিনি একবার যেখানে পা রেখেছেন, সেখান থেকে আর পিছু হটবেন না। জয় তাঁর হয় না, কিন্তু তাঁর পরাজয়েই গৌরব। অভিজ্ঞ সেনাপতি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রচনা করেন, কিন্তু যিনি শৌর্যের গৌরবে মৃত্যু বরণ করেন, তবু জীবন অথবা জয়ের সুযোগের বিনিময়ের পশ্চাদপসরণ করতে শেখেন নি সেই বীর সৈনিক দেশের আত্মিক মান উন্নত করেন, দেশের ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা দেন। তাঁর জীবনে তথাকথিত সাফল্য আসে না, কিন্তু তাঁর নাম ভাবীকালের মুখে গৌরবের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সে নামের জয়ধ্বনি কালের সীমা অতিক্রম করে অনন্তে প্রতিধ্বনিত হয়। সারন্ধা দেবী এই শেষোক্ত শ্রেণীর বীরাঙ্গনা।

শাহজাদা মহীউদ্দিন চম্বলের তীর থেকে আগ্রার দিকে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্য তার শিয়রে চামর ব্যজন করতে থাকে। আগ্রায় পৌঁছবার পর বিজয়লক্ষ্মী তাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

আওরঙ্গজেব গুণগ্রাহী পুরুষ। বাদশার সামন্তবর্গকে তিনি মার্জনা করলেন, তাদের রাজ্যপাট ফিরিয়ে দিলেন আর কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ রাজা চম্পত রায়কে বার হাজারী মনসবদারী অর্পণ করলেন। ওরছা থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে যমুনা নদীর তট-ভূমি পর্যন্ত তাঁর জায়গীর বিস্তৃত হল। বুন্দেলার স্বাধীন নৃপতি আবার রাজভক্ত জায়গীরদারে রূপান্তরিত হয়ে সুখে-বিলাসে মগ্ন হলেন, রানী সারন্ধা আবার পরাধীনতার গ্লানিতে ভুগতে থাকলেন।

বলী বাহাদুর খাঁ বাক্‌পটু মানুষ। তাঁর মৃদুভাষিতা তাঁকে দ্রুত বাদশা আলমগীরের বিশ্বাস ভাজন করে তুলল। দরবারে তাঁর জন্যে সম্মানের আসন নির্দিষ্ট হল।

ঘোড়াটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শোক খাঁ সাহেবের মনে মনেই ছিল। একদিন কুমার ছত্রসাল ঐ ঘোড়াতে চেপেই ভ্রমণে বেরিয়েছে, সে খাঁ সাহেবের মহলের দিকেই গিয়ে পড়েছিল। বলীবাহাদুর এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে চাকর-বাকরদের ইশারা করল। কুমার একলা কী করবে। পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে মার কাছে সব ঘটনার বিবরণ দিল। রানীর মুখ থমথমে হয়ে উঠল।

বললে— "ঘোড়া হাতছাড়া হয়ে গেছে ওতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আমি মর্মে মরে যাচ্ছি, তুই ঘোড়া হারিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলি কোন্ মুখে ? তোর শরীরে কি বুন্দেলা বংশের রক্ত নেই রে ? ঘোড়া না-হয় নাই ফিরে পেলি, কিন্তু তোর দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে বুন্দেলাদের ছেলের হাত থেকে ঘোড়া কেড়ে নেওয়া ছেলে-খেলা নয়।"

এই বলে সারন্ধা তার পঁচিশ জন যোদ্ধাকে তৈরি হবার নির্দেশ দেয়। তারপর নিজে অস্ত্র-সজ্জা করে সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে বলী বাহাদুর খাঁর ভবনে হাজির হল। খাঁ সেই ঘোড়াতেই সওয়ার হয়ে দরবারে চলে গিয়েছিল। সারন্ধা বেগবতী নদীর বন্যার মতো দরবারের প্রাঙ্গণে এসে পোঁছোল। দৃশ্য দেখে দরবারে সাড়া পড়ে গেল। অমাত্যবর্গ চারদিক থেকে এসে জমা হলেন। আলমগীর স্বয়ং বাইরে এসে দাঁড়ালেন। চারদিকে বিস্ময় ও উত্তেজনার গুঞ্জন, সবাই যে যার তলোয়ারে হাত দিচ্ছেন। এই দরবারে অতীতে একদিন অমর-সিংহের অসির ঝলক দেখা গিয়েছিল। আজ সেই ঘটনা স্মরণে আসছে।

সারন্ধা উচ্চ কণ্ঠে বলে— খাঁ সাহেব, বড়ো লজ্জার কথা, চম্বলের তীরে যে বীরত্ব দেখানো আপনার উচিত ছিল, যা আপনি দেখাতে পারেন নি, সেই অসামান্য বীরত্ব আপনি আজ দেখালেন একটা অবোধ বালকের কাছে! ছিঃ। তার কাছ থেকে ঘোড়া ছিনিয়ে নেওয়া কি আপনার উচিত হয়েছে ?

বলী বাহাদুরের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কর্কশ গলায় বললে —কার এমন আস্পর্ধা যে আমার জিনিস নিজের ভোগে লাগায়।

রানী— আপনার জিনিস নয়, আমার জিনিস। আমি ওই ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজের অধিকারে অর্জন করেছি, ওতে আমার পূর্ণ অধিকার। রণনীতির এই মামুলী কথাটাও আপনি জানেন না ?

খাঁ সাহেব— ও ঘোড়া দিতে পারব না। তার বদলে আমার আস্তাবলটা আপনাকে নজরানা দিতে পারি।

রানী— আমি আমার নিজের ঘোড়াটাই ফেরত চাই।

খাঁ— আমি ঐ ঘোড়ার মূল্যের মণিরত্ন দিচ্ছি, ঘোড়া দিতে পারব না।

রানী— তা হলে এর মীমাংসা তলোয়ারেই করবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বুন্দেলা যোদ্ধারা তরবারি কোষমুক্ত করল। দরবারের প্রাঙ্গণ রক্ত প্লাবিত হয় হয়, সেই মুহূর্তে বাদশা আলমগীর মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বললেন— রানী সাহেবা, আপনার সৈনিকদের থামান। ঘোড়া আপনি পাবেন, তবে তার জন্যে আপনাকে বড়ো বেশি মূল্য দিতে হবে।

রানী— আমি আমার সর্বস্ব বর্জন করতে রাজি।

বাদশা— জায়গীর আর মন্‌সব ?

রানী— জায়গীর আর মন্‌সব তুচ্ছ জিনিস।

বাদশা— রাজত্বও তুচ্ছ ?

রানী— হ্যাঁ, রাজত্ব তুচ্ছ।

বাদশা— একটা ঘোড়ার জন্যে ?

রানী— না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহার্ঘ বস্তুর জন্যে।

বাদশা— কী সে বস্তু ?

রানী— মর্যাদা।

অতএব রানী সারন্ধা ঘোড়ার বিনিময়ে নিজের বিস্তৃত জায়গীর, রাজসম্মান, বিত্তবৈভব সব-কিছু বিকিয়ে দিয়ে এল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের পথে কাঁটা বিছিয়ে এল। এরপর থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত চম্পত রায়ের জীবনে আর কোনো দিন শান্তি আসে নি।

ছয়

আরো একবার চম্পত রায় তাঁর ওরছার দুর্গে ফিরে এলেন। মন্‌সব আর জায়গীর হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে অনুযোগের একটি শব্দ বেরোয় নি। কারণ তিনি সারন্ধার চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত। বিন্দুমাত্র অনুযোগ তার আত্মসম্মানের ওপর কুঠারাঘাতের তুল্য অসহ্য হবে।

ওরছায় কিছুদিন শান্তিতেই কাটল। কিন্তু বেশি দিন নয়। সারন্ধার তীব্র কথার ঘা বাদশা আওরঙজেব ভোলে নি, সে ক্ষমা করতে জানত না। ভায়েদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে চম্পত রায়ের দর্প চূর্ণ করার জন্যে একটা বিরাট সৈন্যদল পাঠিয়ে দিল, বাইশ জন অভিজ্ঞ সরদার যুদ্ধ পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হলেন। চম্পত রায়ের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শুভকরণ বুন্দেলা, বাদশার সুবেদার ছিল। সে চম্পত রায়কে হারানোর সংকল্প নিল। আরো বহু বুন্দেলা সরদার রাজার প্রতি বিমুখ হয়ে সুবেদারের সঙ্গে যোগ দিল। ঘোর যুদ্ধ হল। ভাইয়ের তলোয়ার ভায়ের লাল রক্তে স্নান করে মাতাল হল। রাজার যদিও শেষ পর্যন্ত জিত হল। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর বিপুল শক্তিহানি ঘটল এবং সে শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। প্রতিবেশী বুন্দেলা রাজারা এ পর্যন্ত রাজা চম্পত রায়ের ডান-হাত বাঁ-হাত ছিলেন। এখন তাঁরা একে একে বাদশার প্রসাদভিখারী হয়ে উঠলেন। সঙ্গীদের কেউ সঙ্গে এলো, কেউ-বা দাগা দিয়ে গেল। এমন কি, আত্মীয়স্বজনেরাও অনেকে গা ঢাকা দিলেন। এই চরম সংকটেও চম্পত রায় সাহস হারালেন না, ধৈর্য হারালেন না। ওরছা ত্যাগ করে তিন বছর ধরে তিনি বুন্দেলখণ্ডের দুর্গম পাহাড়ে গহীন জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়ালেন। বাদশার সৈন্য শিকারী কুকুরের মতন সারা দেশ চষে বেড়াল। রাজ্যের কারো-না কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সারন্ধা সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থেকে তাঁকে সাহস জোগাত। বড়ো বড়ো সংকটে, যখন ধৈর্য লোপ পাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, যখন আশা বিদায় নিয়ে চলে যায়, তখনো তার আত্মরক্ষার ধর্ম তাকে বর্মের মতন আগলায়। তিন বছর বাদে সুবেদারবর্গ বাদশাকে জানান, যে আপনি ছাড়া এই শার্দুলকে আর কেউ শিকার করতে পারবে না। জবাব এল, সৈন্য সরিয়ে নাও, ঘাঁটি তুলে নাও। রাজা চম্পত রায় ভাবলেন, যাক, এতদিনে বিপদ থেকে ত্রাণ পেলাম। কিন্তু সেটা তাঁর ভুল। শীঘ্রই বুঝতে পারলেন।

সাত

তিন সপ্তাহ ধরে শাহীফৌজ ওরছা ঘিরে রেখেছে। তীক্ষ্ণ কথা যেমন মরমে গিয়ে বেঁধে, কামানের গোলাও তেমনি করে কেল্লার দেয়াল ছেঁদা করে চলেছে। কেল্লার ভেতরে বিশ হাজার লোক, কিন্তু তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মেয়েরা আর তাদের চেয়েও কিছু কম সংখ্যক বালকদল। সমর্থ পুরুষের সংখ্যা দিন দিন কম হয়ে যাচ্ছে। যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ। বাতাস চলাচলের ফাঁক নেই। রসদ কম পড়ে গেছে। পুরুষ আর বালকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য নারীরা উপবাস করছে। সকলের মনে ক্রমবর্ধমান হতাশা। সূর্যের দিকে হাত তুলে তুলে মেয়েরা শত্রুদের অভিশাপ দিচ্ছে। ক্রুদ্ধ ছেলেরা পাঁচিলের আড়াল থেকে শত্রুদের উদ্দেশ্যে পাথর ছোঁড়ে, সে-সব পাথর অবিশ্যি বড়ো একটা পাঁচিলের ওপার পর্যন্ত পৌঁছায় না। রাজা চম্পত রায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। গত কয়েকদিন যাবৎ তিনি শয্যাশায়ী। তাঁকে দেখে সবাই ধৈর্য ধরত, মনে বল পেত। তিনি রোগে পড়ায় সারা কেল্লায় নৈরাশ্যের ছায়া।

রাজা সারন্ধাকে ডেকে বলেন— আজকে এরা কেল্লায় ঢুকে পড়বে নিশ্চয়।

সারন্ধা— ঈশ্বর করুন, তেমন দিন চোখে দেখতে না হয়।

রাজা— অনাথা মেয়েগুলো আর বাচ্চাগুলোর জন্যেই বড়ো চিন্তা হয়। বেচারা উলুখড়গুলোর মিছিমিছি প্রাণ যাবে।

সারন্ধা— আমরা যদি এখান থেকে বেরিয়ে যাই তো কেমন হয়।

রাজা— অসহায় মানুষগুলোকে ফেলে রেখে?

সারন্ধা— এ সময় ওদের ছেড়ে যাওয়াই তো মঙ্গল। আমরা না থাকলে শত্রুরা হয়তো ওদের ওপর কিছু দয়া দেখাতেও পারে।

রাজা— না, না, তা হয় না। এদের ছেড়ে যাওয়া আমার দ্বারা হবে না। যারা আমার জন্যে প্রাণ দিয়েছে তাদের স্ত্রী-পুত্রকে আমি কার হাতে তুলে দিয়ে যাব।

সারন্ধা— কিন্তু কাছে রেখেও তো ওদের কোনো উপকারে লাগতে পারছি না।

রাজা— তাদের সঙ্গে প্রাণ তো দিতে পারব। আমি প্রাণ দিয়ে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করব। তাদের জন্যে বাদশাহী সেনার কাছে জীবনভিক্ষা করব। কারাবাসের কঠোর কষ্ট সহ্য করব। কিন্তু এই ঘোর বিপদের মুখে এদের ফেলে রেখে যেতে পারব না।

সারন্ধা লজ্জা পায়। মাথা হেঁট করে ভাবে— সত্যিই তো। প্রিয় সাথীদের আগুনের মুখে ফেলে সে কি তার নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাইছে। সে কি, এত নীচ, এত স্বার্থপর সে কবে থেকে হল। কিন্তু ভাবতে ভাবতে মাথায় নতুন সংকল্প এলো। বললে— যদি এই আশ্বাস পাও যে দুর্গবাসীদের ওপর কোনো জুলুম হবে না তা হলে তো আর চলে যাবার পথে কোনো বাধা থাকবে না?

রাজা চিন্তা করেন। বলেন— কে দেবে আশ্বাস?

সারন্ধা— বাদশার সেনাপতি যদি প্রতিজ্ঞাপত্র দেন?

রাজা— হ্যাঁ, আমি সানন্দে দুর্গ ত্যাগ করব।

সারন্ধা চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যায়। বাদশার সেনাপতিকে কী ভাবে রাজি করাবে? কে প্রস্তাব নিয়ে যাবে? সেই পামরই বা প্রতিজ্ঞা করবে কেন? তার মনে তো পূর্ণ বিজয়ের আশা। বাক্‌পটু, চতুর, কুটনীতিকুশল এমন কে আমার দূত আছে যে কার্য সিদ্ধি করতে পারবে? কে আছে? এক আছে ছত্রসাল। এই সব ক'টি গুণেরই অধিকারী।

সংকল্পে স্থির হয়ে রানী ছেলেকে পাঠায়। তার চার ছেলের মধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে সাহসী ছেলে— ছত্রসাল। সেই সারন্ধার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। ছত্রসাল এলে সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে সারন্ধা। তার পাঁজর ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ছত্রসাল বলে— কী বলছ মা।

রানী— আজ যুদ্ধের কী অবস্থা ?

ছত্রসাল— এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ জন মারা গেছে।

রানী— বুন্দেলাদের মানসম্ভ্রম এখন ঈশ্বরের হাতে।

ছত্রসাল— আজ রাত্রে আমরা আড়াল থেকে আক্রমণ করব।
রানী সংক্ষেপে ছত্রসালকে তার প্রস্তাবের কথা জানাল।

বললে— এ কাজের ভার কাকে দেওয়া যায় ?

ছত্রসাল— আমাকে।

'তুমি কাজ হাঁসিল করতে পারবে ?'

'নিশ্চয়, আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'

'তবে যাও। মঙ্গলময় তোমার অভিযান সফল করুন।'

ছত্রসাল চলে যাচ্ছে, সারন্ধা ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলে— দয়াল, আমার বুকের নিধি, আমার নয়নের মণি, আমার হীরের টুকরো ছেলেকে আমি বুন্দেলা জাতির মর্যাদা রাখতে উৎসর্গ করে দিলাম। এবার তুমি প্রসন্ন হও, এবার আমার জাতের আবরু-ইজ্জত রক্ষার ভার তুমি নিয়ো। আমার জীবনের মহার্ঘতম অর্ঘ আমি নিবেদন করলাম, তুমি গ্রহণ করো।

আট

পরদিন সকালে রানী সারন্ধা স্নানান্তে পূজার থালি সাজিয়ে মন্দিরে গেল। তার মুখ বিবর্ণ, চোখের কোলে নিকষ কালো ছায়া। মন্দিরের দ্বারে পা রেখেছে, দুর্গের বাইরে থেকে একটা তীর এসে তার থালিতে পড়ল। তীরের ফলার সঙ্গে একখণ্ড কাগজ লেগে রয়েছে। মন্দির-চত্বরে থালা রেখে কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল। এক মুহূর্তে মুখটা আলোকিত হল, পরের মুহূর্তে আষাঢ় রাত্রির তামস মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। জীবনে কি কেউ কখনো এত মূল্য দিয়ে একখণ্ড কাগজ কিনেছে ?

মন্দির থেকে ফিরে রানী রাজসন্দর্শনে যায়। বলে— প্রাণপ্রিয়,

এবার তোমার কথা রাখো। রাজা চমকে ওঠে। প্রশ্ন করে— তুমি তোমার শপথ পালন করেছ? রানী আঁচল খুলে প্রতিজ্ঞাপত্র বার করে, রাজার হাতে দেয়। চম্পত রায় মাথা তুলে দাঁড়ায়। বলে— এবার আমি যাব। আর যদি ওপরওলার ইচ্ছে থাকে তবে আরো একবার শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াব। কিন্তু…সারণ, সত্যি বলো তো, এই পত্রের বিনিময় মূল্য কী দিয়েছ?

সারন্ধা রুদ্ধস্বরে কোনোমতে জবাব দেয়— অনেক কিছু।

রাজা— তবে শুনি।

সারন্ধা— আমার গুণবন্ত, বীর্যবন্ত, যুবক পুত্র—

রাজার অন্তর শরবিদ্ধ হল। বললেন— কে? অঙ্গদ?

সারন্ধা ঘাড় নাড়ে।

রাজা— তবে কি ছত্রসাল?

সারন্ধা মাথা নামায়।

আহত পাখি যেমন পাখা ঝটপট করে তারপর পড়ে যায়, তেমনই চম্পত রায় পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার প্রয়াস করেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে নীচে পড়ে যান। ছত্রসাল তার জীবনের সব আশা-ভরসার সম্বল।

অনেক অনেক পরে তার জ্ঞান ফেরে। চোখ মেলে বলেন— সারণ, এ তুমি কী করেছ?

নিকষ কালো রাত। রানী সারন্ধা অশ্বারোহণে চলেছেন— রুগ্‌ণ রাজা চম্পত রায় পালকিতে— দুর্গের গোপন দ্বার পেরিয়ে তাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন। আজ থেকে বহুকাল আগে এমনি এক বেদনাময়ী তামসী রাত্রির কথা মনে পড়ে রানী সারন্ধার। সেদিন ভ্রাতৃবধূ শীতলাদেবীকে বড়ো কঠোর কথা শুনিয়েছিল। শীতলাদেবীর ভবিষ্যদ্-বানী আজ পূর্ণ হল। কিন্তু সারন্ধা সেদিন সে কথার যা জবাব দিয়েছিল তাও কি এবার পূর্ণ হবে?

নয়

মধ্যাহ্নসূর্যের অগ্নিবর্ষণ সর্বাঙ্গ ঝলসে দিচ্ছে। খর হাওয়া বনে-পর্বতে আগুন লাগিয়ে ফিরছে। খাণ্ডব-দহনের আশঙ্কা নিয়ে মুহূর্ত জপছে আকাশ মৃত্তিকা। চম্পত রায়কে নিয়ে সারন্ধা চলেছেন ক্রমাগত পশ্চিম মুখে। পেছনে, প্রায় দশ ক্রোশ পেছনে পড়ে রইল ওরছা। অনুমানে বোঝা যাচ্ছে এবার নিরাপদ এলাকায় আসা হয়েছে। পালকির মধ্যে অচৈতন্য চম্পত রায়কে কাঁধে নিয়ে ঘর্মাক্ত কাহারের দল সন্তর্পণে পা ফেলছে। পালকির পেছনে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার ক্লান্তিতে পিপাসায় হতাশায় অবসন্ন। তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটা গাছের ছায়া, একটা কুপের সন্ধানে আতুর দৃষ্টি— চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। একমাত্র রানী সারন্ধা অবিচল, দৃঢ়, নির্লিপ্ত।

হঠাৎ একবার পেছন ফিরে তাকায় সারন্ধা। একদল ঘোড়-সওয়ার দূর থেকে আসছে দেখা যাচ্ছে। একবার মনে হল আর রক্ষে নেই।

এরা নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ। আবার আশা হয়— বোধ হয় আমার রাজকুমার। নিজের দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে। চরম নৈরাশ্যের ক্ষণেও আশা জেগে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত এমনি আশায়-সংশয়ে দোদুল্য অবস্থায় কাটে। ততক্ষণে পেছনের সওয়ার দল কাছাকাছি এসে পড়ে। এবার সেপাইদের উর্দী পরিষ্কার চেনা যায়। রানী দীর্ঘশ্বাস টানে। তার শরীর বেতের লতার মতো কেঁপে ওঠে। এরা বাদশার সৈন্য।

সারন্ধা কাহারদের ডেকে বলে— পালকি থামাও। বুন্দেলা সেপাইরা তলোয়ার টেনে নেয়। রাজার অবস্থা শোচনীয়। তবু ছাইচাপা আগুন যেমন বাতাস লাগলে দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি বিপদের আভাস পেয়ে তাঁর রোগজর্জর দেহে বীরের আত্মা চকিতে জেগে ওঠে। পালকির পরদা সরিয়ে তিনি বাইরে এলেন। ধনুর্বাণ হাতে নিলেন। কিন্তু যে ধনুক তাঁর হাতে ইন্দ্রের বজ্রের মতন অগ্নিক্ষরণ করত, এখন তা একটুও নড়ল না। বেঁকল না।

মাথা ঘুরে গেল, পা থরথর করে কেঁপে উঠল। চম্পত রায় মাটিতে পড়ে গেলেন। ভাবী অমঙ্গলের সূচনা লক্ষিত হল। ভগ্নপক্ষ পাখি যেমন উদ্যতফণা সাপকে কাছে আসতে দেখে ওড়বার চেষ্টায় ধড়ফড় করে উঠে, আবার মাটিতে পড়ে যায়— রাজা চম্পত রায় তেমনই বারবার উঠে দাঁড়ান, আবার পড়ে যান। সারন্ধা বহুকষ্টে রাজাকে সন্তর্পণে বসিয়ে দেয়। তারপর কিছু বলবার চেষ্টা করে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। কান্নার বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। অস্ফুট স্বরে শুধু বলে— প্রিয় আমার, স্বামী আমার···। যে মহীয়সী নারী সারাজীবন মর্যাদার জন্যে প্রাণকে তুচ্ছ করে এসেছে, আজ সেই সারন্ধা এক অসহায়া সামান্যা রমণীর মতো শক্তিহীনা। হয়তো এটুকু নারীজাতির সৌন্দর্য।

চম্পত রায় বলল— ঐ দেখ সারণ, আমার আর-এক বীর ভাই পড়ে গেল। হায় রে! যে সংকটকে জীবনভর এড়াতে চেয়েছি— অন্তিম ক্ষণে সেই সংকটই ঘিরে ধরল। আমি এখন অশক্ত। আমার চোখের ওপর শত্রুরা তোমার কোমল অঙ্গ স্পর্শ করবে, কলুষিত করবে— আমি নড়তেও পারব না। মৃত্যু, আর কবে তুমি আসবে?

বলতে বলতে রাজার মাথায় কী খেয়াল আসে। তিনি তলোয়ারের দিকে হাত বাড়ান। কিন্তু হাত অবশ, জোর নেই। তখন সারন্ধার দিকে চেয়ে বলেন-- প্রেয়সী, জীবনে কতবার তুমি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছ—

সারন্ধা স্বামীর নির্দেশের জন্যে প্রস্তুত হল। তার আশা হল হয়তো এ সংকটে সে স্বামীর কোনো সেবায় লাগতে পারবে। ক্ষণিকের জন্যে তার বিবর্ণ মুখে রক্তিমাভা জাগে, অশ্রুস্রোত রুদ্ধ হয়। রাজার দিকে চেয়ে সারন্ধা বলে— ভগবান যদি চান তো মরণের আগে পর্যন্ত তোমার সম্মান রক্ষা করে যাব। সে ভেবেছিল রাজা তাকে প্রাণ বিসর্জনের ইঙ্গিত করছেন। তার অন্তর ভরপুর হয়ে উঠছিল।

চম্পত রায়— তুমি জীবনে কখনো আমার কথা অমান্য কর নি।

সারন্ধা— মরণেও অমান্য করব না।

চম্পত— এ আমার অন্তিম ভিক্ষা। অস্বীকার কোরো না।

সারন্ধা ততক্ষণে তলোয়ার নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরেছে। স্বামীকে বললে— এ তো তোমার আদেশ নয়। এ যে আমারই শেষ অভিলাষ। আমার অন্তরের কামনা যে যখন মরব আমার মাথা যেন তোমার পায়ের তলায় থাকে।

চম্পত— না সারণ, আমার আদেশ তা নয়। সারণ, তুমি আগে যেতে চাও কেন। ওদের হাতে আমায় ফেলে গেলে ওরা আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল্লীর গলিতে গলিতে ঘুরিয়ে বেড়াবে। আমি উপহাসের লাঞ্ছনার পাত্র হব— তুমি কি তাই চাও?

রানী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাজার মুখে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না।

রাজা— আমার শেষ ভিক্ষা। পূরণ করবে?

রানী— শিরোধার্য।

রাজা— কথা দিলে কিন্তু দেখো, অস্বীকার কোরো না।

রানীর স্বর কেঁপে গেল। বলে— না, করব না।

রাজা— তোমার হাতের তলোয়ার আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও।

সারন্ধা বজ্রাহত। অতি কষ্টে বলে— জীবনেশ্বর, এই তোমার আদেশ! সারন্ধার চোখের ওপর অমানিশার আঁধার ঘনিয়ে আসে। বলে— এ আমি কেমন করে পারব?

রাজা— আমায় পায়ে বেড়ি পরে বাঁচতে হবে!— তুমি পারবে না? এই মুরোদ নিয়ে সর্বস্ব দিয়ে আমার মান রক্ষার বড়াই করছিলে? রাজা চম্পত রায় স্থবির সিংহের মতো গর্জন করে।

বুন্দেলার পঞ্চম সৈনিক, শেষ বীরটিও মাটিতে পড়ে গেল। রাজা নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে রানীর চোখে চোখে তাকাল। রানী খানিকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। তারপর বিপন্ন ভাব কাটিয়ে উঠল। শত্রুসৈন্য কাছে এসে পড়েছে। আর এক মুহূর্তে তারা রাজাকে ধরে ফেলবে। সারন্ধা মনস্থির করে ফেলে। বিদ্যুৎ গতিতে তরবারি নিয়ে স্বামীর হৃৎপিণ্ডে আমূল বিদ্ধ করে দেয়।

প্রেমের তরী প্রেমের পারাবারে নিমজ্জিত হয়। রাজা চম্পত রায়ের বুক চিরে রক্তের অম্লান গৌরবের ধারাস্রোত বয়ে যায়। তার মুখে অন্তিম শান্তির শ্যাম ছায়া।

সারন্ধা। তুমি কেমন মেয়ে। যে স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতেই তোমার সুখ, আজ তারই প্রাণহন্ত্রী হলে! যে বুকের আলিঙ্গনে ঈপ্সিতে যৌবনের সুধা পান করে এলে, যে হৃদয় তোমার সব আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, সব অভিমানের চাঁদমারী, তুমি আজ সেই বুকেই শায়ক হানলে। কেমন মেয়ে তুমি? ত্রিভুবনে তোমার মতো আর কোনো স্ত্রী তো এমন করে স্বামীর কথা পালন করে নি। উঃ আত্মসম্মান, তোমার কী বিষাদবৎ পরিণাম। কোথাও এর তুলনা নেই—উদয়পুরে নয়, মেবারের ইতিহাসেও না। স্তব্ধ বজ্রাহত বাদশা-সেনার সরদার বলে— রানীসাহেবা, গোলামের ওপর কী হুকুম বলুন, জান দিয়ে তামিল করব।

সারন্ধা— আমার পুত্রদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে এই দুটো শবদেহ তাদের হাতে দিয়ো।

তলোয়ারটা নিজের বুকে গেঁথে দেয়। মৃতদেহের মাথাটা স্বামীর কোলে আশ্রয় নেয়।

রেষারেষি

জোখু ভগত আর বেচন চৌধুরীর মধ্যে তিন পুরুষ ধরে মামলা চলে আসছে। জমির সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপার আর কী। ওদের পিতামহদের আমলে বারকয়েক খুনখারাপি হয়ে গেছে। বাপেদের সময়ে কোর্টকাছারি শুরু হয়েছে। তাঁরা বারকতক হাইকোর্টও করে এসেছেন। ছেলেদের আমলে সংগ্রামের ভয়াবহতা আরো বেড়েছে, এতদূর গড়িয়েছে যে দুপক্ষই এখন অশক্ত হয়ে পড়েছে। আগে ওরা দুজনেই গ্রামের আধাআধি অংশীদার ছিল। এখন ওদের সম্পত্তি বলতে, সেই যা নিয়ে ঝগড়া-মোকদ্দমা, সেটা ছাড়া আর এক বিঘত জমিও বাড়তি নেই। জমি গেছে, টাকাপয়সা গেছে, মানমর্যাদা গেছে, কিন্তু বিবাদ সেই যেমনকার তেমনি রয়ে গেছে। হাইকোর্টের ধুরন্ধর আইনজ্ঞরা একটুকরো জমির বিবাদ মীমাংসা করতে পারেন নি।

এই দুই সজ্জনে মিলে গোটা গ্রামটাকে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছেন। একদলের সিদ্ধি ভাঙ চৌধুরীর উঠোনে কোটা হয়, তো আর-এক দলের গাঁজা-আফিমের ধূম ওড়ে ভগতের বারান্দায়। দলাদলি গাঁয়ের মেয়েছেলে আর বাচ্চাকাচ্চার ভেতরেও রয়েছে। এমন-কি, এই দুই দলের মাথাদের সামাজিক ধার্মিক জীবনদর্শনও সুস্পষ্ট বিভাজন-রেখা দিয়ে চিহ্নিত। চৌধুরী বাসি কাপড়ে ছাতু খায় আর ভগতকে বলে ভণ্ড। ভগত কাপড় না ছেড়ে জলটুকুও ছোঁয় না, সে চৌধুরীকে বলে ম্লেচ্ছ। ভগত যদি সনাতন-ধর্মী হয় তো চৌধুরী আর্যসমাজে দীক্ষা নেয়। যে কাপড়অলা, মুদি বা তরকারিঅলার কাছ থেকে চৌধুরী সওদা কেনে, ভগত তার দিকে চোখ তুলে তাকালেই পাপ বলে ভাবে; ভগতের হালুইকরের মিষ্টি, তার গয়লার দুধ কি তার কলুর তেল চৌধুরীর কাছে অস্পৃশ্য। রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মতভেদ। ভগত কবরেজী পছন্দ করে, চৌধুরী য়ুনানীর সমর্থক। ব্যায়রাম হয়ে মরে গেলেও কেউ কারোর সিদ্ধান্ত পালটাবে না।

দুই

দেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল তখন তার ঢেউ এ গ্রামেও পৌঁছলো। চৌধুরী আন্দোলনের পক্ষে গেল, ভগত বিরুদ্ধে। এক ভদ্রলোক এসে গাঁয়ে কিষাণ-সভা খুললেন। চৌধুরী তার সদস্য হলেন, ভগত আলাদা রইলেন। জাগৃতি বাড়তে লাগল, স্বরাজের আলোচনা চলতে লাগল। চৌধুরী স্বরাজ্যবাদী হয়ে পড়লেন, ভগত রইলেন রাজভক্তদের পক্ষে। চৌধুরীর বাড়ি দেশ-প্রেমিকদের আড্ডা হয়ে উঠল, ভগতের বাড়িতে রাজভক্তদের ক্লাব বসল।

চৌধুরী জনসমক্ষে স্বরাজের প্রচারে নামলেন—

"বন্ধুগণ, স্বরাজ মানে হল নিজের রাজত্ব। নিজের দেশে নিজেদের রাজত্ব হয় সেই ভালো, না কি অন্যের রাজত্ব ভালো?"

জনতা বলল— নিজেদের রাজত্বই ভালো।

চৌধুরী — ত হলে ভাবতে হয় স্বরাজ কিসে পাওয়া যাবে! আত্মিক শক্তিতে, পুরুষার্থ দিয়ে আর ঐক্য দিয়ে। একে অপরের ওপর হিংসাদ্বেষের ভাব ছেড়ে দাও। নিজেদের ঝগড়া বিবাদ নিজেরাই মিলেমিশে মিটমাট করে নাও।

প্রশ্ন উঠল — আপনি নিজেই তো নিত্যি আদালতে দৌড়োন।

চৌধুরী— ঠিক কথা। কিন্তু আজ থেকে যদি আদালতমুখো হই তো আমার যেন গোহত্যার পাপ হয়। তোমাদের উচিত নিজেদের রোজগার বালবাচ্চার ভোগে লাগানো, আর যদি কিছু বাঁচে তা দিয়ে পরোপকার করা। উকিল-মোক্তারের পকেট ভরিয়ে কী হবে, থানার লোককে ঘুষ খাইয়ে, আমলাদের খোসামোদ করে মরবে কেন? সেকালে ছেলেপুলেরা ধর্মের শিক্ষা পেত, তাই তারা সদাচারী ত্যাগী কর্মঠ হয়ে গড়ে উঠত। এখন বিদেশী পাঠশালায় পড়ে চাকরি করে, ঘুষ খায় শখসৌখীনতা করে, নিজের বাপপিতা-মহের নিন্দে করে, দেবদ্বিজে অভক্তি করে, সিগারেট খায়, চুল কাটে আর হাকিমদের পদসেবা করে। আমাদের ছেলেপুলেকে স্বধর্ম-শিক্ষা দেওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়?

জনতা— চাঁদা করে পাঠশালা খোলা দরকার।

চৌধুরী— আমরা আগেকার দিনে মদ ছোঁওয়া পাপ বলে ভাবতুম। আর এখন গাঁয়ের ঘরে ঘরে, অলিগলিতে মদের দোকান। এখন আমাদের কষ্টের রোজগারের কোটি কোটি টাকা মদে গাঁজায় উড়ে যায়।

জনতা— যে মদ ভাং খাবে তাকে ধরে ঠেঙানো উচিত।

চৌধুরী— আমাদের বাপ ঠাকুরদার আমলে লোকে, কী ছোটো, কী বড়ো সবাই মোটা বস্তর পরত। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা চরখা কাটত। ঘরের ধন ঘরে থাকত। আমাদের জোলাতাঁতী ভায়েরা সুখে থাকত। আজকাল আমাদের বিদিশি মিহি সুতোর রঙিন কাপড়ের ঢেউ লেগেছে। কাজেই বিদেশের লোকে দুহাতে আমাদের পয়সা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, দেশের জোলাতাঁতী ভিখিরি হয়ে পড়ছে। নিজের ভায়ের পেট মেরে পরের থালায় ব্যঞ্জন ঢালা— এই কি আমাদের ধর্ম ?

জনতা— এখন আর খাদির কাপড় পাওয়া যায় না।

চৌধুরী—যে যার ঘরে চরখা কাটো, মোটা খাদি বুনে পরো। আদালত ত্যাগ করো, নেশাভাং ছাড়ো, ছেলেপুলেকে ব্রতাচার শেখাও, মিলেমিশে থাকো — ব্যস, একেই স্বরাজ বলে। যারা বলে স্বরাজের জন্যে রক্তের নদী বইবে, তারা পাগল — তাদের কথায় কান দিয়ো না।

জনতা সাগ্রহে চৌধুরীর কথা শুনল। সভায় দিন দিন শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে চলল। চৌধুরী সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠলেন।

তিন

এদিকে ভগতজী সবাইকে রাজভক্তির উপদেশ বিলোতে লাগলেন—

“শোনো ভাইসব, রাজার কাজ রাজত্ব করা, প্রজার কাজ রাজার আজ্ঞা পালন করা। একেই বলে রাজভক্তি। আর আমাদের শাস্ত্রেও এই রাজানুগত্য শিক্ষা দিয়েছে। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি,

তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে চললে— মহাপাতক হয়। রাজবিদ্বেষী লোক নরক ভোগ করে।”

প্রশ্ন হল— রাজারও নিজের ধর্ম পালন করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন— আমাদের রাজা কোথায়, আসল রাজা তো বিলেতের বেনে-মহাজন।

তৃতীয় প্রশ্ন— বেনে টাকা কামাতে জানে, রাজ্যশাসনের কী বোঝে?

ভগত বললেন— লোকে তোমাদের শেখাচ্ছে আদালতে যেয়ো না, পঞ্চায়েতে নালিশ নিয়ে যাও; কিন্তু এমন পাঁচ জন কোথায় যে ন্যায়-বিচার করবে, দুধের দুধ জলের জল চুল চিরে ভাগ করে দেবে? সেখানে তো মুখ দেখে বিচার হবে। যার দাপট আছে তার জিত হবে, যার নেই সে বেচারা মারা পড়বে। আদালতে সব কাজকম্ম আইনের ওপর, সেখানে ছোটো বড়ো সবাই সমান, বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়।

আবার তর্ক উঠল— আদালতের ন্যায়বিচার সব কথার কথা। যার সাজানো সাক্ষী আর মারপঁ্যাচ জানা উকিল আছে তারই জিত হয়, সত্যিমিথ্যের কে ধার ধারে? হ্যাঁ, হয়রানি অবিশ্যি বেশ ভালোভাবেই হয়।

ভগত আবার. বলেন— বলা হচ্ছে বিদেশী জিনিস ব্যাভার কোরো না। এটা গরিবদের প্রতি অবিচারের কথা। আমরা বাজারে যে জিনিস সস্তা আর মজবুত পাব, তাই তো নোব। সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। আমাদের পয়সার কি দাম নেই যে দিশি জিনিস বলে বস্তাপচা মাল কিনে নষ্ট করব।

বিরুদ্ধে আরও যুক্তি দাঁড়াল। একজন বললে— সে যাই হোক, পয়সাটা তো দেশেই থাকছে, অন্যদেশে চলে তো যাচ্ছে না।

আর একজন— নিজের ঘরে ভালো খাবার নেই বলে কি বেজাতের ঘরে পাতড়া চাটতে হবে?

ভগতজী বিষয়ান্তরে গেলেন— বলা হচ্ছে সরকারী পাঠশালে ছেলে পাঠিও না। তা সরকারী পাঠশালে না পড়লে ভায়েরা সব

বড়ো বড়ো চাকরি কোথায় পেত, বড়ো বড়ো কারখানা কেমন করে খুলত ? নতুন শিক্ষা না পেলে এখন আজকের দুনিয়ায় অচল, পুরনো বিদ্যেয় চালকলা বাঁধা আর পাঁজি পড়া ছাড়া আর-কিছু করা যায় না। পাঁজিপুঁথির বিচার দিয়ে কি রাজকার্য চলবে ?

একজন সংশয়ী রায় দিলে— আমাদের রাজকার্যে কোনো দরকার নেই। আমরা নিজেদের ক্ষেত খামারেই সন্তুষ্ট ; কারুর গোলামি করতে যাচ্ছি না তো।

আর একজন— যে বিদ্যেয় লোককে দেমাকী করে তোলে, অমন বিদ্যের চেয়ে মুখ্যু হয়ে থাকা ভালো। নতুন বিদ্যে শেখার ফল তো হয়েছে— সুট বুট, ছড়িঘড়ি, হ্যাটকোট লাগিয়ে লোকে ঠেকার দেখিয়ে বেড়াচ্ছে আর শখের পেছনে দেশকে দেউলে করে বিদিশির পেট মোটা করছে। এরা সবাই দেশদ্রোহী।

ভগত— মদের ওপর ইদানীং লোকের বড়ো কড়া নজর। নেশা খারাপ অভ্যেস, তা সবাই জানে। কিন্তু নেশার জিনিসের দোকান থেকে সরকারের বছরে কোটি কোটি টাকার আয়। দোকানে না গেলে যদি মানুষের বদ অভ্যেস ঘুচে যায় তা হলে তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু দোকানে না গিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে দুনো দাম দিয়ে নেশাখোর তার নেশার জিনিস ঠিকই জোটাবে, তাতে সাজা হয় সেও ভালো। ফলে সরকারেরও লোকসান, আবার গরিব প্রজারও লোকসান। এ কাজ করতে যাই কেন ? তা ছাড়া কোনো কোনো নেশার জিনিসে কারুর কারুর উপকারও হয়। এই যেমন আমার কথাই ধরো না, আফিম না খেলে গাঁটে গাঁটে এমন ব্যথা হয়, আর পেট ফুলতে থাকে দম আটকে আসে, সর্দিতে কাবু করে।

একজনের গলা শোনা গেল— মদ খেলে শরীরে ফুর্তি আসে।

প্রশ্ন হল— সরকারের অধর্মের পয়সা নেওয়া উচিত নয়। এই অধার্মিকের রাজত্বে প্রজার কল্যাণ হবে কী করে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন— আগে মদ গিলিয়ে বদ স্বভাব করে দিয়ে তারপর পয়সা খিঁচতে চায়। এত মজুরী কে কামায়, যে ভাত কাপড় চালিয়ে আবার মদ গাঁজার পয়সা জোটে ? কাজেই, হয় বাচ্চা-

কাচ্চার পেট কাটো, আর নয় চুরি করো, জুয়া খেলো, বেইমানি জালিয়াতি করো। মদের দোকান মানেই আমাদের গোলামির আড়তখানা।

চার

এদিকে চৌধুরীর উপদেশ শোনার জন্যে জনতার ভিড় হত খুব। লোকের দাঁড়াবার ঠাঁই মিলত না। দিনের পর দিন চৌধুরী মশায়ের মান-সম্মান বেড়েই চলেছে। তাঁর ওখানে নিত্যি পঞ্চায়েত বসে, দেশোদ্ধারের কথা হয়, এ-সব কথায় মানুষের যেমন আনন্দ, তেমন উৎসাহ। তাদের রাজনীতির জ্ঞান বাড়ে। তারা নিজেদের মহিমা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা সত্তাচেতন হয়ে ওঠে, ক্রমেই স্বৈরাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করতে শেখে। তারা এখন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। ঘরের তুলো, ঘরের সুতো, ঘরে তৈরি কাপড়, ঘরের অন্ন, ঘরেই বিচার সভা, না পুলিশের ভয়, না আমলার খোসামোদ, গ্রামের মানুষ এখনো সুখে শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। অনেকেই নেশা ভাঙ ছেড়ে দিলে, সদ্ভাব সম্প্রীতির প্রবাহ বইতে রইল।

কিন্তু ভগতজীর সে সৌভাগ্য হল না। তাঁর উপদেশে ক্রমেই অরুচি ধরে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁর সভাতে পাটোয়ারী, চৌকিদার, সরকারী ইস্কুল মাস্টার, আর এই ধরনের সরকারী চাকরে ছাড়া বড়ো একটা কেউই আসতে চাইত না। কখনো-সখনো বড়ো বড়ো হাকিম-মানুষেরা এসে পড়তেন, ভগতজীর খুব প্রশংসা-টশংসা করতেন। তখন কিছুক্ষণের মতন ভগতজীর দুঃখ ঘুচে যেত। কিন্তু আধ ঘণ্টার খাতিরে কি অষ্টপ্রহরের অপমানের জ্বালা জুড়োয়। ভগতজী ঘর থেকে বেরোলেই লোকে আঙুল তুলে দেখায়। কেউ বলে খোসামুদে ধামাধরা, কেউ বলে পুলিশের গুপ্তচর।

প্রতিদ্বন্দ্বীর সুখ্যেত আর নিজের নিন্দে শুনতে শুনতে ভগতজীর কানে তালা ধরে গেছে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে থাকেন। জীবনে

এই প্রথম বার তাঁকে এত অপযশ কুড়োতে হল। যে বংশমর্যাদা রক্ষা করার জন্য সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন, যেজন্যে আজ সর্বস্বান্ত হয়েছেন বললেই হয়, সে বংশমর্যাদা আজ ধুলোয় লুটিয়েছে। এই জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে থাকেন দিনরাত। হৃত সম্মান ফিরে পাবার চিন্তায়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধূলিসাৎ করার চিন্তায়, তার গুমোর ভাঙবার চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না তাঁর।

শেষে একদিন বাঘের গুহাতেই বাঘকে চিৎ করে ফেলার সংকল্প নিলেন জোখু ভগত।

পাঁচ

সেদিন সন্ধেবেলা। চৌধুরীর সদরের সামনে বড়ো করে সভা বসেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও চাষীরা সব এসেছেন। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। চৌধুরী তাঁদের কাছে স্বরাজ-স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। মুহুর্মুহু ভারত-মাতার জয়ধ্বনি উঠছে। মহিলারাও একদিকে সমবেত হয়েছেন। চৌধুরী তাঁর ভাষণ শেষ করে বসেছেন। স্বয়ং সেবকেরা স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্যে চাঁদা আদায় করে ঘুরছেন। এমন সময় কোথা থেকে ভগতজী এসে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

"ভাই সকল, আমাকে এখানে দেখে তোমরা আশ্চর্য হোয়ো না। আমি স্বরাজ্যের বিরোধী নই। এমন কোনো পতিত জীব আছে যে স্বাধীনতা-স্বরাজের বিরোধী হবে। তবে স্বরাজ প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে চৌধুরী তোমাদের যা বলছে আর তোমরা তার কথায় নাচছ, ওতে স্বরাজ আসবে না। যতক্ষণ নিজেদের ভেতর দলাদলি আর রেষারেষি রয়েছে, ততক্ষণ পঞ্চায়েত করে কী হবে আমায় বলো দিকি। বিলাসিতার ভূত ঘাড়ে চেপে রয়েছে, নেশা ছুটবে কেমন করে, শুনি। মদের দোকান বর্জন হবে কী করে। সিগ্রেট, সাবান, মোজা, গেঞ্জি, আদ্দির কাপড়—এ-সব থেকে মনকে মুক্ত করবে কোন্ মন্তরে। এদিকে মগজে লোকের ওপর হুকুম চালানোর, ক্ষমতা দেখানোর

নেশা, সরকারী ইস্কুল ছাড়বে কী করে। কী করে বিধর্মী শিক্ষার বেড়ি মুক্ত হবে। স্বরাজ পাবার একটি মাত্রই রাস্তা। সে হল আত্মসংযম। এই মহৌষধই তোমাদের সমস্ত রোগ সমূলে বিনষ্ট করতে পারে। আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলো, মন আর ইন্দ্রিয়কে বশে আনো, তোমাদের মধ্যে মাতৃভাব জাগুক, তখনই বৈমনস্য ঘুচবে, ঈর্ষাদ্বেষ ঘুচবে। তখনই ভোগবিলাসের ইচ্ছা মন থেকে দূর হবে, তবেই নেশার অভ্যেস ঘুচবে, তার আগে নয়। এই আত্ম-শক্তি ছাড়া স্বরাজ অসম্ভব। স্বার্থ-সেবাই সকল পাপের মূল ; এর জন্যেই তোমাদের আদালতে দৌড়াতে হয়। এই তোমাদের বিধর্মী শিক্ষার দাস করে রেখেছে। আত্মবল দিয়ে ঐ পিশাচকে নষ্ট কর, তবেই তোমাদের কামনা পূর্ণ হবে। সবাই জানেন, যে আমি চল্লিশ বছর যাবৎ আফিম খাই। আজ থেকে আমি আফিম গোরক্তবৎ ত্যাগ করলাম। চৌধুরীর সঙ্গে আমার তিন পুরুষের বিবাদ। আজ থেকে চৌধুরী আমার ভাই। আজ থেকে আমাকে বা আমার পরিবারের কাউকে যদি হাতে-কাটা সুতার হাতে-বোনা কাপড় ছাড়া আর-কিছু পরতে দেখ, তো তোমরা পাঁচজন আমাকে যা খুশি দণ্ড দিতে পারো। ব্যস, আমার যা বলবার ছিল বলেছি। পরমেশ্বর আমাদের সকলের ইচ্ছা পূরণ করুন।”

এই কথা বলে ভগতজী বাড়ির দিকে পা দিয়েছেন। চৌধুরী এসে তাঁর গলা ধরলেন। তিন পুরুষের ঝগড়া এক মিনিটে মিটে গেল। সেদিন থেকে তাঁরা দুজনেই স্বরাজ-আন্দোলনে লেগে গেলেন। ওদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একসঙ্গে দুজনে সভায় যান। এখন বলা শক্ত, লোকে দুজনের মধ্যে কাকে বেশি সম্মান করে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্ফুলিঙ্গ দুটি পুরুষের আন্তর দীপ্তির স্ফুরণ ঘটাল।

শেষ কিস্তি

ওয়াজিদ আলি শাহের আমল। লখনৌ শহরটা বিলাসিতার রঙিন গাঙে হাবুডুবু খাচ্ছে। ছোটো-বড়ো নেই, গরিব-আমির নেই, সবাই বিলাস-মগ্ন। কেউ নাচগানের মেহফিল সাজাচ্ছে, তো কেউ আফিমের মৌতাতে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। জীবনের প্রতি স্তরে আমোদ-প্রমোদেরই প্রাধান্য। প্রশাসনে, সাহিত্যে, সামাজিক মেলামেশায়, কলা-কুশলতায়, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, আচারে-ব্যবহারে সর্বত্র বিলাসিতার সর্বব্যাপী ঢেউ। রাজপুরুষরা বিষয়-বাসনায় ; কবিকুল প্রেম আর বিরহ-গাথার গুঞ্জনে ; কারিগর নক্সা আর জাফরি, জরি আর চিকনের পেলবতায় ; ব্যবসাদার আতর আর সুরমা, মিশি আর মনোহারীর সওদায় আকণ্ঠ ডুবে আছে।

বিলাসের মদিরায় সকলরেই চোখ ঢুলুঢুলু। জগৎ সংসারে কোথায় কী ঘটছে, তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। কবুতর বাজি হচ্ছে। তিতিরের লড়াই হবে, তার মহড়া চলছে। কোথাও পাশায় টাট বিছোনো, 'কচে-বারো'র আওয়াজে সরগরম। কোথাও দাবার ছকে ঘোর যুদ্ধের ঘনঘটা। রাজরাজড়া থেকে ভিখিরি কাঙাল অব্দি সবাই ঐ একই ঘোরে মত্ত। বেশি কথা কী, ফকিরকে একটা পয়সা দিলে সে রুটি না কিনে আফিম খায়, মোদক চাখে। তাস-দাবা-পাশা খেললে মগজ সাফ হয়, বুদ্ধি খোলে, চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটে, জটিল সমস্যা সমাধানের অভ্যেস হয়। এই-সব অকাট্য যুক্তি তখন বাজারে আপ্ত বাক্যের মতো চালু (এই শ্রেণীর যুক্তিবাদীরা এ যুগেও বিরল নয়)। কাজেই মিরজা সাজ্জাদ আলি আর মীর রওশন আলি যদি দিনের রাতের অধিকাংশ সময় নিজেদের বিবেচনা-শক্তি তীব্র করার কাজে ব্যয় করতে চান, তবে কোনো চিন্তাশীল লোকের তাতে আপত্তি করা সাজে না। দুজনেরই মৌরসী জায়গীর রয়েছে। জীবিকার ফিকির করতে হয় না। ঘরে বসে বসে করে

কী। কিছু কাজ তো চাই।

সাত সকালে নাস্তা খেয়ে দুই দোস্তয় ছক বিছিয়ে বসেন, খুঁটি সাজানো হয়, লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ চলতে থাকে। তারপর কোথা দিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, কখন যে বেলা গড়িয়ে সন্ধে নামে —কে খবর রাখে। বাড়ির ভেতর বার বার এত্তেলা আসে— খানা তৈরি। এখান থেকে জবাব যায়— যাও, আসছি, দস্তরখান বেছাও। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় বাবুর্চি বৈঠকখানায় খাবার রেখে যায়। দুই বন্ধু একসঙ্গে দুই কর্ম সারেন।

মিরজা সাজ্জাদ আলির বাড়িতে গুরুজন বলতে কেউ নেই। তাই তাঁর বৈঠকখানাতেই দাবার আড্ডা বসে। তার মানে এ নয় যে বাড়ির সবাই তাঁর এবম্বিধ আচরণে খুব প্রসন্ন। ঘরণীর তো কথাই নেই, বাড়ির নোকর-চাকর থেকে নিয়ে মায় পাড়া-পড়শি পর্যন্ত সবাই বিরূপ। সবাই টিপ্পনি কাটে— বড়ো পাজি-নেশা বাবা। ঘরসংসার চুলোয় দেয়। খোদা যেন শত্তুরকেও এই বাই না দেন। এ বাতিক একবার ঘাড়ে চাপলে সে লোক আর ত্রিভুবনের কোনো কম্মে লাগে না—দুনিয়ার বার হয়ে যায়। বড়ো বদ রোগ। মিরজা সাহেবের বেগম তো এ খেলার ওপর এতই চটা, যে বাগে পেলেই স্বামীকে বেশ একচোট ধাতানি দেন। তবে বাগে পাওয়া অবশ্যি খুবই শক্ত, কারণ তাঁর বিছানা ছাড়ার অনেক আগেই ওদিকে ছক পড়ে যায়। আবার রাত্তিরে শয্যা গ্রহণের আগে কদাচিৎ মিরজার মুখ দেখা যায়। রাগটা গিয়ে পড়ত চাকরদের ওপর। —'কী হয়েছে, পান চাইছে। যা গিয়ে বল, ভেতরে এসে নিয়ে যেতে। খেতে আসার ফুরসত নেই। আঃ যা খাবার সুদ্ধ থলিখানা মাথার ওপর ছুঁড়ে মেরে আয়। খুশি হয় গিলুক, খুশি হয় কুত্তাকে গেলাক।' তা আড়ালে যা বলা যায়, সব-কিছু তো আর মুখের ওপর বলা যায় না। বেগমের স্বামীর ওপর যত-না রাগ, তার দ্বিগুণ রাগ মীরসাহেবের ওপর। নতুন নামকরণ করেছেন— ছিনেজোঁক। সম্ভবতঃ নিজের সাফাই গাইতে গিয়ে মিরজা সায়েব সমস্ত দোষ মীরের ঘাড়ে চাপিয়ে বেকসুর খালাস নিতেন।

সেদিন বেগম সাহেবার মাথা ব্যথা করছে। বাঁদীকে ডেকে বললেন— যা, গিয়ে মিরজা সায়েবকে ডেকে আন। বল্ এক্ষুনি গিয়ে হাকিমের বাড়ি গিয়ে ওষুধ আনতে। যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ছুটে যা। ঝি গিয়ে বলতে মিরজা বললেন— তুই যা, আমি এখনই আসছি।

ঝিকে একলা ফিরতে দেখে বেগমের মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। বটে! আমার মাথার যন্ত্রণা আর হুজুরের দাবা খেলা বন্ধ যায় না। মুখ লাল হয়ে ওঠে। ঝিকে আবার পাঠান—গিয়ে বল্, এক্ষুনি উঠে আসুন। নইলে তিনি নিজেই হাকিমের বাড়ি চলে যাবেন।

মিরজা একটা ভারী মনের মতন চাল দিয়েছেন। আর দুকিস্তিতেই মীরসাহেব মাত হয়ে যাবেন। এমন সময় বাগড়া।

ঝেঁজে উঠে বলেন – কী এমন শ্বাস উঠেছে যে একটু সবুর সয় না।

তা শুনে মীর সায়েব বললেন – আরে মিয়াঁ, যান না একবার, বোঁ করে গিয়ে শুনেই আসুন-না। মহিলারা একটু অল্পে কাতর হয়েই থাকেন।

মিরজা— তা তো বটেই, আমি উঠে গেলে তো আপনার সুবিধেই হয়। দু'কিস্তিতে মাত হতে চলেছেন কিনা।

মীর— জনাব, এই আনন্দেই থাকুন। আমিও চাল ভেবে রেখেছি, আপনার যেমন ঘুঁটি তেমনই বজায় থাকবে, মাত হয়ে যাবেন। যান যান, ভেতর থেকে শুনে আসুন। কেন খামোকা ওঁর মনে কষ্ট দেবেন।

মিরজা— এত বড়ো কথা। তবে মাত করেই উঠব।

মীর— আমি খেলবই না। আগে গিয়ে বিবিজানের কথা শুনে আসুন।

মিরজা— আরে দূর, আপনিও যেমন, এখন যেতে হবে হাকিমের ওখানে। মাথার যন্ত্রণা না চুলোর ছাই, কিস্সু না। কেবল আমায় খানিক হয়রান করার ফিকির।

মীর— সে যাই হোক, তাঁর কথাটা তো মান্য করতে হবে।

মিরজা— আচ্ছা এই চালটা দিয়ে যাই।

মীর— কিছুতেই না। যতক্ষণ না আপনি শুনে আসছেন, আমি ঘুঁটিতে হাতই দেব না।

অগত্যা মিরজা ভেতরে গেলেন। তাঁকে দেখে বেগম সাহেবা কাতরাতে কাতরাতে বলেন— চুলোর দাবা খেলা তোমার এত বড়ো হল, যে কেউ মরে গেলেও ওঠবার নাম কর না। আল্লা যেন তোমার মতন দুটো পয়দা না করেন।

মিরজা— কী করি বল, মীর সাহেব কথাই কানে নেয় না। অতি কষ্টে গেরো ছাড়িয়ে এসেছি।

বেগম— কেন। যেমন নিজে লক্ষ্মীছাড়া, তেমনই সবাইকেই তাই ভাবে না কি। এ কী ধারার মানুষ রে বাবা, ঘরবাড়ি নেই? কোনো চুলোয় কি কেউ নেই, সব পাপ চুকিয়ে এসে এখানে জুটেছে!

মিরজা— বড়ো নাছোড়বান্দা লোক। এসে বসে গেলে আর না বলতে পারি না। বাধ্য হয়ে খেলতে বসতে হয়।

বেগম— তাড়িয়ে দিতে পার না?

মিরজা— তা কি হয়? সমাজে একসাথে ওঠা-বসা, সমগোত্রের মানুষ। তায় বয়েসে, মানমর্যাদায় এক চুল ওপরে বই নীচে নয় তো। মানিয়ে চলতেই হয়, নইলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়।

বেগম— বেশ, তুমি না পারো আমি তাড়াচ্ছি। রাগ করে তো করুক, বয়ে গেল। এঁঃ রাগ করবে। কে আমার ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষা করছেন রে। রাগ করে ঘরের ভাত বেশি করে খাবে। হিরিয়া, যা তো বাইরে থেকে দাবার ছকটা উঠিয়ে নিয়ে আয়। মীর সাহেবকে বলবি, মিঁয়াসাহেব আর খেলবেন না, আপনি গা তুলুন।

মিরজা 'হাঁ-হাঁ' করে ওঠেন— আরে না না, এই দেখ, এই হিরিয়া, দাঁড়া কোথায় যাচ্ছিস। ছিছি, এমন কাণ্ড করে কখনো, মানী লোকের বেইজ্জতী হয়ে যাবে।

বেগম— তুমি থামো তো। খবর্দার যদি আটকাবে তো আমার মরা মুখ দেখবে। আচ্ছা হিরিয়া তুই থাক্, আমিই যাচ্ছি, দেখি আমায় কে আটকায়।

মুখের কথা শেষ হবার আগেই বেগম সাহেবা জোর কদমে

বৈঠকখানামহলের দিকে পা বাড়ান। মিরজা সাহেবের মুখ ন। বিবির পায়ে ধরতে বাকি রাখে—দোহাই তোমার, হজরত হুসেনের দিব্যি। ও ঘরে গেলে তুমিই আমার মরা মুখ দেখ। কিসের কী। বেগম সাহেব ভ্রূক্ষেপও করেন না দিব্যি দিলেশায়। বৈঠকখানার দোর পর্যন্ত বেশ ঝাঁজের সঙ্গে চলে এলেন। কিন্তু হঠাৎ পরপুরুষের সামনে যেতে একটু বাধো বাধো ঠেকে। উঁকি দিয়ে দেখেন ভেতরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। মীর সাহেব বোড়েটা-গজটা দু-এক ঘর এদিক-ওদিক করে দিয়ে, ভালোমানুষ সেজে রকে পায়চারি করছেন। এদিকে ফাঁকা ঘরে ঢুকে বেগম সাহেব এক ধাক্কায় ছক উলটে দিলেন! বড়েগুলো কিছু বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ল, কিছু ছিটকে গিয়ে চৌকির তলায় সেঁদোলো। বেগম সশব্দে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিলেন। মীর সাহেব দরজার বাইরেই টহল দিচ্ছিলেন। ঘুঁটিগুলো উড়ে এসে বাইরে পড়ছে, দেখছেন; চুড়ির ঝনঝনিও কানে আসছে, শুনছেন। তারপরই দোরে হুড়কো তোলার আওয়াজ। দেখেশুনে তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না, যে বাড়ির ঈশ্বরী বিগড়েছেন। চুপচাপ ঘরমুখো হাঁটা দিলেন।

মিরজা তখন কর্ত্রীকে বলেন—ছি! কী কাণ্ড করলে বলো দিকি।

বেগম— বেশ করেছি। এবার এমুখো এলে রাস্তা থেকেই বিদেয় করব। উঃ কী নেশা। এতখানি টান নিয়ে আল্লাকে ডাকলে উদ্ধার হয়ে যায়। হুজুরেরা বসে বসে দাবা খেলবেন আর আমি বাঁদী এখানে হেঁসেলে বসে মাথা কুটব। কী, যাবে হাকিম বাড়ি, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গড়িমসি করবে।

মিরজা বাড়ি থেকে হাকিম বাড়ির নাম করে বেরিয়ে সিধে মীরের বাড়ি উঠল। সারা বৃত্তান্ত শুনে মীর বলে— আমি ঘুঁটি হাওয়ায় উড়ছে দেখেই আন্দাজ করেছি। আর দাঁড়াই! বড়ো রাগী, না? তবে যাই বলুন ভাই, আপনি যে এই মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন, এটা উচিত নয়। আপনি পুরুষমানুষ বাইরে কোথায় কী করছেন, সে খবরে তাঁর কী দরকার। ঘর-গেরস্তালির খবরদারি

করা তাঁর কাজ তাই করুন না। মেয়েমানুষের সব কথায় থাকা কেন।

মিরজা— সে তো হল। এখন কোথায় বসা হবে তাই বলুন।

মীর— ওঃ বসার আবার ভাবনা। এত বড়ো ঘর পড়ে রয়েছে। আসুন এখানেই জমা যাক।

মিরজা— তা তো হল। কিন্তু বেগমকে বোঝাব কী করে। ঘরে বসলেই বেগড়ায়; তা এখানে বৈঠক বসলে তো আর আস্ত রাখবে না।

মীর— আরে দূর, বকতে দিন না, কত বকবে। দু-চারদিন বকবক করে আপনিই চুপ করে যাবে। হ্যাঁ দেখুন, আপনি বরং এক কাজ করুন। এবার থেকে একটু কষে চলুন।

দুই

মীর সাহেবের বেগম আবার কী এক অজ্ঞাত কারণে স্বামীর 'বাইরে বাইরে থাকাই' পছন্দ করেন। সেইজন্যে তাঁর দাবাপ্রেম নিয়ে তিনি কোনোদিন কিছু বলেন নি। বরং কোনোদিন মীর সায়েবের বেরোতে দেরি হয়ে গেলে তাঁকে খেয়াল করিয়ে দিতেন। এই-সব দেখেশুনে মীর সাহেবের ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মেছে যে তাঁর স্ত্রী অতিশয় পতিপ্রাণা এবং বিবেচিকা। কিন্তু যেই বৈঠকখানায় আড্ডা জমা শুরু হল, আর মীর সায়েবও আর ঘর ছেড়ে নড়েন না, বেগমের হয়ে গেল মহা মুশকিল। তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ব্যাহত হল। এখন সারাদিন কেবল সদর দরজায় উঁকি দেওয়া।

ওদিকে চাকরবাকরদের ভেতরেও কানাকানি চলে। এ যাবৎ দিনভর পড়ে পড়ে মাছি তাড়ানো আর হাইতোলা হয়েছে। বাড়িতে কে আসছে, কে যাচ্ছে, কে কার কড়ি ধারে। এখন অষ্টপ্রহর চরকিঘুরণ। এই পান আন রে, এই মেঠাই আন রে, এই তামাক সাজ রে। বিরহীর কলজের মতন গড়গড়ার আগুন জ্বলছে তো জ্বলছেই। তারা গিয়ে গিয়ে বেগমকে দরবার করে, হুজুর

মিঁয়া সাহেবের শতরঞ্জ তো আমাদের জান পয়মাল করে ছাড়বে। দিনভর ছুটোছুটি করতে করতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। উদয়ে বসা আর অস্তে ওঠা— একে কি খেলা বলে ! হ্যাঁ, এক-আধ ঘড়ি সময় কাটানোর জন্যে খেলেন, সে আলাদা কথা। মরুক গে। আমাদের কিছু যায় আসে না, হুজুরের গোলাম, যা হুকুম হবে, তাতেই হাজির থাকব। তবে কী জানেন। এ বড়ো হতভাগা খেলা। এ খেলা যে ধরেছে, তার আর মঙ্গল নেই। গেরস্তের কিছু-না-কিছু আপদবালাই হবেই। শুধু কি নিজের বাড়ি, পাড়াকে পাড়া উচ্ছন্ন গেছে হুজুর, এমনও দেখা যায়। সারা মহল্লার লোক ঐ কথা নিয়ে প্যাচাল পাড়ে। হুজুরের নিমক খাই। মনিবের নিন্দে-মন্দ শুনলে বড়ো কষ্ট হয়। কী আর করব ?— শুনে বেগমসাহেব বলেন— আমি তো নিজেও চু'চক্ষে দেখতে পারি না। কিন্তু উনি তো কারুর কথা শোনেন না, কী করা যায়।

পাড়ায় যে দু-চারজন পুরোনো আমলের লোক আছেন, তাঁরাও বলাবলি করতে থাকেন— নাঃ আর অমঙ্গল ঠেকানো গেল না। নানারকম অশুভ চিন্তা আসে তাঁদের মাথায়। 'সমাজের মাথা যারা তাদেরই যখন এইরকম চালচলন, তখন দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই দাবা খেলে খেলেই এরা রাজত্ব গোল্লায় দেবে।'

রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রজাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। দিনেদুপুরে লুঠ হচ্ছে। কে কার নালিশ ফরিয়াদ শোনে। পল্লী অঞ্চলের সব সম্পদ রাজধানীতে এসে জড়ো হচ্ছে। তাই দিয়ে বেশ্যাবাড়ি, শুঁড়িখানা, আর রঙবেরঙের বেলেল্লাপনার আড্ডায় বেদম ফুর্তি ওড়ানো হচ্ছে। ইংরেজ কোম্পানির কাছে ঋণের মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। কম্বল ভিজছে, আর ভারী হচ্ছে। দেশে আদায়-তশীলের বন্দোবস্ত ভালো না থাকায় বছরের খাজনা উসুল হয় না। রেসিডেন্ট বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে লোকে বিলাসব্যসনে চুর হয়ে আছে; নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। কে কার কথায় কান পাতে।

এদিকে বেশ ক' মাস গড়িয়ে গেছে। মীর সাহেবের বৈঠক-

খানায় দাবার আড্ডা দিব্যি জমে উঠেছে। নিত্যি নতুন চাল, রকম রকম সমস্যা তার অভিনব সমাধান ; নিত্যি নতুন দুর্গ নির্মাণ, ব্যূহরচনা, অবরোধ গড়ছে-ভাঙছে। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে তুমুল কলহ বেধে উঠছে। আবার মিটমাট হয়ে যাচ্ছে। কোনো-দিন হয়তো আর খেলাই হল না। ছক তুলে রাখা হল। মিরজা রাগ করে বাড়ি চলে গেলেন। মীর সাহেব অন্দরমহলে। আবার সারারাত্রির নিশ্চিন্ত নিদ্রার সঙ্গে মনোমালিন্য উবে গেল। সকাল হতে না হতেই দুই স্যাঙাত বৈঠকখানায় হাজির।

এমনি একদিন দুজনে বসে বসে দাবার চোরাবালিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এমন সময়ে বাদশাহী ফৌজের এক ঘোড়সওয়ার অফিসার এসে হাজির। মীর সাহেবকে খুঁজছে। মীর সাহেবের আক্কেল গুড়ুম। এ আপদ কোত্থেকে জুটল। কিসের এত্তেলা রে বাবা!

চাকরদের ডেকে বলে— বলে দে বাড়ি নেই।

ঘোড়সওয়ার— বাড়ি নেই, তো কোথায় গেছে?

চাকর— তা আমি জানি না। কী দরকার?

'কী দরকার তা তোকে কী বলব। তলব পড়েছে হুজুরে হাজির হতে হবে। ফৌজে সেপাই দরকার। জায়গীরদার হয়ে বসে আছে। ইয়ার্কি নাকি। মোরচায় গিয়ে লড়াই করতে হবে, তখন বুঝবে বাছা কত ধানে কত চাল।'

চাকর বলে— আচ্ছা যান, বলে দেব।

ঘোড়সওয়ার— বলে দেবার ব্যাপার নয় এ-সব। আমি কাল ফের আসব। সঙ্গে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।

সরকারী লোক চলে গেল। মীর সাহেবের নাড়ী ছাড়ছাড়। মিরজাকে বলেন— দোস্ত, এখন কী হবে।

মিরজা— তাই তো। ঝামেলার কথা। আপনাকে যখন খুঁজছে, তখন আমারও ডাক এল বলে।

মীর— নচ্ছারটা কাল আবার আসবে বলে গেছে।

মিরজা— আপদ একেই বলে। লড়াইয়ে যেতে হলে জানটা বেঘোরে যাবে।

মীর— ভেবে দেখলুম একটাই উপায় আছে। বাড়িতে এসে ফিরে যাক। দেখাই করব না। চলুন কাল থেকে গোমতীর ওপারে কোথাও বালির চড়ায় বসে আসর জমানো যাক। সেখানে কে আমাদের খোঁজ পাবে। আসুক না। ডেকে ডেকে ফিরে যাক।

মিরজা— বলিহারি। বেড়ে চালটি বার করেছেন। এ ছাড়া আর রাস্তা নেই।

ওদিকে অন্দরমহলে মীর সাহেবের বেগম সেই ঘোড়সওয়ারের কানে কানে বলছে— খুব বুদ্ধি বার করেছ যা হোক।

জবাবে সে বলছে— ওরকম গোমুখ্যুদের তো তুড়িমেরে নাচাতে পারি। ওদের কি আর আক্কেল-বিবেচনা, বলভরসা কিছু বাকি আছে। সব গিয়ে ঢুকেছে দাবার ছকে। দেখো কাল থেকে ভুলেও আর বাড়িতে পা রাখবে না।

তিন

পরের দিন থেকে দুই বন্ধুতে অন্ধকার থাকতে বাড়ি থেকে বেরোয়। বগলে পাটকরা সতরঞ্চি, ডিবেয় ভরা পান, গোমতীর ওপারে এক মান্ধাতার আমলের পুরোনো মসজিদ, বোধহয় নবাব আসফউদ্দৌলা বানিয়েছিলেন, সেইখানে দাবার আসর বসে। রাস্তা থেকেই, তামাক টিকে কলকে জোগাড় হয়ে যেত। তারপর পবিত্র মসজিদের স্নিগ্ধ পরিবেশে, সতরঞ্চিটি পেতে, হুঁকোটি হাতে নিয়ে খেলা শুরু হয়ে যায়। ব্যস্, দুনিয়ার সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকে না। কিস্তি, রাজা সামাল, মাৎ, এই জাতীয় দু-চারটে শব্দ ছাড়া আর ওদের মুখে কোনো শব্দ বেরোয় না। যোগীরাও শুনেছি সমাধিতে একাগ্র হয়ে লীন হয়ে যায়— কিন্তু সে কি ততখানি একাগ্রতা। মধ্যাহ্নে ক্ষুধার উদ্রেক হলে দুই বন্ধু কোনো-একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পেটভরে খানা খায়, তার পর ছিলিম-খানেক তামাক চড়িয়ে আবার রণাঙ্গনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো দিন খাওয়ার কথাও খেয়াল থাকে না।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই শোচনীয় হয়ে

পড়েছে। কোম্পানির ফৌজ লখনউয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। শহরে দারুণ উত্তেজনা— হৈ-চৈ, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, ছুটোপাটি পড়ে গেছে। লোকে ছেলে-পুলে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে পালাচ্ছে। কিন্তু এত-সব হাঙ্গামা আমাদের দুই দাবাবীরকে স্পর্শও করে না। তারা এ-সব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। বাড়ি থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেরোয়। গলিপথে হাঁটে। ওদের একমাত্র আশঙ্কা— পথে কোন্‌দিন কোনো সরকারী আমলার সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়, চোখে পড়লেই মুশকিল। ধরে নিয়ে যাবে। জায়গীর থেকে বছরে হাজার হাজার টাকার আয়। সেটা একেবারে বেমালুম ফোকটে হজম করতে চায় আর কি।—

সেদিনও রোজকার মতন দুজনে ভাঙা মসজিদের চত্বরে বসে দাবা খেলছে। আজ মিরজার বাজিটা একটু নরম চলেছে। মীরসাহেব কিস্তির পর কিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় কোম্পানির ফৌজকে আসতে দেখা গেল। গোরা সৈন্যদল। ওরা লখনউ দখল করতে আসছিল। মীর সাহেব বললে— ইংরেজ ফৌজ আসছে। খোদার মনে কী আছে কে জানে।

মিরজা— আসুক, আসুক, কিস্তি বাঁচান। এই কিস্তি—

মীর— একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা দরকার।

মিরজা— আচ্ছা দেখবেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের। আবার কিস্তি।

মীর— সঙ্গে কামানও রয়েছে, বুঝলেন। তা প্রায় পাঁচ হাজার সেপাই হবে। তাগড়া জোয়ান সব। লাল বাঁদরের মতন মুখ। চেহরো দেখলেই ভয় লাগে।

মিরজা— নড়াচড়া করবেন না হুজুর, ও-সব নক্‌শা আর-কাউকে দেখাবেন, এই নিন কিস্তি।

মীর— আপনি তো আচ্ছা লোক মশায়। এদিকে শহরে ডামাডোল লেগে গেছে, আর আপনার এখন কিস্তি দেবার সময় হল। শহর গোরা সেপাইরা ঘিরে ফিললে তখন বাড়ি যাওয়া হবে কেমন করে, সে কথা খেয়াল করেছেন একবার?

মিরজা— যখন বাড়ি যাবার সময় হবে, তখন দেখা যাবে—কিস্তি। ব্যস, এবার রাজা নড়লেই পরের দানে মাত।

ফৌজ পার হয়ে গেল! বেলা দশটা আন্দাজ হবে। আবার পরের দান খেলা চলছে।

মিরজা— আজ খাবার কী ব্যবস্থা হবে?

মীর— আজ তো রোজা, খাবার কী হবে। কেন, খুব খিদে পেয়েছে নাকি আপনার?

মিরজা— না। শহরে কী হচ্ছে কে জানে।

মীর— কিছুই হচ্ছে না, হবে আবার কী। সবাই খেয়েদেয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছে। হুজুর নবাব সাহেবও এতক্ষণে— আরাম-ঘরে আয়েস করছেন।

দুই খেলোয়াড়ে আবার জমিয়ে বসে। তিনটে বাজে। এবার মিরজা সাহেবের দান খারাপ পড়েছে। চারটের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গোরা ফৌজের ফিরে আসার শব্দ পাওয়া গেল। নবাব ওয়াজিদ আলি বন্দী হয়েছেন। গোরা ফৌজ তাঁকে কোনো অজানা জায়গায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। শহরে কোনো হৈ-চৈ বা মারামারি কাটাকাটির লেশমাত্র নেই। এক ফোঁটা রক্তপাত ঘটে নি কোথাও। পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত কোনো স্বাধীন দেশের নৃপতির পরাজয় এবং বন্দীত্ব, এত অনায়াসে, এত অল্পসময়ে, এত নির্বিঘ্নে এবং বিনা রক্তক্ষয়ে সংঘটিত হয় নি। এ শান্তি বা অহিংসা— দেববাঞ্ছিত সাত্ত্বিক অহিংসা নয়। এ এমন এক তামসিক নপুংসকতা যা দেখে বিশ্বের নিকৃষ্টতম কাপুরুষও লজ্জায় মুখ লুকোয়। অযোধ্যার বিশাল ভূখণ্ডের শেষ স্বাধীন নরপতি বন্দী অবস্থায় শত্রুসৈন্যের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন, আর লখনউ নগরী আরাম আর পরিতৃপ্তির নিদ্রায় অবশ হয়ে শুয়ে আছে। একটা দেশ নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় না পৌঁছলে এমন হয় না।

মিরজা বলে— হুজুর নবাব সাহেবকে পাষণ্ডরা কয়েদ করে নিয়ে যাচ্ছে।

মীর— তাই নাকি, তা হবে। এই নিন রাজার চাল।

মিরজা— আহা রাখুন না একটু। এ-সবে এখন মন লাগে না, বুঝলেন। বেচারা নবাব সাহেবের চোখ ফেটে এখন রক্ত পড়ছে।

মীর— তা পড়বারই কথা। এই আরাম আয়েস আর কি বরাতে জুটবে? এই রইল কিস্তি—

মিরজা— দিন কারুর সমান যায় না। আহা, কী বেদনাদায়ক অবস্থা।

মীর— হাঁ, তা আর বলতে— এই যে— আবার কিস্তি। ব্যস, এবারের কিস্তিতে মাত, আর বাঁচবে না।

মিরজা— খোদা কসম, আপনি তো বড়ো হৃদয়হীন মানুষ দেখছি। এতবড়ো একটা সর্বনাশ ঘটে গেল, আপনার পাষাণ প্রাণে এতটুকু আঁচড় লাগল না। আহা, বেচারা ওয়াজিদ আলি শা—

মীর— আগে নিজের বাদশাকে বাঁচান, পরে নবাবের জন্যে শোক করবেন। এই কিস্তি, আর এ-ই মা-ত। হাত বাড়ান।

বৃটিশ ফৌজ বাদশাকে বেঁধে নিয়ে সামনে দিয়ে চলে গেল। তারা চলে যাবার পরেই মিরজা ছক সাজিয়ে ফেলেন। পরাজয়ের আঘাত বড়ো তীব্র হয়ে বাজে। মীর বলেন— আসুন, নবাব সাহেবের শোক উপলক্ষে একটা দুঃখের পদ্য আবৃত্তি করা যাক। কিন্তু মিরজার দিক থেকে সাড়া পান না। খেলায় হার হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজভক্তি উবে গেছে। পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্যে মিরজা এখন অধীর হয়ে উঠেছেন।

চার

সন্ধে হয়ে গেছে। মসজিদের ভাঙা খিলেনে বসে চামচিকেরা তীব্র চীৎকার করতে শুরু করেছে। চড়াই পাখির দল যে যার বাসায় ঢুকে পড়েছে। শুধু নিঃশব্দ গম্ভীর দুই খেলোয়াড় স্থির হয়ে বসে খেলছেন, যেন রক্তপিপাসু দুই যোদ্ধা। মিরজা পরপর তিনটে বাজি হেরেছেন, এ-ক্ষেপেও গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ফি-ক্ষেপে জিতব বলে মনে জোর করে সামলে সুমলে চাল দিচ্ছেন,

কিন্তু প্রত্যেক বারই একটা করে বেয়াড়া চাল এসে প'ড়ে বাজিটাই বরবাদ করে দিচ্ছে। বারবার হার হবার সঙ্গে সঙ্গে জেদ চেপে যাচ্ছে, প্রতিকারের ভাবনা জোরালো হচ্ছে। ওদিকে জনতার উন্মাদনায় মীর সাহেবের গলায় গজলের মুড়কি বেরোচ্ছে। তিনি গুনগুন করছেন, হাতে হাততুড়ি দিচ্ছেন, যেন কোনো গুপ্তধন পেয়ে গেছেন এমনি ভাবখানা। মিরজা সাহেব শুনছেন, উত্ত্যক্ত হচ্ছেন, আবার পরাজয়ের লজ্জা এড়াতে, 'বাঃ বাঃ' করছেন। কিন্তু দান যত বেকায়দা হচ্ছে, ধৈর্য ততই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। একবার একটা চাল দিয়ে, আবার সেটা বদলাচ্ছেন।—

'চাল যা দেবার একবারেই দিন। ও কী, বার বার ঘুঁটিতে হাত দিচ্ছেন কেন। হাত সরিয়ে নিন। চাল আগে ভেবে না নিয়ে ঘুঁটি ছোঁবেন না। এক এক চালে দেখি ঘণ্টা কাবার করছেন। এটা নিয়ম নয়। এক চালে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগলে, মাত বলে ধরে নিতে হবে। ফের চাল বদলাচ্ছেন? চুপচাপ ঘুঁটি রেখে দিন জায়গায়।

মীর সাহেবের মন্ত্রী মারা যায়। বলেন— আমি চালটি দিলুম কখন?

মিরজা— দিয়েছেন। ঘুঁটি ওখানেই রেখে দিন—ঐ ঘরে।

মীর— ও-ঘরে রাখব কেন। আমি মোটে ঘুঁটি ছাড়িই নি হাত থেকে।

মিরজা— আপনি যদি কেয়ামতের দিন অব্দি ঘুঁটি না ছাড়েন, তা বলে কি চাল হবে না। যেই দেখছেন মন্ত্রী মারা যাচ্ছে, অমনি আবোল-তাবোল বকছেন।

মীর— আবোল-তাবোল আপনি বকছেন। হারজিত ভাগ্যের ব্যাপার। আবোল তাবোল বকে কেউ জিততে পারবে না।

মিরজা— তা এ-বাজি তো আপনি মাত হয়ে গেছেন।

মীর— কী করে মাত হলুম?

মিরজা— তা হলে ঘুঁটি যে ঘরে ছিল সে ঘরেই রাখুন।

মীর— কেন রাখব ও-ঘরে। রাখব না।

তর্ক বেড়ে চলে। দুজনেই যে যার কোট আঁকড়ে থাকে। কেউ দমবার বাচ্চা নয়। অবান্তর কথা উঠে পড়ে। মিরজা বলে— বংশে দাবা খেলার চল থাকলে, তবে তো মানুষ নিয়ম-কানুন জানবে। পূর্বপুরুষ ঘাস কেটে এল, আপনি দাবার কী বুঝবেন। খানদানী আভিজাত্য আলাদা জিনিস। জায়গীর পেলেই যদি লোকে রঈস হয়ে যেত, তা হলে তো কথাই ছিল না।

মীর— যতবড়ো মুখ নয় ততবড়ো কথা! দেখুন গে, আপনার বাবাই ঘাস কাটতেন। এ বংশের লোক পুরুষানুক্রমে দাবা খেলে আসছে।

মিরজা— আরে যান যান। নাজিউদ্দিন হায়দারের বাড়ি বাবুর্চির কাজ করে করে জন্ম কাটল, আজ এসেছেন খানদান দেখাতে। বনেদীয়ানা মুখের কথা নয়।

মীর— কেন খামোকা নিজের বাপদাদার মুখে চুনকালি দিচ্ছ চাঁদ— বাবুর্চিগিরি তারাই করত বোঝা যাচ্ছে। এ বংশের সবাই বাদশার দস্তরখানে বসে খানা খেয়ে এসেছে।

মিরজা— আরে যা যাঃ, ছোটোজাতের বড়ো মুখ। বেশি বকবক্ করিস নি, থাম্।

মীর— মুখ সামলে কথা বলুন, নইলে ভালো হবে না। আমি ওরকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নই। চোখ রাঙানি দেখলে এ বংশের লোক চোখ উপড়ে নিতে জানে। ক্ষমতা আছে?

মিরজা— ক্ষমতা পরখ করার ইচ্ছে থাকলে এগিয়ে আসুন। দুহাত হয়ে যাক— এসপার কি ওসপার।

মীর— তা কী ভেবেছ! তোমার তড়পানি দেখে কেউ ভয় পায়?

দুই স্যাঙাত কোমর থেকে তলোয়ার টেনে নেয়। নবাবী আমল। ছোরাছুরি, তলোয়ার হাতিয়ার সবার সঙ্গেই থাকে। বিলাসী হলেও, দুজনের কেউই ক্লীব নয়। রাজনৈতিক চেতনায় অধঃপতন ঘটেছিল— বাদশার জন্যে, সাম্রাজ্যের জন্যে কে মরতে যায়। তা বলে ব্যক্তিগত বীরত্বের অভাব হয় নি। দুজনে পাঁয়তাড়া করে, তলোয়ার ঝলকাতে থাকে, ছপাছপ আওয়াজ হতে থাকে।

দুজনের কেউই অক্ষত থাকে না। জখম হয়ে দুজনেই পড়ে যায়। তারপর ছটফট করে। তারপর একসময় দুজনেই পড়ে মরে থাকে। দেশের বাদশার জন্যে একফোঁটা চোখের জল ফেলার অবকাশ হয় নি যাদের, দাবার মন্ত্রী বাঁচাতে গিয়ে তারা প্রাণ দিতে দ্বিধা করল না।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। দাবার ছকটা এখনো পাতা রয়েছে। দু পক্ষের রাজা যে যার সিংহাসনে বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে দুই বীর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিয়োগে শোকাশ্রু পাত করছে।

চারিদিক নৈঃশব্দ্যে ঢাকা। ভাঙা দালানের পোড়ো দেয়াল, নিঃসঙ্গ থাম আর ধূলিধূসর মিনারের চুড়োটা মনে হয় যেন হাওয়ায় দুলছে। দুটো শবদেহকে ঘিরে বিষাদে মাথা কুটছে।

চক্রবৃদ্ধি

কোনো গ্রামে শংকর নামে এক কুরমী কিষাণ ছিল। সাদা-সিধে গরিব মানুষ, নিজের কাজ নিয়ে থাকে। কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কোনো ঘোরপ্যাঁচ জানে না, ছলকাপট্যের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কাউকে ঠকাবার বিদ্যেও জানা ছিল না তার, না ছিল ঠকবার ভয়। জুটল খেল, না জুটল চিঁড়ে মুড়ি চিবিয়ে কাটিয়ে দিলে। তাও না জোটে ঢক ঢক করে জল খেয়ে রাম-নাম করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কখনো সখনো দোরে অতিথি এলে তখন তাকে এই নিবৃত্তি মার্গ ত্যাগ করতে হত। বিশেষ করে কোনো সাধুমহাত্মার পদার্পণ হলে তো কথাই নেই। তখন ওকে অগত্যা ঘোর বিষয়বুদ্ধির শরণ নিতে হত। নিজে খালি পেটে শুয়ে থাকতে পারে, তা বলে সাধুকে তো আর উপোস করিয়ে রাখতে পারে না, ভগবানের ভক্তকে কি শুকিয়ে রাখা যায়!

একদিন এক সন্ধের সময় এক সন্ন্যাসী তার দরোজায় এসে দাঁড়ালেন। তেজস্বী মূর্তি, পীতাম্বরধারী, শিরে জটাভার, হাতে পেতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম, চোখে চশমা— বেশ-ভূষায় অবিকল সেই মহাপুরুষদের মতন চেহারা, যাঁরা বনেদী বড়োলোকদের প্রাসাদে তপস্যা-টপস্যা করেন, আর হাওয়া গাড়িতে চড়ে দেবস্থান পরিক্রমা, তথা যোগসিদ্ধির অনুকূল রুচিকর ভোজ্যপেয়ের সেবা করে থাকেন। ঘরে ছিল খানিকটা যবের আটা, তা দিয়ে তাঁর সেবা চলে না। পুরাকালে যবের মাহাত্ম্য যাই থাকুক-না-কেন, বর্তমান যুগে সিদ্ধপুরুষদের পক্ষে যবের আহার দুষ্পাচ্য বলে বিবেচিত। শংকর চিন্তায় পড়ে গেল, মহাপুরুষকে কী খাওয়াই? ঠিক করল গাঁয়ের কারুর কাছ থেকে গমের আটা ধার করে আনবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, সারা গাঁয়ে কারুর ঘরে গমের আটা পাওয়া গেল না। গ্রামে কেবল মানুষই বাস করে, দেবতা বলতে কেউ নেই,

দেবভোজ্য পদার্থ কোথায় পাবে। শেষ পর্যন্ত গ্রামের বিপ্র মহারাজের ঘরে কিছুটা গমের সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকেই সওয়া সের গম ধার করে এনে বউকে বলল— আটা পেষো। মহাপুরুষ ভোজনান্তে টান টান হয়ে শয়ন করলেন। প্রাতঃকালে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

বিপ্র মহারাজ বছরে দুবার করে গ্রামের খামার থেকে সিধে আদায় করেন। শংকর মনে মনে ভাবল সওয়া সের গম আর ব্রাহ্মণ মানুষকে কী বলে ফেরত দিতে যাব। তার চেয়ে সিধে দেবার সময়ে বরাবরের পাওনা পাঁচ সেরের বদলে এবার ঠাকুর মশায়কে কিছু বেশি করেই সিধে দেবে, তিনিও বুঝবেন, আমারও শোধ হয়ে যাবে। চোতমাসে বামুন ঠাকুর সিধে আদায়ে বেরোলে, শংকর তাঁকে নিয়মিত পাঁচ সেরের ওপর আরো সের আড়াই গম সিধে দিয়ে দিল। ঋণমুক্ত হয়েছে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত রইল। বিপ্র মহারাজও এ ব্যাপারে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। শংকর সরল চাষাভুষো মানুষ। ওই ধারের সওয়া সের গম শোধ করতে তাকে আবার জন্মাতে হবে— এ তার ধারণা ছিল না।

দুই

এই ঘটনার পর সাত বছর কেটে গেছে। ঠাকুরমশায় এখন বিপ্রমহারাজ থেকে মহাজন পদে উন্নীত হয়েছেন। আর শংকর চাষী তখন ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে। তার ছোটো ভাই মঙ্গল আলাদা হয়ে গেছে। যখন একসঙ্গে ছিল তখন দুজনেই কিষাণ ছিল, এখন ভাগাভাগি হয়ে মজুর হয়ে গেছে। শংকর চেয়েছিল যেন হিংসে রেষারেষি বাড়তে না পায়, কিন্তু অবস্থাগতিকে ওকে হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। যেদিন প্রথম ওদের ঘরে আলাদা হাঁড়ি হল, শংকর সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল— যে, আজ থেকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই শত্তুরের মতন চলবে, একজনের কান্না দেখে অন্যজনের হাসি পাবে, এর সর্বনাশ হলে ওর ঘরে পোষ মাসের পার্বণ হবে,

ভালবাসার বন্ধন, নাড়ীর টান, রক্তের টান— সব ঘুচে যাবে। ভগীরথের মতন একদিন ও বংশমর্যাদার গাছ পুঁতেছিল, বিন্দু বিন্দু রক্ত ছেঁচে গাছটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আজ তার শেকড়-সুদ্ধু উপড়ে ফেলা হচ্ছে দেখে ও স্থির থাকতে পারে নি। ওর বুকের পাঁজর ভেঙে গিয়েছিল। সাতদিন পর্যন্ত দাঁতে কুটো কাটতে পারেনি। জষ্টি মাসের রোদে দিনভর কাজ করত আর রাত্তিরে দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকত। এই রকম করে করে অসুখে পড়ে গেল। দারুণ মর্মদাহ ওকে ভেতরে ভেতরে কাবু করে ফেলেছিল। রোগে পড়ে ক'মাস শয্যাশায়ী ছিল। বিছানা থেকে উঠেই চিন্তা হল— এখন কী হবে? সংসার চলবে কেমন করে!

পাঁচ বিঘে ক্ষেতের আদ্ধেক ভাগ, একটা বলদ, এতে ক্ষেতী হয় না ছাই হয়। শেষ পর্যন্ত নাম কা ওয়াস্তে, ইজ্জত রক্ষার মতন ক্ষেত রইল; দিন মজুরী দিয়ে সংসার চলল।

এমনি করে সাতবছর কেটে গেছে। মজুরের কাজ সেরে একদিন শংকর বাড়ি ফিরছে, পথে বামুনঠাকুর তাকে আটকালেন— হ্যাঁরে শংকর, বলি কাল এসে একবার তোর দেনাপাওনার হিসেবটা কর। তোর কাছে সাড়ে পাঁচ মন গমের পাওনাটা কদ্দিন ধরে বাকি পড়ে আছে, দেবার নামও করিস না, কী ব্যাপার বল্ দিকি, হজম করে ফেলার ইচ্ছে আছে?

শংকর আকাশ থেকে পড়ে। বলে—আমি আবার তোমার কাছে কবে গম নিলুম, যে সাড়ে পাঁচ মনের হিসেব? তুমি ভুল করছ ঠাকুর, আমার কাছে কারুর একছটাক ফসল কি একটা পয়সা ধার বাকি নেই।

বামুন— এইরকম মতিগতির জন্যেই দুর্ভোগ ভুগছিস বাবা, ঘরে খাবার জোটে না।

এই বলে বামুনঠাকুর সেই সওয়া সের গমের কথা তুললেন। শংকর অবাক! হে ঈশ্বর! আমি বছর বছর ওই লোকটাকে "খলিহানী"* দিয়ে গেছি, অথচ ও আমার কোন্ উপকারে লেগেছে।

* খামার-সিধে

পাঁজি পুঁথি পড়াতে, কি তিথি বিচার করাতে যখনই গেছি, কিছু-না-কিছু দক্ষিণা হাতে করেই গেছি। আর আজ বলে কিনা, পাওনা আছে? স্বার্থপর! সেই কবেকার সওয়া সের গম নিয়ে ডিমের মতন তা দিয়ে এসেছে, এমন পিশাচ। তা এতদিনের মধ্যে একবার যদি মুখ ফুটে বলে আমি কবেই গম ওজন করে দিয়ে দিই। ও তা হলে এই মতলব নিয়েই চুপ করে বসেছিল। বলল—

মহারাজ, সওয়া সের গম নাম ক'রে শোধ করছি ব'লে শোধ হয়তো দিই নি, কিন্তু কতবার খলিহানীর সঙ্গে সের-সের দু-দুসের গম দিয়েছি, সেটা কিছু নয়! আর আজ একেবারে সাড়ে পাঁচ মন ফসল চাইলে আমি কোত্থেকে দেব, পাব কোথায়? *

বামুন— যে বিষয়ের কথা হচ্ছে সেই বিষয়ে বলো। তুমি কত সিধে দিয়েছ না দিয়েছ তার তো আর হিসেব লেখা নেই, বেশি দিয়ে থাক দিয়েছ, কম দিয়ে থাক দিয়েছ। তোমার নামে খাতায় সাড়ে পাঁচ মনের হিসেব লেখা রয়েছে, যাকে দিয়ে খুশি হিসেব মিলিয়ে নাও না। উসুল করে দাও তো তোমার নামে ঢেঁড়া দিয়ে দোব, নইলে আরো বাড়বে।

শংকর— পাঁড়ে, কেন অযথা গরিব মানুষকে দুঃখ দিচ্ছ। আমার খাবার ঠিকানা নাই, অত গম আমি কোথা থেকে আনব।

বামুন—সে তুমি যেখান থেকে পার আনোগে, আমার দেখার দরকার নেই। আমি আমার হকের পাওনা এক ছটাকও ছাড়ব না। এখানে না দাও, ভগবানের কাছে হিসেব দেবে।

শংকর কেঁপে উঠল। সে মুখ্যু চাষা মজুর মানুষ। আমাদের মতন লেখাপড়া জানা লোক হলে বলত, সেই ভালো কথা, ভগবানের কাছে হিসেব নিকেশ করা যাবে।

সেখানকার বাটখারা তো আর এখানকার চেয়ে বড়ো কিছু নয়। অন্তত তেমন প্রমাণ আমাদের হাতে যখন নেই, তখন চিন্তা কিসের। কিন্তু শংকরের মতো মানুষের কাছে এমন যুক্তিচাতুর্য বা ব্যবহারকুশলতা আশা করা যায় না। একে তো ঋণ—তায় আবার ব্রাহ্মণের ঋণ— খাতায় নামের পাশে হিসেব লেখা রয়েছে,

সোজা নরকে টেনে নিয়ে যাবে—এই চিন্তাতেই ওর মাথা ঘুরে গেছে। বললে— ভগবানের কাছে কেন মহারাজ, তোমার পাওনা তোমাকেই শোধ দোব। এ-জন্মে তো ভুগেই মরছি, আবার পর-কালের পথেও কাঁটা পড়বে। দিয়ে দোব। তবে যাই বল, এটা কিন্তু ন্যায় হল না। ব্রাহ্মণ হয়ে তোমার এমন তিলকে তাল করা উচিত হয় নি। তখনই না-হয় তাগাদা দিয়ে আদায় করে নিতে। তা হলে আমার মাথায় আজ আর এতবড়ো বোঝা চাপে না। আমি তো শোধ দিয়েই দোব। তোমাকে তা বলে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

বামুনঠাকুর বললে— সেখানকার ভয় তোমার থাকবে। আমার কিসের ভয়। সেখানে তো সব আমার বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিকুটুম্বের দল। ঋষিমুনি সবাই ব্রাহ্মণ, দেবতারাও ব্রাহ্মণ, ভুলচুক কিছু হলে তারাই সামলে নেবে। তা যাক, কবে দিচ্ছ ?

শংকর বললে— আমার ঘরে তো মজুত নেই। চেয়েচিন্তে জোগাড় করে তবে তো দেব।

মহারাজ— আমি ও-কথা শুনব না। সাতবছর হয়ে গেছে, এখন আর একদিনও টালবাহনা করা চলবে না। গম দিতে না পারো তো খৎ লিখে দাও।

শংকর— আমার দেওয়া নিয়ে কথা, সে গমই নাও, আর খৎ লেখাও, দাম কী হিসাবে ধরবে।

মহারাজ— বাজারদর পাঁচসের করে, তোমাকে না-হয় সওয়া পাঁচসেরের দরে করে দোব।

শংকর বললে— দিচ্ছি যখন তখন বাজারদরেই দোব, খামোকা পোওয়াখানেক কম করতে গিয়ে নিমিত্তের ভাগী হই কেন ?

হিসেবনিকেশ হলে দেখা গেল গমের দাম ষাট টাকা। ষাট টাকার ওপর শতকরা তিন টাকা হিসাবে সুদ। এক বছর অনাদায়ে সুদের হার বেড়ে সাড়ে তিন টাকা হচ্ছে, বারো আনার স্ট্যাম্প লাগল, দস্তাবেজ লেখার খরচা একটাকাও শংকরের গাঁট থেকে দিতে হল।

গ্রামের লোক বামুনঠাকুরকে ছি ছি করল, তবে মুখের ওপর নয়। মহাজনের দোরে সকলকেই হাত পাততে হয়। তাকে চটাতে কে সাহস করবে।

তিন

শংকর বছরভর কঠিন তপস্যা করল। মেয়াদ পুরো হবার আগেই টাকা শোধ করে দেবার সংকল্প নিল। দুপুরে হাঁড়িচড়া তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ছাতুছোলা চিবিয়ে কাটত, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বাচ্চাগুলোর জন্যে দুখানা করে রাত্তিরের বাসি রুটি ধরা থাকত। দিনে খালি এক পয়সার তামাক লাগত। ঐ একটাই ব্যসন, হাজার কষ্টে পড়েও অভ্যেস ছাড়তে পারেন নি। এবারে ব্রত নিয়ে সে বিলাসও ঘুচে গেল। হুঁকো কলকে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল, তামাকের হাঁড়ি ফেলে দিলে। পরনের কাপড় আগেই প্রায় ত্যাগ হয়ে গিয়েছিল, এবার কোপনি নিয়ে লজ্জাটুকু বাঁচাবার ব্যবস্থা করলে। হাড়-কাঁপানো শীতের রাত আগুন পুইয়েই কাটিয়ে দিলে। এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলও হল আশাতীত। বছরের শেষে হাতে পুরো ষাট টাকা জমা হল। ভাবল টাকাটা নিয়ে মহারাজের হাতে দিয়ে বলব— মহারাজ, বাকি টাকাও শিগ্‌গিরই আপনার হাতে তুলে দেব। আর তো পনেরোটা টাকার মামলা, পণ্ডিতজী কি আর অরাজী হবেন? শংকর টাকা হাতে করে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতজীর চরণকমলে নিবেদন করলে, পণ্ডিতজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন— কারু কাছে ধার করলে নাকি?

শংকর বললে— না মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে এবার মজুরীর রোজগার ভালোই হয়েছিল।

মহারাজ টাকা গুনে বললেন— এ তো মোটে ষাট টাকা।

শংকর— হ্যাঁ, এখন এই রাখুন। বাকি টাকাও দু-তিন মাসের মধ্যেই দিয়ে দেব। আমাকে ঋণমুক্ত করে দিন।

বিপ্র বললেন— আমার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়ে

ঋণমুক্ত হও, তার আগে নয়। যাও, বাকি পনেরো টাকা নিয়ে এসো গে।

শংকর বললে— মহারাজ এটুকু দয়া করো। এখন আর-এক সাঁঝের জোটানো মুশকিল। গাঁয়ে যখন রয়েছি, টাকা দিয়ে দেবই, ফেলে রাখব না।

ঠাকুরমশায় জবাবে বললেন— দেখ, রোগ পুষে রাখা আমার স্বভাব নয়। বেশি কথা বলিয়ো না। আমার টাকা না পেলে আজ থেকে সাড়ে তিনটাকার হিসেবে সুদ লাগাব। তোমার টাকা ইচ্ছে হয় এখানে রাখো, ইচ্ছে হয় বাড়ি নিয়ে যাও।

শংকর বললে— আচ্ছা যা এনেছি সেটা তো রাখুন। আমি দেখি যদি কোথাও পনেরো টাকার জোগাড় করতে পারি।

শংকর সারা গ্রাম চষে ফেলল, কিন্তু কেউ টাকা দিল না। কারুর হাতে টাকা ছিল না এমন নয়, শংকরকে বিশ্বাস করে না বলে দিল না, তাও নয়। আসলে পণ্ডিত মহাজনের মুখের শিকার নষ্ট করার সাহস হল না কারুর।

চার

ক্রিয়া থাকলেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে, এ তো প্রাকৃতিক নিয়ম। তপস্যার বর্ষভোগ শেষ হতেও যখন ঋণমুক্তির কোনো সুরাহা হল না, তখন শংকরের সমস্ত সংযমের বাঁধ নৈরাশ্যের প্রবল স্রোতে ভেঙে পড়ল। সে ভেবে দেখল, এত কষ্ট করেও যখন বছরে ষাট টাকার বেশি জমা করা গেল না, তখন এর ডবল টাকা জমাবার আর কি উপায় আছে? আর সেই যদি ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই চলতে হয় তো যাহা এক মন তাহা সওয়া মন। তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল, মেহনতে অরুচি ধরল। আশাই উৎসাহ জোগায়; আশাই জীবনের শক্তি আর সাহসের উৎস। সমস্ত সংসার আশা নিয়েই চলছে। আশাহত শংকর এখন সব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ল। প্রয়োজনকে এতদিন পাত্তা দেয় নি, দূরে

সরিয়ে রেখেছে। এখন আর প্রয়োজন বাগ মানছে না, দ্বারে অন্নপ্রার্থী ভিখারিনীর বেশ ছেড়ে সে এখন পিশাচী সেজে বুকের ওপর নৃত্য করছে। কাপড়ে তালিমারারও একটা সীমা আছে। কাজেই শংকর এখন টাকা হাতে এলে আর আগের মতন জমা করে না, হয় কাপড়ে নয় খাবারে খরচ করে। আগে তামাক খেত, এখন আর গাঁজা চরস ছাড়া চলে না। ওর আর এখন কর্জ শোধ করার চিন্তা নেই। এমন বেপরোয়া হয়ে চলে, যেন ওর কোথাও কানাকড়ির ধারবাকি নেই। আগে শতবাধাবিঘ্ন এলেও কাজে যেতে সে আলসেমি করত না। এখন কাজে না যাবার অছিলা। খোঁজে।

এমনি করে তিন বছর গেল। মহাজন আর একবারও তাগাদা করে নি। সে বড়ো চতুর শিকারী, অব্যর্থ নিশানায় লক্ষ্য ভেদ করতে চায়। আগে থেকে শিকারীকে চমকে দেওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ।

পণ্ডিত একদিন শংকরকে ডেকে হিসেব দেখাল। জমার ষাট টাকা বাদ দিয়েও শংকরের কাছে একশো কুড়ি টাকা পাওনা।

শংকর বললে— এত টাকা যখন তখন ও জন্মেই নিয়ো, এ জন্মে আর হবে না।

বামুন বললে— আমি এ জন্মেই নেব। আসল না দিস, সুদ তো দিতেই হবে।

শংকর— একটা বলদ আছে ওটাই নাও, আর একটা চালাঘর আছে সেটাও নিতে পারো, আর আমার কিছুই নেই।

বামুন— গোরু বলদ নিয়ে আমি কী করব। তবে দেবার ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছুই দেবার আছে।

শংকর— আর কী আছে পাঁড়েজী ?

বামুন বলে— আর কিছু না থাক্ তুমি নিজে তো রয়েছ। আর তোমাকে তো সেই কোথাও না কোথাও মজুর খেটে খেতেই হয়, আর আমাকেও চাষের জন্যে মুনিষ ডাকতে হয়। সুদের টাকাটা গায়ে খেটে উসুল দাও, পরে সুবিধে মতন আসলটা দিয়ে দিয়ো।

হিসেব মতন তুমি আমার টাকা না চুকিয়ে আর কোথাও খাটতে যেতে পারবে না। তোমার তো সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই। আমার এতগুলো টাকা আমি কোন্ ভরসায় ছেড়ে রাখব। তুমি যে মাসে মাসে মাসে সুদ দেবে, তার জামিন কে দিচ্ছে বলো। আর তুমি যখন রোজগার করেও মাসের সুদটা দিতে পারছ না, তখন আসলের তো কথাই ছেড়ে দাও।

শংকর— হ্যাঁ ঠাকুর, গতরে খেটে সুদের টাকা শুধব, তো খাব কী?

মহাজন বললে— কেন, তোমার বউ-ছেলে কী করে? হাত-পা জগন্নাথকে সঁপেছে? তা আমি তোমায় রোজ আধসের করে যব দেবখ'ন। আর বছরে একটা কম্বল, একটা ফতুয়া পাবে। আর কী চাই। হ্যাঁ পাবে না কেন, অন্য জায়গায় ছ আনা রোজের কাজ পাবে। তা দেখো, আমার তেমন গরজ নেই। আমি তো তোমাকে বকেয়া মেটাবার জন্যে রাখতে চাইছি।

শংকর খানিকক্ষণ গভীর চিন্তা করার পর বলল— মহারাজ, এ তো তা হলে জন্মের মতন গোলামির কথা হল। কী বল।

মহারাজ বললে— সে তুমি গোলামিই বল, আর মজুরীই বল। আমার টাকা না চোকানো অব্দি আমি তোমায় ছাড়ব না। তুমি ভেগে গেলে তোমার ছেলে শোধ করবে। হ্যাঁ, যখন কেউ থাকবে না তখনকার কথা আলাদা।

এর ওপর আপীল চলে না। মজুরের আবার জামিন দাঁড়াবে কে। পালিয়েই বা যাবে কোথায়। পরের দিন থেকে শংকর পণ্ডিতের ক্ষেতের কাজে বহাল হয়ে গেল। সওয়া সের গম নিয়েছিল, তাই শোধ করতে ক্রীতদাসত্বের বেড়ি পরতে হল। হতভাগাটা এখন একটা কথা ভেবেই মনে শান্তি পায়—এ আমার পূর্বজন্মের কর্মফল। স্ত্রীকে এমন সব কাজ করতে হয় আজকাল, যা জীবনে করে নি। ছেলেপুলের খাওয়া জোটে না আদ্ধেকদিন। শংকর শুধু চুপচাপ দেখে যায়, তার আর-কিছু করবার উপায় নেই। ঋণ করা গমের প্রত্যেক দানাটি বিধাতার অভিশাপ হয়ে ওর মাথায় চেপে রয়েছে।

পাঁচ

মহাজনের ঘরে একটানা বিশ বছর গোলামি করার পর শংকর মহাপ্রয়াণে গেল। তখনো তার মাথায় একশো কুড়ি টাকার অনাদায়ী কর্জের বোঝা। পণ্ডিতের দয়ার শরীর, বেচারাকে ভগবানের দরবারে কষ্ট দিতে চাইল না, তার বদলে তার সোমত্ত ছেলের ঘাড়ে চাপল। সে এখনো পণ্ডিতের ক্ষেতে মজুরী করছে, তার উদ্ধার আবার কবে হবে, আদৌ হবে কিনা ভগবানই জানেন।

আপনারা যদি মনে করেন এটা মনগড়া গল্প, তা হলে ভুল করবেন। এ নিছক সত্যি ঘটনা। পৃথিবীতে শংকরের দলের অভাব নেই, অভাব নেই মহাজনদেরও।

যুদ্ধযাত্রা

আজ সকাল থেকেই গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। খোড়ো চালের ভাঙা কুঁড়েও হাসছে। আজ সত্যাগ্রহীদের শোভাযাত্রা এই গাঁয়ে আসছে। কোদঈ চৌধুরীর উঠোনে চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। আটা, ঘি, শাকসব্জী, দুধদই জমা করা হচ্ছে। সকলের মুখেই হাসি, উৎসাহ, আনন্দের ছাপ। ঐ যে বিন্দা আহীর, গাঁয়ে হাকিম সায়েবদের আগমন হলে ওর কাছে একপো দুধ চাইলে পাওয়া যায় না, গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায়, আজ ওর বউয়ের কাছ থেকে দুকলসি দুধ আর দই চেয়ে নিয়ে নিজে মাথায় করে বয়ে এনেছে। কুমোর, অফিসার এলে ঘর ছেড়ে পালায়, আজ মাটির বাসনের পাহাড় নিয়ে এসেছে। গ্রামের নাপিত-কাহার সবাই আজ নিজের থেকে ছুটে এসেছে। সবাই খুশি। দুঃখ কেবল একজনের— সে নোহরী বুড়ি। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে, সে তার পঁচাত্তর বছরের কুতকুতে স্থবির দুটো চোখ মেলে আজকের সমারোহ দেখছে, আর আপসোস করছে। তার আজ এমন কিছু নেই যে হাতে করে কোদঈয়ের দরজায় দাঁড়াবে, বলবে— এই এনেছি। সে এখন নিজেই পরের মুখাপেক্ষী।

নোহরীর কিন্তু এমন দিন ছিল না। একদিন তার ধন, জন সবই ছিল। গাঁয়ে সেদিন তারই প্রতাপ। কোদঈকে সে সব সময়ে দাবিয়েই রাখত। মেয়েছেলে হয়েও ও বেটাছেলের কান কাটত। ওর বর ঘরে শুয়ে থাকত, ও ক্ষেতে শুতে যেত। মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির তদারক নিজেই করত। লেনদেনের ব্যাপার সবই ছিল ওর হাতের মুঠোয়। কিন্তু বিধাতা ওর সে-দিন কেড়ে নিয়েছেন। এখন আর ওর জন্যে কাঁদবার কেউ নেই। এখন চোখে ভাল্কো দেখে না, কানে শুনতে পায় না, নড়ে বসতেও কষ্ট

হয়। নোহরী কোনোমতে দিনগত পাপক্ষয় করছে, আর ওদিকে কোদঈয়ের ভাগ্য দিনদিনই প্রসন্ন হচ্ছে। আজকাল চারদিকে কেবল কোঁদঈয়েরই নাম ডাক, সবাই তাকে মানে, সব জায়গায় তার যাতায়াত। আজকের সম্মেলনও হচ্ছে কোদঈয়ের বাড়ি। নোহরীকে আর এখন কে পোছে? এই-সব কথা ভেবে নোহরী বুড়ির মনে বিশ মন পাথরের ভার। হায় ভগবান, আজ যদি পঙ্গু করে না দিতে, তা হলে নিজের ঘরটা লেপা-মোছা করত, দরজায় বাজনা বসাত, কড়া-চড়াত, পুরী ভাজত, তারপর সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হলে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি করে দক্ষিণা দিত।

আজ ওর সেইদিনকার কথা মনে পড়ে যেদিন বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে এখান থেকে বিশ ক্রোশ পথ গিয়ে মহাত্মাজীকে দর্শন করতে গিয়েছিল। সেকি উৎসাহ, কী শ্রদ্ধা, কী সাত্বিক ভক্তিভাব। সেদিনের চিন্তা আজ ওর মনের আকাশকে মেদুর করে তোলে।

কোদঈ এসে ফোকলা মুখে বলল— ও ভাবী, আজ মহাত্মাজীর দল আসছে। তুমি কিছু দেবে নাকি?

নোহরী চৌধুরীর দিকে এমন রোষভরে তাকাল যেন ভস্ম করে দেবে। দেখ, লক্ষ্মীছাড়া জ্বালাতে এসেছে। আমায় ছোটো করতে এসেছে। বেশ উঁচু গলায় বললে— আমার যা দেবার তা তাদেরই দেব। তোমায় বলব কেন?

কোদঈ মুচকে হাসে— আমি কাউকে বলব না, সত্যি বলছি বউদি, বার কর না তোমার পুরনো হাঁড়িটা। আর কার জন্যে আংড়ে রাখছ? এদিকে এখনো কেউ কিছু দেয় নি। গাঁয়ের ইজ্জত থাকে কী করে, বলো তো।

নোহরী তার দৈন্যকে কঠোরতার ধর্ম পরাল, বললে— আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ ঠাকুরপো। ভগবান আমার দিন কেড়ে নিয়েছেন। দেবার ক্ষমতা যদি থাকত, তোমার বলার অপেক্ষায় থাকতুম না। একদিন এই ঘরেই সাধুসন্ত, যোগীমুনি, হাকিম আমলা সায়েবসুবো সবাই এসে গেছে। কী করব বলো,

দিন তো বরাবর একরকম থাকে না।

শুনে কোদঈ লজ্জিত হল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বললে— ভাবী তুমি ঠাট্টা বোঝ না? আমি বলতে এলুম, নইলে পরে তুমি বলবে—কেউ আমায় জানায় নি।

কোদঈ চলে গেল। নোহরী বসে বসে তার দিকেই তাকিয়ে রইল। কোদঈ ব্যঙ্গ করে গেল, কথায় যেন সাপের বিষ ঝরিয়ে দিয়ে গেল।

দুই

নোহরী অমনি করে একই জায়গায় বসে ছিল। এমন সময় সোরগোল কানে এল— এসে গেছে, এসে গেছে, মিছিল এসে গেছে। পশ্চিমের পথে ধুলো উড়ছে, পৃথিবী বুঝি তার যাত্রীদের ধুলোর আবীর ছুঁড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েমদ্দ সবাই সব কাজ ফেলে তাদের অভিনন্দন জানাতে ছুটল। একটু পরেই তিনরঙা ঝাণ্ডা উড়তে দেখা গেল, স্বরাজ্য বুঝি এল, ঐ আলোর সিংহাসন থেকে ঐ বুঝি তার প্রসাদ বর্ষণ।

গ্রামের মেয়েরা মঙ্গলগাথা গাইছে। যাত্রীরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুজন দুজন করে সার-বেঁধে এগোচ্ছে। প্রত্যেকের পরনে খদ্দরের কুর্তা, মাথায় গান্ধী টুপি, কাঁধে খদ্দরের থলে ঝুলছে, দুহাত খালি, মনে হয় স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করার জন্যে। এবার তাদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। উদাত্ত গলায় তারা গাইছে দেশানুরাগের গান, সে গান হৃদয়ের উত্তাপে উষ্ণ, গভীর অন্তরের ঐশ্বর্যে দীপ্ত—

> একদিন বহ্ থা কি হম সারে জহাঁ মেঁ ফর্দ থে
> একদিন য়হ হ্যায় কি হম-সা বেহয়া কোঈ নহীঁ
> একদিন বহ্ থা কি আপনী শান পর দেতে থে জান
> একদিন য়হ্ হ্যায় কি হম-সা বেহয়া কোঈ নহীঁ।

সে একদিন ছিল, যেদিন সারা বিশ্বে আমরাই ছিলাম শ্রেষ্ঠ,

সেদিন নিজের মর্যাদার গৌরবে প্রাণকে তুচ্ছ করতে জানতাম, আর আজ, আজ আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা নেই।

গ্রামবাসীরা দলে দলে এগিয়ে গিয়ে যাত্রীদের স্বাগত জানাল। যাত্রীদের কপালে মাথায় ধুলো জমে গেছে। ঠোঁট শুকনো, মুখে ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু চোখে স্বাধীনতার স্বপ্নময় জ্যোতি ঝলকাচ্ছে।

মেয়েরা গান গাইছে, ছেলেরা কলরব করছে, পুরুষরা যে যার গামছা দিয়ে যাত্রীদলের সবাইকে বাতাস করছে। এই সমারোহের এক কোণে অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে বুড়ি নোহরী তার লাঠিতে ভর করে একদৃষ্টে চুপ করে তাকিয়ে রয়েছে, যেন মূর্তিমতী আশীর্বাদ। কেউ তাকে নজর করছে না। গৌরব-মুগ্ধ মুখে একজোড়া চোখ জলে ভরভর ; সে চোখে অপরিসীম স্নেহ, ও যেন এই জনপদের সাম্রাজ্ঞী, এ গ্রাম ওর, সমবেত সবাই যেন ওর নিজের ছেলে। ভেতরে কোথায় ছিল এই অসীম ক্ষমতার শক্তি, যার উন্মেষ ঘটেছে এই মুহূর্তে এর আগে কখনো যার পরিচয় পায় নি, অশীতিপরা নোহরী।

সহসা এগিয়ে আসে নোহরী, তার লাঠিগাছ পড়ে থাকে ধুলোয়, দুহাতে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে আসে, পরিত্যক্ত লাঠির সঙ্গে যেন ধুলোয় পড়ে থাকে ওর বার্ধক্য আর দুঃখের বোঝা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মুক্তিসৈনিকদের দিকে, ওদের শক্তিমত্তার দীপ্তিতে নিজের অন্তরটা ভরে নিতে চায় বুঝি, তারপর হঠাৎ সব ভুলে বৃদ্ধা নাচতে থাকে। নোহরী ভুলে গেছে ওর বয়স, ওর অতীতের আর বর্তমানের কথা, যৌবনমদমত্তা বিহ্বলা সুন্দরী যেমন নাচে তেমনই করেই নাচছে এখন বুড়ি নোহরী। দু-পা চার-পা করে পিছু হটে সবাই তাকে জায়গা করে দিচ্ছে, একটা ছোটো আঙিনার মতো হয়ে গেছে জায়গাটা, বুড়ি নেচে চলেছে। তার ভেতরে আজ এক অলৌকিক উল্লাসের আলো, সে আলোয় ধুয়ে মুছে গেছে তার দুঃখতাপের সব আবর্জনা। প্রথম প্রথম সবাই ঠাট্টাতামাসার ভঙ্গিতে ব্যাপারটা দেখছিল, মজা পাচ্ছিল, ছেলেরা যেমন বাঁদর নাচ দেখে, ক্রমশ এই পবিত্র অনুরাগের পাবন প্রবাহে

সবাই মাতাল হয়ে ওঠে। বুড়ি নেচে চলে—তার অশক্ত অবয়বে কোথায় লুকিয়েছিল এই তারুণ্যের উচ্ছলতা, এই নমনীয় লাস্য। বুড়ি নাচছে। তার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির এই রমণীয় পরিবেশ এক বিস্তীর্ণ নৃত্যাঙ্গনের রূপ নিয়েছে।

কোদঈ বলে— ভাবী, হয়েছে, এবার থামো।

নোহরী নাচতে নাচতেই বলে— দাঁড়িয়ে আছ কেন, এসো-না দেখি কেমন নাচতে পার।

কোদঈ বলে— আর বুড়ো বয়সে কী নাচব?

নোহরী নাচ থামাল। বললে— সে কি, তুমি এখনো বুড়ো আছ? আমার তো বয়স উড়ে পালিয়েছে। এই যে এরা, আমার বীরেরা এসেছে, এদের দেখে তোমার বুক ফুলে উঠছে না? আমাদের সব দুঃখ দরদ হরণ করবে বলেই তো এই চটের বস্তর অঙ্গে চড়িয়েছে গো। দেখো এই হাত দিয়ে হাকিমের বেগার খেটেছি, সেবাও করেছি আবার ধমকও খেয়ে মরেছি, গাল খেয়েছি। এবার সেই জোরজুলুমের রাজত্বি নাশ হতে চলেছে—এখন কি আমাদের বুড়ো হবার বয়েস, বলো না। আমরা তো সব অভাবে পড়ে অসময়ে বুড়ো হয়েছি। সবার পেটেই আগুন জ্বলছে কিনা? এখানে তো গাঁসুদ্ধ সবাই রয়েছ, বলো-না সত্যি করে, গত ছমাসের মধ্যে কার পুরো পেট খাওয়া জুটেছে? ঘিয়ের গন্ধ শুঁকেছ কেউ। রাতের ঘুম পুরো হয়েছে? যে ক্ষেত তিন টাকায় ইজারা পেতে, তার জন্যে ন-দশ টাকা ভরতে হয়। জমিতে কি সোনা ফলবে? খাটতে খাটতে হাড়মাস কালি হয়ে যায়। আমরা মানুষ তাই এত স'য়েবয়েও টিঁকে আছি। আর-কেউ হলে মরে ভূত হয়ে যেত কিংবা মেরে মরত। ধন্য মহাত্মাজী, ধন্য তাঁর চেলারা যারা দীন দুঃখীর দুঃখ বোঝে, তার উদ্ধারের চেষ্টা করছে। আর সবাই তো আমাদের পিষে মেরে, আমাদের খুন নিংড়ে ফেলতে চায়।

যাত্রীদলের মুখ আলো হয়ে ওঠে, বুক ভরে ওঠে। তারা প্রেমের হরষে গান ধরে—

একদিন থা কি পারস থী য়ঁহা কী সরজমীন
একদিন য়হ হৈ কি বে দস্তোপা কোঈ নহীঁ।

সে একদিন ছিল যখন এদেশের আকাশমাটিতে পরশমণি ছিল। আর আজ? আজ এদেশের মতন অক্ষম, অসহায় কে।

কোদঈয়ের উঠানে মশাল জ্বলছে। কয়েকটি গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে। যাত্রীদের আহার সাঙ্গ হল, সভার কাজ শুরু হল। দলের নায়ক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—

বন্ধুগণ, আজ আপনারা আমাদের যেভাবে অভ্যর্থনা জানালেন, তাতে আমাদের আশা হচ্ছে, আমাদের শেকল ছেঁড়ার সময় আসন্ন। আমি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের নানান দেশ দেখেছি, তাই আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আপনাদের সারল্য আপনাদের সততা, আপনাদের শ্রমনিষ্ঠা এবং ধর্মভাব পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই বিরল। আপনাদের দেখে মনে হয় আপনারা নররূপী দেবতা। আপনাদের ভোগ-বিলাসে আকাঙ্ক্ষা নেই, নেশায় আসক্তি নেই, শুধু নিজের কাজ করে যাওয়া আর নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা। এ আপনাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু আজ আপনাদের দেবচরিত্র আর সরলতাই আপনাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। মনে কিছু করবেন না, আপনারা এ পৃথিবীতে বাস করার অযোগ্য। আপনাদের জন্যে স্বর্গই হল উপযুক্ত স্থান। জমির খাজনা বর্ষাকালের নালার জলের মতন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, আপনারা টুঁ শব্দ করেন না। আমলা তশীলদারে চুষে খাচ্ছে, আপনাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তার ফলে লোকে আপনাদের দুহাতে লুটছে, তাও খেয়াল করেন না। আপনাদের হকের ধন, রোজগারের কড়ি পাঁচভূতে কেড়ে খাচ্ছে— আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, নেপোয় দই মারছে, আপনারা চমৎকার চোখ বুজিয়ে আছেন। আগেকার দিনে গ্রামের লাখ লাখ লোক সবাই সুতো কেটে কাপড় বুনে চালাতেন। আর আজ আপনাদের কাপড় আসছে বিদেশ থেকে। আগে সবাই নুন তৈরি করত। এখন নুন আসে বাইরে থেকে। দেশে নুন

বানানো অপরাধ। এদেশে এত নুন যে আগামী দুশো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত লোককে নুন খাওয়াতে পারে। কিন্তু কেবল নুনের বাবদই আপনারা বছরে সাত কোটি টাকা দেন। আপনাদের খালেবিলে ঝিলে জলায় নুন পড়ে আছে। আপনি সে নুন হাত দিয়ে ছুঁতে পাবেন না। কিছুদিন পরে আপনার বাড়ির কুয়োর জলে টেকসো বসে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই। তা এত অন্যায় জীবনভর মুখ বুজে সয়ে যাবেন ?

একজনের গলা শোনা গেল— আমাদের উপায় কী।

নায়ক— এই তো আপনাদের ভ্রম। এত বড়ো রাজত্বটা আপনারাই কাঁধে করে রেখেছেন। এতবড়ো ফৌজ, এই-সব বড়ো বড়ো সায়েবসুবো— আপনারাই এ-সবের আসল মালিক। তবুও আপনারা না খেয়ে মরেন, অত্যাচার সহ্য করেন, তার কারণ— আপনারা নিজেদের শক্তির কথা জানেন না। এটা জানবেন, যে দুনিয়ায় যে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না সে সবসময় স্বার্থপর আর জুলুমবাজ লোকের হাতের পুতুল হয়ে থাকে। আজ পৃথিবীর সমস্ত লোক জান দিয়ে লড়ছে। হাজার হাজার জওয়ান প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করছে— জুলুমের পালা শেষ করবে বলে। যারা আপনাদের অসহায় ভেবে লুটে চলেছে, তারা কি মুখের গ্রাস ছেড়ে দেবে। তাই তারা আপনাদের এই-সব সৈনিকদের ওপর যতদূর সম্ভব অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা সব সহ্য করতে প্রস্তুত। এখন ভেবে দেখুন, আপনারা কি আমাদের সাহায্য করবেন ? মরদের মতন এগিয়ে এসে নিজেদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবেন, না কি কাপুরুষের মতন বসে বসে কপালের দোষ দেবেন ? এমন সুযোগ তার নাও আসতে পারে। একবার সুযোগ হাত ফসকে গেলে, সারাজীবন হাত কামড়াতে হবে। আমরা ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে লড়াই করছি। তাই ন্যায় আর সত্যই আমাদের হাতিয়ার। আমাদের এখন এমন বীরপুরুষ চাই, যে হিংসা দ্বেষ অন্তর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস রেখে ধর্মের খাতিরে সব দুঃখ সহ্য

করতে পারে। বলুন, আপনারা কি সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন ?

কেউ এগোল না। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ।

চার

এমন সময় শোরগোল উঠল— পুলিস। পুলিস আসছে।

একদল কনস্টেবল নিয়ে পুলিসের দারোগা এসে সভায় হাজির হলেন। লোকজন তাদের দিকে সভয়ে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়তে চাইছে।

দারোগা সায়েব হুকুম দিলেন— বদমায়েসগুলোকে মেরে তাড়াও।

সেপাইরা ডাণ্ডা হাতে নিল, কিন্তু কারুর ওপর ডাণ্ডা চালাবার আগেই সবাই হাওয়া হয়ে গেল। যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে। সভায় দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মিনিট দশেকের ভেতর গাঁয়ের একটা লোকও রইল না। শুধু নায়ক আর তার সৈন্যদলের পাশে কোদণ্ড মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

দারোগা কোদণ্ডকে দেখে চোখ রাঙিয়ে বলল— কী রে কোদণ্ডয়া, তুই এ-সব বজ্জাতদের এখানে কী করতে জড়ো করেছিস ?

কোদণ্ড একবার রক্তচক্ষু তুলে দারোগাকে দেখল, তারপর লোকে যেমন বিষ খায় তেমনি করে রাগ চেপে গেল। আজ যদি তার মাথায় সংসারের বোঝা না থাকত, তা হলে সেও থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিত। সংসার আর জমিজেরাত নিয়ে তার জীবনের পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, আজ সেই বিষয় আশয়কেই বিষের মতন লাগছে।

কোদণ্ড কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে নোহরী পেছনে ছিল, এগিয়ে এসে বলল— কী হল। জবাব দে না। লাল পাগড়ী দেখে জিভ এড়িয়ে গেল নাকি। — বলি, কোদণ্ড কি তোমার কেনা

চাকর যে 'কোদঈয়া-কোদঈয়া' করছ। আমারই মাইনে খাবে, আবার আমাকেই চোখ রাঙাবে? লজ্জা করে না?

নোহরী দুপুরের খররোদের আঁচের মতন কাঁপছে। দারোগা থতিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কী ভাবল, বোধ হয় মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করলে নিজের মান থাকবে না বলে কোদঈকে বলল—এ নচ্ছার মেয়েছেলেটা কে রে, ধর্মের ভয় না থাকলে জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতুম।

বুড়ি লাঠির ওপর ভর করে দারোগার মুখোমুখি দাঁড়াল। বললে—ধর্মের দোহাই দিয়ে কেন ভগবানের বদনাম করছ। তোমার ভগবান তো তোমার সায়েব। যাও তার জুতো চাটো গে। গলায় দড়ি জোটে না য়্যা! এদের জানো, যারা এসেছে তারা কারা? এরা হল মানুষ, এরা গরিবের জন্যে জান দিতেও রাজি। তুমি ওদের বলছ বদমায়েস? আর তুমি? তুমি ঘুষ খাও, আড়ালে জুয়ো খেলাও, চুরি করাও, ডাকাতি করাও, ভালোমানুষদের ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজের পকেট গরম কর আর তোমার সায়েব ভগবানের জুতোর সুখতলায় নাক ঘষ, তোমার আস্পর্ধা তুমি এদের বজ্জাত বল?

নোহরীর জ্বালাধরানো কথা শুনে এদিক-ওদিক অনেক লোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফের একে একে জমা হল। দারোগা দেখল ভিড় বাড়ছে, সে হাণ্টার নিয়ে ভিড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। হাণ্টারের এক ঘা নোহরীর পিঠেও পড়েছিল। বুড়ির মনে হল যেন পিঠের ওপর আগুনের ফুলকি ছুটে গেল। চোখে অন্ধকার দেখল। তবু অবশিষ্ট শক্তির সঞ্চয় জড়ো করে জোর গলায় বলল—ছেলেরা, পালিয়ে যাচ্ছ কেন? এখানে কি নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলে, না রথদোল দেখতে? তোমাদের এই নেড়িকুত্তার মতন স্বভাব বলেই, এই নামরদগুলো বাঘ সেজে আছে। মারপিট, গালিগালাজ আর কতকাল সইবে?

এক সেপাই পুঙ্গব বুড়ির ঘাড় ধরে জোরে ধাক্কা মারল। বুড়ি

দু-তিন পা হুমড়ি খেয়ে আর-একটু হলেই মুখ থুবড়ে পড়ছিল, কোদঈ লাফিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল। তারপর ওকে সামলে নিয়ে বলল— বেচারী বুড়ির ওপর কেন রাগ দেখাচ্ছ দোস্ত? গোলামি করে করে নামরদ বনে গেছ একেবারে? মেয়েছেলে, তায় বুড়ো মানুষ, তার গায়ে হাত তোলা কি মরদের মতন কাজ হল?

নোহরী মাটিতে বসে পড়েছিল। বললে— কাকে মরদ বলছ? পুরুষমানুষ হলে আর গোলামি করে? ভগবান! মানুষ এমন পশু হয় কী করে। হ্যাঁ ইংরেজ জুলুম করে, সে আলাদা কথা, তাদের রাজত্বি। কিন্তু তোমরা তো তার চাকর। তোমাদের কী মিলবে? গদী মিলবে! কিন্তু গোলামের এঁটোতেই আনন্দ। ছ্যাঃ, মাইনে খায় বলে এরা সব করতে পারে। লোকের মাথা কেটে নেবে!

দারোগা এবার দলের নেতাকে নিয়ে পড়ল— তুমি কার হুকুমে এ গ্রামে এসেছ?

নেতা শান্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিল— ভগবানের হুকুমে।

দারোগা— তুমি এ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত করছ।

নেতা— এদের অবস্থা সম্পর্কে এদের সচেতন করা যদি শান্তি বিঘ্নিত করা হয় তা হলে একশোবার করছি।

পলাতকদের গতি আরো একবার রুদ্ধ হল। কোদঈ নিরাশা-ভরা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বললে— ভাইসব, এখানে তোমরা কয়েকটা গাঁয়ের লোক রয়েছ। দারোগা যেভাবে আমাদের অপমান করল, সেটা সহ্য করে তোমরা রাত্তিরে আরামে ঘুমোতে পারবে তো? এ অন্যায়ের কোনো প্রতিকার নেই। হাকিমেরা আমাদের নালিশ কক্‌খনো শুনবে না। আজ যদি আমাদের মেরেও ফেলে, কিছু হবে না। এই তো আমাদের ইজ্জত, এই তো আবরু। ধিক্ এই জীবনে।

স্রোতের মুখে বাঁধ পড়ল যেন। সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে গেল। যাদের মনে ভয়ের ছায়া পড়েছিল, হঠাৎ তাদের ভয় ঘুচে গেল।

তাদের মুখ কঠোর হয়ে আসছে। দারোগা গতিক দেখে ঘোড়ায় চড়ে বসল আর কোদঈকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিল। দুজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে কোদঈয়ের হাত ধরল। কোদঈ বললে— ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি পালাব না। চলো কোথায় যাবে।

সেপাইরা কোদঈকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কোদঈয়ের দুই জোয়ান ছেলে লাফ দিয়ে পড়ে বাপকে সেপাইদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় আবিষ্ট সমস্ত লোক এসে পুলিসদের ঘিরে দাঁড়ালো।

দারোগা হাঁক ছাড়ল— তোমরা সরে যাও, নয়তো ফায়ার করব। তার হুমকির জবাবে সমবেত জনতা আওয়াজ দিল— 'ভারত মাতাকী জয়'—তারা আরো এগিয়ে এল।

দারোগার এবার নিজের প্রাণের আতঙ্ক। সুর পালটে নম্রকণ্ঠে দলনায়ককে বললে— দেখুন লীডার সায়েব, এরা একটা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করছে। এর ফল কিন্তু ভালো হবে না।

নেতা আশ্বাস দিলেন— আমাদের একজনও এখানে থাকতে আপনার গায়ে কেউ হাত তুলবে না। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, আপনি আর আমি একই বুটের তলায় পিষে মরছি। দুর্ভাগ্য যে আপনি আমার বিপক্ষ দলে, আমি আপনার—

এই কথা বলে নেতা গ্রামবাসীকে ডেকে বললেন— ভাইসব, আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে ন্যায়ধর্মের এই লড়াই ন্যায়-ধর্মের হাতিয়ার নিয়েই লড়তে হবে। আমরা ভয়ে ভয়ে লড়াই করব না। আসলে আমাদের কারুর ওপরেই কোনো বিদ্বেষ নেই। কারুর সঙ্গেই শত্রুতা নেই। আজ দারোগার বদলে কোনো ইংরাজ এলেও আমাদের বাঁচাতে হত। দারোগা কোদঈ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি একে চৌধুরীর সৌভাগ্য বলে মনে করি। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে শাস্তি পায়, সে মানুষ ধন্য। এতে রাগ করবার বা ভয় পাবার কিছু নেই। আপনারা সরে যান, পুলিসকে যেতে দিন।

দারোগা আর সেপাই কোদাঈকে নিয়ে চলে গেল। জনতা জয়ধ্বনি দিল— ভারতমাতাকী জয়।

অভিনন্দনের জবাবে কোদঈ বলল— রাম রাম ভাইসব, লড়াইয়ের ময়দানে হাজির থেকো, ভয় পেয়ো না। ভগবান মালিক।

ছেলেরা ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিল। বললে— বাবা, আমাদের কিছু বলে যাও।

কোদঈ তাদের ভরসা দিয়ে বলল— ভগবানে ভরসা রেখো। আর মরদের মতো কাজ করে যেয়ো। ভয়ই সব পাপের মূল। মন থেকে ভয় তাড়াও, কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। সত্যের কখনো হার হয় না।

আজ পুলিসের লোকের সঙ্গে জেলের পথে চলতে কোদঈয়ের মনে নির্ভীকতার যে অনুভূতি হল, এর আগে কখনো তা হয় নি। জেল আর ফাঁসিতে তার আজ ভয় নেই, গৌরব আছে। সত্যের রূপ আজ জীবনে প্রথমবার সে প্রত্যক্ষ করল, কবচের মতো সেই সত্য ওকে এখন থেকে রক্ষা করে চলবে।

পাঁচ

চোখের সামনে দিয়ে তাদের মোড়ল কোদঈ চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেল আর তারা কেউ কিছু করতে পারলে না, তাকিয়ে দেখলে— এ ব্যাপারটা গ্রামবাসীদের কাছে খুবই লজ্জার বলে মনে হল। এখন মুখ দেখাবে কী করে। প্রত্যেকের মুখে গাঢ় বেদনার ছাপ। গ্রামটা যেন দেউলে হয়ে গেছে।

হঠাৎ নোহরী চেঁচিয়ে বলে উঠল— জেগে জেগে পস্তালে কী হবে। নিজেদের দুর্দশাটা দেখলে তো, না কি এখনো দেখতে বাকি আছে! আজ বুঝলে তো আমাদের ওপর আইনের নয়, লাঠির শাসন চলছে। আর আজ আমরা এতই বেহায়া হয়ে পড়েছি, যে এত দুর্দশার পরও মুখ খুলি না। এতখানি

স্বার্থপর, এতদূর ভীতু যদি না হতুম, তা হলে ওদের কী আস্পর্দা যে আমাদের চাবুক দিয়ে মারে। যদ্দিন তোমরা গোলাম বনে থাকবে, ওদের সেবাদাসত্ব করবে, তদ্দিন এঁটোকাঁটা জুটবে। আর যেই কাঁধ বেঁকিয়ে দাঁড়াতে চাইবে, ওমনি পিঠে কোড়া হাঁকড়াবে। বলি আর কত মার খেয়ে মরবে? কদ্দিন এমনি মড়ার মতন পড়ে থাকবে? আর কাক-শকুনে ছিঁড়ে খাবে? যদি বেঁচে থাক, লজ্জাশরমের বালাই থাকে, তবে এবার একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াও। আর যদি ইজ্জত বলে কিছু না থাকে, তো কিসের জমিজেরাত আর কিসের ধর্ম? বেঁচে থেকে কী লাভ। তোমার বউবাচ্চাও জনমভর লাথিঝাঁটা খেয়ে থেঁতলে মরবে, এইজন্যই কি বেঁচে থাকা? মেনিমুখো হয়ে থেকো না। সেই একদিন তো মরতেই হবে সবাইকে তা মাচায় শুয়ে পোকামাকড়ের মতন না মরে, চলো ধর্মযুদ্ধে বীরের মতন মরি। আমি বুড়ি মেয়েমানুষ আর কিছু পারব না, কিন্তু এরা যেখানে শোবে সে জায়গাটা ঝাঁট দিতে তো পারব, এদের বাতাস করতে তো পারব।

কোদঈয়ের বড়ো ছেলে মেকু বললে— আমরা বেঁচে থাকতে তুমি কেন যাবে জেঠি। আমিই চললুম। গঙ্গা রইল, ক্ষেতখামার দেখবে।

ছোটোভাই গঙ্গা বললে— দাদা, এটা তোমার ঠিক হল না। আমি থাকতে তুমি যাবে কেন। তুমি থাকলে সংসার সামলাতে পারবে, আমার দ্বারা তো তা হবে না। আমায় যেতে দাও।

মেকু বললে— ঠিক আছে। জেঠিমা যা বলে তাই হবে।

নোহরী মুচকি হেসে বলল— যে আমায় ঘুষ দেবে, তাকেই জেতাব।

মেকু বললে— সেকি জেঠিমা, তোমার কাছারিতেও ঘুষ চলে! আমি ভাবলুম এখানে ইমানদারি হবে।

নোহরী বলে—তুই রেখে দে। মরার আগে যখন হাতে ক্ষ্যামতা পেয়েছি, কিছু কামিয়ে নিই।

গঙ্গা হেসে বলে— আজ বাজার থেকে তোমার জন্য তামাকের

পাতা নিয়ে আসব।

নোহরী বললে— ব্যস, যা তুই জিতে গেলি।

মেকু বললে— এ তোমার মোটেই ন্যায়বিচার হল না।

নোহরী বললে—আদালতের রায় কি কখনো দুই পক্ষের পছন্দ হয়? তুই নতুন বলছিস না।

গঙ্গা নোহরীর পায়ের ধুলো নিলে, ভাইকে আলিঙ্গন করলে, বললে—কাল বাবাকে বলে পাঠাও আমি যাচ্ছি।

গাঁয়ের একজন বলল— আমার নামটাও লিখে নেবে ভাই —সেবারাম।

জয়ধ্বনি পড়ে গেল। সেবারাম এসে নায়কের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরো একজন আওয়াজ দিল— আমারও নাম লেখো, ভজন সিং। আবার জয়ধ্বনি। ভজন সিং এসে নেতার পাশে দাঁড়াল।

এদিককার পাঁচ-দশটা গাঁয়ে ভজন সিংয়ের পালোয়ান বলে খ্যাতি ছিল।— সে তার দরাজ ছাতি ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে যখন নেতার পাশে দাঁড়াল, তখন মণ্ডপে যেন প্রাণের জোয়ার এল। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জন খাড়া হল। আমার নাম— ধূরে। ধূরে এ গাঁয়ের চৌকিদার। সকলে মাথা তুলে তুলে তাকে দেখছে। হঠাৎ করে কারু বিশ্বাসই হতে চাইছে না ধূরে সত্যিই নিজের নাম লেখাচ্ছে।

ভজন সিং হাসছে।— তোর কী হল রে?

ধূরে বলল— তোমার যা হল আমারও তাই হয়েছে। বিশ বছর গোলামি করে হাড়মাস কালি হয়ে গেছে।

আবার একজন— আমার নামটা লেখো, কালে খাঁ।

জমিদারের পেয়াদা। যেমন চসমখোর তেমনি লোকের ওপর জুলুম করত। সবাই অবাক হয়ে গেল খুব।

মেকু বলল— মনে হচ্ছে আমাদের লুটেপুটে ঘরদোর সামলে নিয়েছ। কী বল?

কালে খাঁর গম্ভীর স্বর। বলে— বেপথে ঘুরে বেড়াই বলে কি কোনোদিন সাচ্চা পথে হাঁটব না ভাই? এ যাবৎ যার নিমক খেয়েছি, তার জুতো বয়েছি। তোমাদের লুটেপুটে নিজের ঘর ভরি নি, মনিবের ঘরই ভরেছি। আজ বুঝছি কী গুখুরি করেছি। তোমরা আমার ভাই। তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। পার তো আমায় মাপ কোরো।

পাঁচজন রংরুট একে অপরকে কোলাকুলি করে, বুকে জড়িয়ে ধরে, চেঁচাতে থাকে, যেন স্বরাজ হাতে পেয়েই গেছে। তা এও একরকমের স্বরাজ বৈকি। স্বরাজ তো একটা অবস্থার প্রাপ্তি। পরবশ্যতার আতঙ্ক কেটে গেলেই স্বরাজ। ভয়ই পরাধীনতার ভিত্তি, নির্ভীকতাই স্বরাজ। বিধি আর সংগঠন তো গৌণ ব্যাপার। এবার স্বয়ংসেবকদের সম্বোধন করে নায়ক বললেন— বন্ধুগণ, আপনারা আজ মুক্তি সেনাদলে যোগ দিলেন, এতে আমি আপনাদের সানন্দ অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন, আমরা কী ভাবে যুদ্ধ করি। আপনাদের ওপর নানারকম উৎপীড়ন হবে, কিন্তু মনে রাখবেন, আজ যেমন করে লোভ মোহ ত্যাগ করে চলেছেন, হিংসা আর ক্রোধকেও ঠিক অনুরূপভাবে ত্যাগ করতে হবে। আমাদের এ সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ। আমাদের ধর্মপথে থাকতে হবে। আপনারা তার জন্যে প্রস্তুত?

পঞ্চস্বরে ঐকতান হল— প্রস্তুত।

নায়ক শুভেচ্ছা জানালেন— ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।

ছয়

সুন্দর সোনালি সকাল উল্লাস ছড়াচ্ছে। বাতাসে প্রাণের হিন্দোল, আলোয় আবেগ। লোক যেন মত্ত হয়ে গেছে। মুক্তির দেবী ওদের বুঝি ইশারায় কাছে ডাকছে। সেই খেত সেই খামার, সেই একই বাগান, সেই একই নরনারী অথচ তবু নতুন। আজকের সকালের বুকে আলোর যে বিভূতি, যে প্রসাদ সে তো আরো

আগে কোনোদিন পায় নি। আজ সব-কিছুতেই নতুন রঙের সমাহার।

সূর্যোদয়ের আগেই কয়েক হাজার লোকের জমায়েৎ হল। সত্যাগ্রহীদের দল পথে পা দিতেই জয়ধ্বনিতে আকাশ ফেটে পড়ল। নতুন সৈনিকদের বিদায়পর্ব, তাদের জায়াদের কাতর আকুতিভরা চাহনি, মা-বাপের বাষ্পার্দ্র গৌরব, এই জয়যাত্রার অভিনব দৃশ্য লোকের মনকে উৎসাহ আবেগে মাতিয়ে দিচ্ছে।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে নোহরী এসে দাঁড়াল। মেকু বলল— জেঠিমা, আশীর্বাদ করো। নোহরী বলল— চল্-না, কত আশীর্বাদ চাই, রোজ করবখন। আমি তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল — খুড়িমা, তুমি গেলে গাঁয়ে থাকবে কে ?

নোহরী একান্ত স্নেহের সুরে বলল — বাবারা, এই তো আমার যাবার সময়। এখন না যেতে দিস তো ছ'মাস ছ'মাস বাদেই যাব। এখন গেলে জীবন সার্থক হবে। আর দেরি করলে, খাটে চড়ে যেতে হবে। তখন মনের সাধ মনে পুষেই চলে যেতে হবে। এই যে আমার ছেলেরা রয়েছে সঙ্গে। এদের সেবা করেই আমার মুক্তি হয়ে যাবে। ভগবান করুন তোমরা সুদিনের মুখ দেখো। আহা সে দিন যেন চোখে দেখে যেতে পারি।

এই বলে নোহরী সবাইকে অন্তরের আশীর্বাদ উজাড় করে দিল। তারপর দলনেতার পাশে এসে দাঁড়াল।

সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে। সেবক দলের মিছিল পথ পার হয়ে যাচ্ছে। তাদের কণ্ঠে রণসংগীত—

"একদিন বহথা কি হম সারে জহাঁ সে ফর্দ থা…"

গর্বে, উল্লাসে, উৎসাহে নোহরীর পা মাটিতে পড়ছে না, সে চলেছে যেন পুষ্পক রথে চড়ে।

সুজান ভগত

চাষাভুষো মানুষের হাতে টাকা পয়সা হলে যে ধর্মকর্ম করার দিকে ঝোঁকে। আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মতন প্রথমেই নিজের ভোগবিলাসের পেছনে ছোটে না। সুজানের ক্ষেতে বছর কয়েক যাবৎ সোনা ফলছে। মেহনত তো গাঁয়ের সব কিষাণই করে, সুজানের যেন বেস্পতির দশা। ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়। পরপর তিনবছর নাগাড়ে আখ হল। ওদিকে গুড়ের দরও তেজীতে চলছে। কিছু না-হোক হাজার দু'আড়াই নগদ হাতে এসে গেল। আর দেখে কে। চিত্তবৃত্তি ধর্মমুখী হল। বাড়িতে দুবেলা সাধুসন্নিসির সেবা-সৎকার চলল। তার দোরে ধূনী জ্বলতে লাগল। এলাকার কানুনগো সফরে এলে সুজান মাহাতোর মণ্ডপে ডেরা বাঁধে। থানার বড়োবাবু, জমাদার, শিক্ষাবিভাগের অফিসার— কেউ না কেউ সবসময়েই সুজানের আটচালায় পড়ে থাকে। মাহাতোর আনন্দ আর ধরে না। ধন্য ভাগ্য হে সুজান মাহাতো। এখন বড়ো বড়ো হাকিম এসে তার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। যাঁদের সামনে তার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোত না, এখন 'মাহাতো মাহাতো' করে তাঁদেরই গলা শুকিয়ে যাবার জো। মাঝে মাঝে বাড়িতে ভজন-সংকীর্তনও হচ্ছে আজকাল।

এক মহাপুরুষ দেখলেন ব্যাপার বেশ ভালোই। তিনি বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। ঢোলক এল, খোল করতাল এল, সৎসঙ্গ হতে লাগল। সবই সুজানের সুসময়ের জলুস। ঘরে মনখানেক দুধ হয়, কিন্তু সুজানের নিজের গালে একফোঁটাও তলায় না, দিব্যি দেওয়া আছে। হয় হাকিমের পেটে যায়, নয় বৈরিগির পেটে। চাষায় আবার ঘি দুধ কবে খায়, শাকভাত হলেই হলো। সুজান নম্রতা আর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

সবার সামনে মাথা হেঁট করেই রয়েছে। পাছে কেউ মনে ভাবে পয়সার গরম হয়েছে।

গ্রামে মোটে তিনটি কুয়ো। অনেক ক্ষেতে ভালোমতন জল যায় না। চাষ নষ্ট হয়। সুজান একটা পাকা ইঁদারা বানিয়ে দিল। ইঁদারার নান্দীমুখ হল, ব্রাহ্মণভোজন হল। যেদিন প্রথম ইঁদারায় 'পুর' চলল, সুজানের যেন চতুর্বর্গ লাভ হল। যে কীর্তি গ্রামের কেউ রাখতে পারে নি, বাপ-পিতামোর পুণ্যফলে সুজান আজ সেই কীর্তি রাখল।

একদিন গ্রামে একদল গয়ার যাত্রী এল। সুজানের অতিথ-শালাতেই তাদের আহারাদি হল। গয়াধামের বাসনা সুজানের অনেকদিনকার। এই সুযোগে সেও যাবে বলে তৈরি হল।

বুলাকী, সুজানের বউ, বললে— এখন থাক্-না। আসছে বছর যাওয়া যাবে।

সুজান গম্ভীর সুরে বললে— আসছে বছর কী হবে, তা কে বলতে পারে। ধর্মকর্মের ব্যাপারে খুঁতকাড়া ভালো না। পেরমাইয়ের ভরসাটা কী ? আজ আছি কাল নেই।

বুলাকী— হাত যে একেবারে খালি হয়ে যাবে।

সুজান বলে— ভগবানের দয়া থাকলে আবার হাত ভরে যাবে। তাঁর কি কিছুর অভাব আছে রে ?

বুলাকী এ কথার কী জবাব দেবে। সৎকাজে বাধা দিয়ে সে কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যায়। রাত পোহালে স্ত্রী-পুরুষে গয়া করতে বেরোল। তীর্থ সেরে যদি ফেরা হল তো আবার যজ্ঞি করতে হয়, জ্ঞাতিকুটুম খাওয়াতে হয়, বামুন-ভোজন—কাঙালী-ভোজন করাতে হয়। তাই হল। এগারোখানা গাঁয়ে, সুপুরি বিলানো হল, গাঁসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হল। মহা সমারোহে যজ্ঞি হল। ধুমধাম হল এমন যে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। লোকে বলাবলি করতে লাগল— হ্যাঁ, ভগবান যদি ধন দেন তো সঙ্গে যেন এমন দরাজ দিলও দেন। এতটুকু দেমাক নেই। নিজে হাতে এঁটোপাতা কুড়োচ্ছে। বাঃ, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে সুজান

মাহাতো। কী সুপুত্তুর ছেলে। বাপ যখন মরে, তখন ঘরে কড়ার কুটো ছিল না। আর আজ যেন লক্ষ্মী হাঁটু ভেঙে বসেছে।

নিন্দুকেরও অভাব হয় না সংসারে। একজন বলে— দেখগে গুপ্তধন-টন পেয়েছে নিশ্চয়ই। শুনে আর সবাই তাকে এই মারে তো সেই মারে।— হ্যাঁ তোমার বাপদাদা ঘড়ায় ভরে মোহর পুঁতে রেখেছিল মাহাতোর পোতায়। আরে বাপু এ-সব ধর্মের দান। তুমিও তো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটো, কই অমন আখের ফলন হয় না কেন? ফলাও না দিকি অত ফসল। পার না কেন। ভগবান মানুষের মন দেখেন, বুঝলে। যে দুহাতে খরচ করতে জানে, ধন সে-ই পায়।

দুই

সুজান মাহাতো ভক্ত বৈরিগি হয়ে গেল। ভক্তদের আচার-বিচার অন্যদের থেকে আলাদা হয়ই। সে স্নান না করে কিছু খায় না। গঙ্গা যদি ভক্তর বাড়ির পাশে না হয়, নিত্যি স্নান করে ফিরতে গেলে যদি দুপুর গড়ায়, সেক্ষেত্রে রোজ না হোক অন্তত পুজো-পার্বণের তিথিতে ভক্তকে গঙ্গা নাইতে যেতেই হয়। বাড়িতে পুজো-আচ্চা, ভজন কীর্তন অপরিহার্য। তা ছাড়া খাওয়াদাওয়ারও অনেক বাছবিচার করতে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা অসত্যকে ত্যাগ করতে হয়। ভক্ত মিথ্যে কথা বলতে পারে না। সাধারণ মানুষ মিথ্যে কথা বললে তার যদি একটা শাস্তি হয়, ভক্ত মিথ্যে বললে তার এক লাখ শাস্তি। অজ্ঞান অবস্থায় বহু অপরাধ ক্ষমার্হ, জ্ঞানীর ক্ষমা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই। থাকলেও তা বড়োই কঠিন। সুজানকেও এখন ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হয়।

এতদিন তার জীবন ছিল মজুরের জীবন। সামনে কোনো আদর্শ বা নীতি বলতে কিছু ছিল না। এখন তার জীবনে বিচার ঢুকেছে, ধর্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ। স্বার্থসেবাই আগে জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই নিরিখেই পরিবেশের বিচার করত। ইদানীং ঔচিত্যের কাঁটায় সব-কিছুর পরিমাপ করে। এক কথায় সুজান এখন

জড়জগতের গণ্ডী পেরিয়ে চেতন জগতে পা রেখেছে। অল্পবিস্তর লেনদেনের কারবার ধরেছিল। কিন্তু আজকাল সুদ নিতে গেলে আত্মগ্লানিতে ভোগে। বেশি কি, আজকাল গাই দুইতে গেলে বাছুরের কথাটা আগে খেয়াল হয়, বাছুরটা না খেয়ে থাকবে না তো। তার আত্মা কষ্ট পাবে, আহা ও হল গাঁয়ের মোড়ল, মুখিয়া। কতবার কত মকদ্দমায় সাক্ষী সাজিয়েছে, জরিমানা আদায় করে কত মামলার মনগড়া মীমাংসা করেছে, নিষ্পত্তির ছলে কত মামলার দফারফা করে ছেড়েছে। এখন ও-সব ব্যাপারে যেতে ঘেন্না করে। মিছে কথা, ছল চাতুরী থেকে যোজন খানেক দূরে পালিয়ে থাকে। আগে আগে, মজুরীর পয়সা কতটা কম ঠকিয়ে, জনমজুরদের কতটা দেঁড়েমুষে খাটিয়ে, কত বেশি কাজ আদায় করে নেওয়া যায়, সেই ফিকিরে থাকত। এখন হয়েছে উলটো চিন্তা। যেটুকু কাজ না নিলে নয়, তাই নাও। যতটা পার পারিশ্রমিক দাও। আহা, বেচারার আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না। এখন ওর কথার মাত্রা দাঁড়িয়ে গেছে—দেখো যেন কারুর আত্মা কষ্ট না পায়। দুই জোয়ান ছেলে, তারা এখন কথায় কথায় বাপের খুঁত ধরে। এমন-কি, বুলাকীও আজকাল ওকে পাঁড় বৈরিগি, গোঁড়া ভক্ত বলে ভাবে, ভাবে সংসারের ভালো-মন্দয় ওর কিছু যায় আসে না। চেতন জগতে পা দিয়ে ভক্ত-সুজান উদাসী বৈরিগি হয়ে রইল।

দিনে দিনে সুজানের হাত থেকে কর্তৃত্বের লাগাম খসে যায়। কোন্ ক্ষেতে কী বোনা হবে, কাকে কী দেওয়া হবে, কার কাছে নেওয়া হবে, এমনি ধারার দরকারি কথাবার্তায় আজকাল কেউ আর ভগতজীর পরামর্শ নিতে আসে না। ভগতের কাছে কেউ বড়ো একটা যেতেই পায় না। হয় ছেলেরা কেউ, নয় স্বয়ং বুলাকীই মামলার ফয়সালা করে দেয়। সারা গ্রামে সুজানের মান-সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর নিজের ঘরে কমছে। ছেলেরা আজকাল ওকে বেশি ক'রে খাতির করে। সুজান নিজের হাতে চারপাই তুলছে দেখে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চারপাই তুলে দেয়। তামাকটাও নিজে সেজে খেতে দেয় না, ছেলেরা

কম্বে ধরিয়ে এনে দেয়। পারলে বাপের পরনের কাপড়টাও কেচে দেয়। সে-সব দিক দিয়ে ঠিক আছে। কিন্তু কর্তৃত্ব গেছে, ক্ষমতা আর ওর হাতে নয়। এখন ওকে আর এ বাড়ির কর্তা, গৃহস্বামী বলা চলে না। ও এখন একেবারে মন্দিরের ঠাকুর হয়ে গেছে।

তিন

সেদিন যখন বুলাকী হামানদিস্তায় ডাল কুটছে, একটা ভিখিরি এসে সদর দোরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। বুলাকী ভাবল ডালটা কুটে নিই, তারপর ভিক্ষে দেব। ইতিমধ্যে বড়ো ছেলে ভোলা এসে বলল— ও মা, ওদিকে এক মহাত্মা দরজায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটাচ্ছেন যে। কিছু দাও, নইলে আবার তাঁর আত্মা কষ্ট পাবেন।

বুলাকী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে—কেন বৈরিগি ঠাকুরের কী হয়েছে, পায়ে আলতা পরেছেন? দুমুঠো নিয়ে গিয়ে দিতে পারছেন না? আমার কি চারটে হাত গজাবে। আর কত-জনার আত্মা সুখী করে বেড়াব। চোপর দিনই দানছত্তর খোলা রয়েছে।

ভোলা— বোলো না আর। সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবার ধান্দা ধরেছেন। মহঙ্গু ফসলের উসুলী দিতে এসেছিল। হিসেবে হয় সাত মন। ওজন দেখি পৌনে সাত মন। তা বললুম— আরো দশসের নিয়ে আয়। তা উনি ওমনি ফোড়ন কাটলেন—এখন আবার অতদূরে যাবে? হিসেব পুরো শোধ বলে লিখে দাও, নইলে ওর আঁতে ঘা লাগবে। শোধ হল না আমি কেন লিখতে যাব বলো তো, আমি লিখি নি— দশসের বাকি লিখে রেখেছি।

বুলাকী—বেশ করেছিস। সব তাইতে বাড়াবাড়ি। দিন কতক ওই রকম থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলেই, আপ্‌সে ফোড়ন কাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভোলা— দিনভর বসে খুঁত ধরে বেড়াচ্ছেন। একশোবার বলে দিয়েছি, ঘর-গেরস্থালির কথায় তোমার থাকার দরকার নেই, তা কে কার কথা শোনে।

বুলাকী— তখন যদি জানতুম এই হাল হবে, তা হলে কক্ষনো মন্তর নিতে দিতুম না।

ভোলা—ভক্ত হয়ে দেখছি দুনিয়ার বার হয়ে গেছে। সারাদিন পুজোপাঠেই চলে যাচ্ছে। এখনো এত বুড়ো হয় নি যে কোনো কাজ করতে পারবে না।

এবার বুলাকী আপত্তি জানাল— না ভোলা, এ তোমার কুতর্ক। কোদাল কুড়ুল চালানোর আর বয়েস নেই, তা বলে বসে তো আর থাকে না। গোয়ালে জাব্‌না মাখা, গাই দোওয়া, যা গতরে কুলোয় করে বৈকি।

ভিখিরি সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। সুজান দেখল কেউ কিছু দিচ্ছে না, তখন উঠে অন্দরে গিয়ে কড়া গলায় বলল—একটা মানুষ সেই এক ঘণ্টা থেকে দোরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে, কেউ শুনতেই পাচ্ছ না নাকি। নিজের কাজ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করছ, ভগবানের কাজও একবার নাহয় করলে।

বুলাকী— সেজন্যে তো তুমিই রয়েছ। গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকেই কি ভগবানের কাজ করতে হবে নাকি।

সুজান— কোথায় আছে বলো, আমিই বের করে নিয়ে দিয়ে আসছি। তুমি রাজরানী সেজে বসে থাকে।

বুলাকী— আটা জালাভারা রয়েছে, বসে বসে কাঁদছে। যাও আনাজ * দিয়ে এসো। যত রাজ্যের পোড়া কপালের জন্য রাত থাকতে উঠে জাতা ঘোরাতে আমার বয়ে গেছে।

*ধান গম ইত্যাদি শস্যকে হিন্দীতে 'আনাজ বলে। বাংলায় সচরাচর আনাজ শব্দটার আলাদা মানে করা হয়। যেমন, আনাজ-তরকারী। চলিত বাংলায় এর সঠিক প্রতিশব্দ বোধহয় নেই। অথচ 'ফসল' বা 'শস্য' সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। তাই এখানে মূল শব্দটাই রাখছি। —অনুবাদক।

সুজান ভাড়ার ঘরে গিয়ে একটা ছোটো চুবড়ি ভর্তি করে যব নিয়ে আসে। তা সেরখানেকের কম তো নয়ই।

অমন ঝুড়ি ভরে কেউ ভিক্ষে দেয় না। তবু ইচ্ছে করেই, বউকে ছেলেকে চটাবার জন্যই ঐ ভাবে আনে। আবার চুবড়িটাকে দু'আঙুলে চিমটি কেটে ধরে আনছে, দেখাতে চাইছে যে মোটেই বেশি ওজন নয়— ওর মন উঠছে না। কিন্তু রীতিমত ভারী বোঝা দু'আঙুলে সামলানো যায় না। হাত কাঁপছে। বেশি দেরি করলে পাছে হাত ফসকে পড়ে যায়, তাই জোর পায়ে বাইরে বেরোতে যাবে— হঠাৎ ভোলা দৌড়ে এসে ওর হাত থেকে চুবড়ি কেড়ে নিল। রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল— হাড় মাস কালি করে খাটতে হয়, তবে দানা ঘরে ওঠে।

সুজান খিঁচিয়ে ওঠে— খাটিস তোরাই, আমি বসে খাই না?

ভোলা—ভিক্ষে, ভিক্ষের মতন দিতে হয়। এ তো লুটের মাল নয়। আমরা একবেলা খেয়ে থাকি, যে না হাড়িতে দুটো দানা মজুত থাকুক, ও মশায়, এদিকে দানছত্তর খোলার ধান্ধা। তোমার কী? সংসারে কী এল গেল তার ধার ধারো?

সুজান এ কথার কোনো জবাব দিল না। বাইরে গিয়ে ভিখিরিকে বললে— বাবা এখন যাও, কারুর হাত খালি নেই। তারপর গাছতলায় বসে ভাবতে বসল। নিজের ঘরসংসারে আজ ওর এই হেনস্তা। তাও এখনো অপারগ হয়নি। গতর পড়ে যায় নি। বাড়ির এটা-ওটা কাজ নিয়ে লেগেই থাকে, তাই এই। নিজের হাতে গড়া সংসার। রক্ত-জল-করা ঐশ্বর্য। আর আজ তারই কোনো অধিকার নেই। কুকুরের মতন দোরে পড়ে থাকবে, গেরস্তর দয়া হলে যা দু'মুঠো ছুঁড়ে দেবে, তাই খেয়ে বাঁচবে। এমন জীবনে ধিক! সুজান এমন সংসারে থাকতে চায় না।

সন্ধে হয়ে এল, ছোটো ছেলে শংকর ডাব এনে হাতে দিল। সুজান ডাবটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে দিল। কল্কের তামাক পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খানিক পরে ভোলা উঠোনে চারপাই পেতে দিলে। সুজান গাছতলা থেকে উঠল না।

আরো খানিক পরে রান্না হয়ে গেলে ভোলা ডাকতে এল। সুজান বললে— আমার ক্ষিদে নেই। অনেক পেড়াপীড়ি সত্ত্বেও উঠল না। তখন বুলাকী নিজে এল। বললে, খাবে না কেন? শরীর ভালো আছে তো।

সুজানের সব থেকে বেশি রাগ বুলাকীর ওপর। চোখের ওপর ছেলে বাপকে অপমান করছে, বসে বসে দেখলো। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না যে— নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যেতে দে। ভেতরে ভেতরে ছেলেদের সঙ্গে সাট! ছেলেরা না-হয় ছোটো ছিল, জানেনা কী কষ্ট করে সুজান সংসারের ছিরি ফিরিয়েছে, তোর চোখ কোথায় ছিল, তুই জানিস না। দিনকে দিন, রাতকে রাত বলে ভাবে নি। ভাদ্দর মাসের আঁধার রাত্তিরে টঙে বসে জোয়ায়ের ক্ষেত পাহারা দিয়েছে। বোশেখ-জষ্ঠি মাসের ছুপুররোদে দম নেবার ফুরসত পায় নি। আর আজ তার এই ফল যে ভিখিরিকে নিজে হাতে ছু'মুঠো ভিক্ষে দেবার অধিকার নেই। আমি ঝুড়ি ভরে ভিক্ষে দেব তাতে কার কী বলবার আছে। আমার ঘরবাড়ি, আমার খুশি হলে আগুন ধরিয়ে দেব। আইনত ও তো আমার পাওনাগণ্ডা রয়েছে। তা আমি নিজের ভাগটা না খেয়ে বিলিয়ে দেব, তাতে কার বাবার কী ক্ষতি হচ্ছে। এখন এসেছেন সাধতে। আমি মানুষ তাই বউকে কখনো ফুলের পাপড়ি ছুঁড়েও মারি নি। নইলে কই, বলুক তো কেউ বুকে হাত রেখে, দেশ-গাঁয় কটা বউ আছে, যে সোয়ামীর লাথি খায় নি। কখনো কড়া চোখে তাকাই নি। টাকাপয়সা, নেওয়া-থোওয়া, সংসারের সব-কিছুই তো ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ও এখন বুঝি জমার কড়ি মুঠোয় এসে গেছে, তাই দেমাকে বাঁচেন না— আমার ওপরেই দেমাক দেখান। এখন আর আমি শালা কে। অকম্মা, ঘরজ্বালানে। এখন সব-কিছুই ছেলেরা। এখন আমার ধার ধারবে কেন। যখন ছেলেরা ছিল না, রোগে পড়েছিল, তখন যে কোলে করে কবরেজ বাড়ি নিয়ে যেতুম আসতুম— সেদিনের কথা এখন মনে রাখার দরকার কী! এখন বেটারাই জীবনসর্বস্ব। আমি তো বাইরের লোক।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। বললে— আমার আবার এখন খাওয়া পরার দরকার কী। হাল জুড়ি না, কোদাল কোপাই না। আমাকে খাইয়ে খামোকা ভাঁড়ার খরচ করবে কেন। রেখে দাও, দুটো বেশি থাকলে, তোমার ছেলেদের আর-এক সাঁঝ হবে।

বুলাকী— তুমি বড়ো সামান্য কথায় চটে যাও বাপু। বুড়ো হলে ভীমরতি হয় কি সাধে বলে। ভোলা কী এমন বলেছে, অত-গুলো ভিক্ষে দিয়ো না এই তো, না আর-কিছু ?

সুজান— হ্যাঁ হ্যাঁ, কী আর এমন বলেছে। কথা খরচা না করে ঘা-কতক দিলেই বোধহয় তোমার আশা মিটত। য়্যাঁ। তা সাধ আর বাকি থাকে কেন, পুরো করে নাও। ভোলা বোধহয় এতক্ষণে খেয়ে উঠেছে, যাও ডেকে আনোগে। আর নইলে, নিজেই দাও-না দু-চার ঘা বসিয়ে।

বুলাকী – হ্যাঁ তা আর বলবে না ? বলবে বই-কি। সোয়ামী হয়ে ধর্মশিক্ষে দিচ্ছ। মুখের তো রাখঢাক নেই। পেয়েছিলে আমার মতন সাদাসিধে মেয়েমানুষ তাই তরে গেল। পড়তে তেমন মুখফোড় মেয়েছেলের পাল্লায়, তো বুঝতে। তোমার ঘর করে কার সাধ্যি। হেঁসেলে আর চুলো জ্বলত না।

সুজান— হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি গো। তুমি কি আর যে সে মেয়েমানুষ, তুমি হলে ঠাকরুণ। ছিলেও তাই, আছও তাই। আর আমি তখনও ছিলুম রাক্ষস, আর এখন তো ভূতপ্রেত হয়েছি। রোজগেরে সোমত্ত ছেলেরা, তাদের টেনে কথা বলবে না তো কি আমার হয়ে বলবে ? আমার আর কী আছে।

বুলাকী— আমি যত চেষ্টা করছি যাতে কথা না বাড়ে— তুমি তত ঝগড়ার ছুতো খুঁজছ, যাতে পাড়ার লোক হাসাতে পার। এখন ওঠো, ভালোয় ভালোয় খেয়ে নেবে চলো। নয়তো আমিও গিয়ে শুয়ে পড়ব।

সুজান—বাঃ তুমি কেন না খেয়ে থাকবে। তোমার ছেলেদের রোজগারে খাচ্ছ। আমি বাইরের লোক, আমার কথা আলাদা।

বুলাকী— ছেলে তো আমার একলার নয়, তোমারও তো ছেলে।

সুজান— না, আমার অমন ছেলের দরকার নেই। দেখগে আর কারুর ছেলে। আমার ছেলে হলে আমার এমন খোয়ার হয় না।

বুলাকী— মুখ খারাপ কোরো না। তুমি যদি যা মুখে আসে বলতে থাক আমিও তা হলে মুখ ছাড়ব। বলে পুরুষমানুষ বুদ্ধিমান হয়। বুদ্ধির ঢেঁকি। ছুনিয়ায় তোমার মতন নিরেট আর ছুটো তো হয় না। সময় যেমন, লোকে তেমনি চলে। এখন তোমার আমার বয়েস হয়েছে। আমরা এখন নামেই মালিক। ছেলেরা বড়ো হয়েছে, তাদের মন বুঝে চলতে হবে না? তুমি এত বোঝ আর এটা বোঝ না। ছুনিয়ার দস্তুরিই হল এই, যে যখন রোজগার করে. সংসারে তারই তখন জোর। কই আমি তো ওদের না জিজ্ঞেস করে কিছু করি না। তুমি কেন নিজের মতলবে কাজ কর। যা জোটে ছুটো মুখে দিলে, ভগবানের নামগান করলে, পড়ে রইলে। তা না…। নাও ওঠো, চলো খাবে চলো।

সুজান— তার মানে আমিও যা বাড়ির কুকুরটাও তাই।

বুলাকী— আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। এখন নিজে যা ধরে নিতে চাও, তাই।

সুজান উঠল না। বুলাকী হার মেনে উঠে গেল।

চার

সুজান এখন একটা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হল। এ সংসারে বহুদিন যাবৎ প্রভুত্ব করার ফলে ওর একটা ধারণা হয়েছিল ও-ই এ বাড়ির স্থায়ী কর্তা। ছেলেরা ওকে খাতির করে, সেবাযত্ন করে; ওর সামনে ছিলিম টানে না, খাটে বসে ঠ্যাং দোলায় না. এই-সব দেখেশুনে ওর ধারণা হয়েছিল যে ছেলেরা ওকে সমীহ করে; আর সেটাই ওর গৃহস্বামিত্বের নমুনা বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এটা

যে ওর ভ্রম, আর ভেতরে ভেতরে পরিস্থিতি যে আমূল পালটে গেছে, সে খবর ওর জানা ছিল না। আজ বুঝতে পারল, বাড়িতে ওর খাতির থাকলেও সম্মান নেই। ছেলেরা ছেদ্দাভক্তি করলেও করতে পারে, কিন্তু ওর কর্তৃত্বপ্রয়াসকে আমল দেয় না। ও মনে মনে ঠিক করল— ওর সেবার দরকার নেই, খাতিরের চাহিদা নেই। কিন্তু, নিজের বাড়িতে ও কারুর মুখনাড়াকে গ্রাহ্য করবে না। এ সংসারে কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকার ওর নিজের দখলে থাকবে। এবং সেই অধিকার ও আবার কায়েম করবে। ঠাকুরঘরের পুজুরি হয়ে ও থাকবে না।

রাত পোহাতে তখনো অনেক বাকি। সুজান উঠে পড়ল। বঁটি নিয়ে গোরুবলদের খড়-বিচুলি কাটতে বসল। গাঁ-সুদ্ধ মানুষ ঘুমিয়ে আছে, সুজান বিচুলি কাটছে। এত পরিশ্রম ও জীবনেও করে নি। যেদিন থেকে ও গেরস্তালির কাজকর্ম নিজে হাতে করা ছেড়েছে, সেদিন থেকে ঘরে রোজই গোরুর জাবনা নিয়ে কান্নাকাটি। শংকরও খড় কাটে, ভোলাও কাটে তবু গাইবলদগুলোর পুরো বিচুলি জোটে না। আজ ও ছোঁড়াগুলোকে দেখিয়ে দেবে বিচুলি কাটা কাকে বলে। কাটতে কাটতে বিচুলির পাহাড় জমে গেল। আর টুকরোগুলো যেন ছাঁচে ফেলে কাটা, এমনি সুগোল, এমনি মাপসই।

তখনো ফরসা হয় নি। বুলাকী উঠে দেখে রাশখানেক খড় কাটা। অবাক হয়ে বলে— ভোলাটা কি রাতভর বসে বসে খড় কুচিয়েছে নাকি। এত করে বলি, যে বাবা বেশি রাত জাগিস্ না, শরীর খারাপ করবে। তা কিছুতেই কথা শুনবে না। কাল সারারাত ঘুমোয় নি।

সুজান ব্যঙ্গ করে বলে— ও কবেই বা ঘুমোয়। দিনরাতই তো দেখি কাজ করছে। এ সংসারে ওর মতো খাটিয়ে আর কে আছে ? ততক্ষণে ভোলা উঠে পড়েছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে বিচুলির স্তূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। বলে — হ্যাঁ মা, শংকর কি আজ রাত থাকতে উঠেছে ?

মা বলে— কোথায় ? ও তো এখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আমি বলি বুঝি, তুই কেটেছিস।

ভোলা— আমি সকালে উঠতেই পারি না। দিনের বেলায় যত কাজ পড়ুক করে ফেলব। কিন্তু রাত জাগা আমার দ্বারা হবে না বাবা।

বুলাকী— তবে কি তোর বাবা কেটেছে ?

ভোলা— হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। রাতভর ঘুমোয় নি। কাল আমার বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। আরে, লাঙ্গল নিয়ে চলল যে! প্রাণটা বের না করে ছাড়বে না নাকি।

বুলাকী— বরাবরের রাগী মানুষ। ও কারুর কথা শুনবে ভেবেছিস ?

ভোলা— মা, তুমি চট করে শংকরকে তুলে দাও। আমিও মুখে হাতে জল দিয়েই হাল নিয়ে মাঠে যাচ্ছি।

অন্য কিষাণদের সঙ্গে ভোলা যখন হাল নিয়ে ক্ষেতে পৌছল সুজান ততক্ষণে আধখানা ক্ষেত চষে ফেলেছে। ভোলা মুখ বুজে কাজ আরম্ভ করে দেয়। বাপকে কোনো কথা বলতে সাহসে কুলোয় না।

দুপুর হল। কিষাণরা সবাই হাল চষা ক্ষান্ত দিয়ে খেতে গেল। সুজান ভগত নিজের কাজে মগ্ন। ভোলা হাল্লাক হয়ে পড়ল। ওর কেবলই মনে হচ্ছে বলদগুলোর জোয়াল খুলে দেয়, কিন্তু ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। খালি অবাক হয়ে ভাবছে বাবা এই বয়েসে এত মেহনত কী করে করছে।

শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলে – বাবা, বেলা দুপুর হয়ে গেছে। এবার কি হাল খুলব ?

সুজান— হ্যাঁ, খুলে ফেল। ফেলে বলদ নিয়ে বাড়ি যেতে লাগো, আমি আলটা কেটে দিয়ে আসছি।

ভোলা— আমি আজ সন্ধেবেলায় আল কেটে দেব'খন।

সুজান— কী! সন্ধেবেলায় কাটবে? ক্ষেত বাটির মতন গর্ত হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ না। তাই না মাঝখানে জল জমা

হয়ে থাকে। এই ক্ষেতে বিঘেয় বিশমন ফসল হয়। তোমরা ক্ষেতের সর্বনাশ করে দিয়েছ।

বলদ খুলে ফেলা হল। ভোলা বলদ নিয়ে বাড়ি গেল। সুজান আলের মাটি কেটে জমির জল বার করে দেয়। তারপর আধঘণ্টা বাদে বাড়ি ফেরে। তবুও তার ক্লান্তি নেই। নেয়ে খেয়ে জিরোতে যাবার বদলে সে তখন বলদদের আদর করতে যায়। পিঠে হাত বুলোয়, পা ডলে, লেজ মলে দেয়।

আদর পেয়ে বলদগুলো লেজ খাড়া করে। মালিকের কোলে মুখ রাখে। অপরিসীম সুখে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। বহুদিন পরে আজ ওরা পুরনো সোহাগ সুখের আস্বাদ পায়। তাদের চোখে কৃতজ্ঞ আনন্দের আভা। যেন বলতে চাইছে— আমরা তোমার সঙ্গে অষ্টপ্রহর কাজ করতেও পিছ-পা নই।

আর-সব চাষীদের মতন ভোলাও তখন হাত-পা ছড়িয়ে কোমর টান করে জিরোচ্ছে, সুজান আবার লাঙল কাঁধে তুলে মাঠে বেরিয়ে পড়ল। বলদজোড়া লাফ দিয়ে আগে আগে ছুটেছে যেন কে কত তাড়াতাড়ি ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছোতে পারে।

ভোলা মাচানে শুয়ে শুয়ে দেখল বাপ লাঙল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে, কিন্তু তার ওঠার শক্তি ছিল না। সে জীবনে আজকের মতো পরিশ্রম করে নি। সে তৈরি ক্ষেত হাতে পেয়েছে। যেমন-তেমন করে তাই চালিয়ে যাচ্ছিল। এত দাম দিয়ে ঘরের মালিকানা কেনার ওর মোটেই স্পৃহা নেই। জোয়ান বয়েসের হাজারটা ধান্ধা থাকে। হাসিঠাট্টা, গান-বাজনা করারও তো সময় চাই। পাশের গাঁয়ে কুস্তির দঙ্গল হচ্ছে। এই বয়েসে কী করে সেখানে না ভিড়ে পারে। কোনো গাঁয়ে বরযাত্রী এসেছে, নাচগান হচ্ছে। জোয়ান বয়েসের ছেলে নিজেকে কী করে তা থেকে বঞ্চিত রাখে। বৃদ্ধদের এ-সব বাঁধন নেই। তাদের না আছে গান-বাজনার শখ, না আছে খেলা-ধুলো, নাচ-তামাশার টান। তারা এক কাজই বোঝে।

বুলাকী এসে বলে— ও ভোলা, তোর বাপ যে হাল নিয়ে গেল।

ভোলা জবাব দেয়— যাকগে মা। আমি আর পারছি না।

পাঁচ

সুজান বৈরিগির এই নবীন উৎসাহের ওপর গ্রামে টীকাটিপ্পনি চলে— কী, বেরিয়ে গেল সব বৈরিগিপনা! সব ভড়ং। মায়ার কাছে বাঁধা বাবা। এদের কি মানুষ বলে, ছ্যাঃ! ভূত, ভূত।

এদিকে বৈরিগির দোরে কিন্তু আবার সেই আগের মতন সাধু-সন্তের ভিড় লেগে থাকে। তাদের যত্ন আত্তি হয়। অনেকদিন পরে এবছর আবার তার ক্ষেত সোনা প্রসব করেছে। মরাইয়ে আনাজ ধরে না। গোলাঘর ফসলে বোঝাই। যে ক্ষেতে কষ্টে-সৃষ্টে পাঁচ মন ফসল হত, সেখানে দশ মন ফলেছে।

চোত মাস। খামার উপচে পড়ছে। এখানে-ওখানে যব গম, ভুট্টা স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে। যেন সত্যযুগের আমল। সামনে নতুন বছর। চাষীরা এই সময়টা জীবনের সার্থকতার স্বাদ পায়। সুজান ভগত ধামা-ভরা ফসল ছেলেদের হাতে তুলে দিচ্ছে, তারা এসে ঘরে রেখে যাচ্ছে। অর্থী-প্রার্থী ভিক্ষা-প্রত্যাশীরা দলে দলে ভগতকে ঘিরে রয়েছে। তাদের মধ্যে সেই ভিখিরিটিও ছিল, আজ থেকে আট মাস আগে যাকে বাড়ির দরজা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল।

হঠাৎ তার দিকে ফিরে ভগত জিজ্ঞেস করে— কী বাবা, আজ কোথায় কোথায় ঘুরে এলে।

ভিখারী— আজ এখনো আর কোথাও যাই নি ভগতজী, প্রথমেই তোমার দোরে এসেছি।

ভগত— এই যে দেখছ গাদা, এথেকে যতখানি তুমি উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার, নাও।

ভিক্ষুক লুব্ধ নেত্রে স্তূপের দিকে দেখে। বলে— না, তুমি নিজে হাতে তুলে যা দেবে, তাই নেব।

ভগত— না, তুমি যতখানি তুলতে পার তুলে নাও।

ভিক্ষুকের কাছে একখানা চাদর ছিল। সে চাদরটা পেতে তার মুড়োয় সের দশেক আনাজ বেঁধে নিয়ে তুলতে যাচ্ছে— সুজান বলে উঠল— ব্যস ? এই কটা ? এ তো একটা বাচ্চাও তুলে নিয়ে যেতে পারে। আরো নাও।

ভিক্ষুক যে সংকোচের বশেই আরো নিচ্ছে না এটা বুঝেই সুজান ওকে আশ্বাস দিল। এবার ভিক্ষুক ভোলার দিকে সংশয়ের চোখে তাকায়। বলে— না, আমার এই অনেক। সুজান আবার বলে— নাও নাও, সংকোচ কোরো না। আরো নাও! আরো সের পাঁচেক তুলে নিয়ে লোকটা আবার ভয়ে ভয়ে ভোলার দিকে তাকায়।

সুজান বলে— ওর দিকে দেখছ কী। আমি যা বলছি তাই করো। যতটা বইতে পার বেঁধে নাও।

কিন্তু এবার আর গ্রহীতার হাত ওঠে না। তার আশঙ্কা, ভোলা তাকে কিছুতেই বেশি নিতে দেবে না। শেষে ভরাবাঁধার পর যদি পোঁটলা কেড়ে নেয় তো সবাই হাসাহাসি করবে, আর বলবে, দেখো বেটা ভিখিরি কী লোভী। দরকার নেই।

সুজান এবার নিজে হাতে তার চাদর ভরে আনাজ তুলে দিয়ে বলে— যাও, এবার নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক— বাবা এত ওজন তো আমি তুলতে পারব না।

সুজান— আরে, এইটুকু বোঝা তুলতে পারবে না? বড়োজোর এতে মনখানেক আছে। খুব পারবে, দেখি একবার জোর করে তোলো তো।

কিন্তু মোটটা সত্যিই বেজায় ভারী। লোকটা চেষ্টা করেও তুলতে পারল না। বললে—ভগতজী, এত ভারী আমি তুলতে পারব না।

ভগত— কোন্ গাঁয়ে বাড়ি?

ভিক্ষুক— সে অনেক দূর বাবা, অমোলার নাম শুনেছ?

ভগত— আচ্ছা আগে আগে চলো, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

সুজান এক হেঁচকা টান দিয়ে বোঝাটা তুলে নিজের মাথায় চাপিয়ে নিল। তারপর ভিখিরির পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

হাঁটা না বলে ছোটা বলাই ভালো। যে দেখে সেই আশ্চর্য হয়। বৈরিগির এত উন্মাদনা কিসের। কেউ তো জানে না, পেছনের রহস্য। আটমাসের নিরন্তর কঠোর শ্রম আর কৃচ্ছ্র, ধৈর্য আর নিষ্ঠার আজ পরিপূর্ণ ফল হাতে পেয়েছে। ভোঁতা তলোয়ার, যা দিয়ে কলাপাত কাটা যেত না, আজ শানে চড়ানোর পর পেলে লোহা কেটে ফেলে। মানুষের জীবনে নিষ্ঠা এক মহৎ তপস্যা। এটি চরিত্রে বজায় থাকলে বুড়োও জোয়ান। ঐ রোখ্ না থাকলে জোয়ান মরদকেও বৃদ্ধ বলা চলে। একরোখা মানুষ সুজান বৈরিগি, মত্তহাতীর বল নিয়ে খেটেছে। আজ দেখ যা গোঁ ধরেছিল করে ছেড়েছে। এখন ওর নিজের সংসারে আবার ও নিজেই কর্তা। কারুর টঁ্যা ফোঁ করবার জোটি নেই। সবাই জুজু হয়ে আছে।

পথে পা দিয়ে সুজান একবার ঘুরে দাঁড়ায়। ছেলের দিকে তাকিয়ে ভরাট গলায় হুকুম দেয় -- এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজনও যেন খালি হাতে না ফেরে।

তারপর বুক ফুলিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

ভোলা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষ্যামতা কী যে দ্বিরুক্তি করে। বুড়া বাপের হাতে তার জবর হার হয়েছে।